জয়ন্তী-জুরিখ

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, রথযাত্রা ১৩৬৩

JAYANTI-ZURICH
A Bengali Travelogue on Zurich
of Switzerland and its environs

প্রচ্ছদপটের আলোকচিত্র
রিগি-কুলম (৫৯০০´) সাদা বরফ আর সোনালী রোদের দ্বীপ

বর্ণানুলেপ—পূর্ণেন্দু রায়

প্রচ্ছদ এবং অন্যান্য আলোকচিত্র
শ্রীমতী বসুন্ধরা খৈতান
শ্রীমতী বিভা আগরওয়াল

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩
হইতে এস এন রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ শশী প্রেস, ১৬ হেমেন্দ্র
সেন স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হইতে অশোককুমার ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত

আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ
শ্রী প্রদীপকুমার খৈতানের
করকমলে—

লেখকের কয়েকখানি ভ্রমণকাহিনী

বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা
পঞ্চ-প্রয়াগ
লাদাখের পথে
তমসার তীরে তীরে
রূপতীর্থ খাজুরাহো
পঞ্চবটী
গঙ্গাসাগর
চিত্রকুট
মানালীর মালঞ্চে
মায়াময় মেঘালয় (খাসি পাহাড় ও গারো পাহাড় পর্ব
সুন্দরের অভিসারে
বৈষ্ণোদেবীর দরবারে
মধু-বৃন্দাবনে (ব্রজ, বন ও মহাবন পর্ব)
দ্বারকা ও প্রভাসে
অমরতীর্থ অমরনাথ
কুম্ভমেলায়
রাজভূমি-রাজস্থান
অমরাবতী-আসাম
গঙ্গা-যমুনার দেশে
লীলাভূমি-লাহুল
চতুরঙ্গীর অঙ্গনে
হিমালয় (অমূনিবাস, ১ম ও ২য় পর্ব)
এবং
যদি গৌর না হ'ত
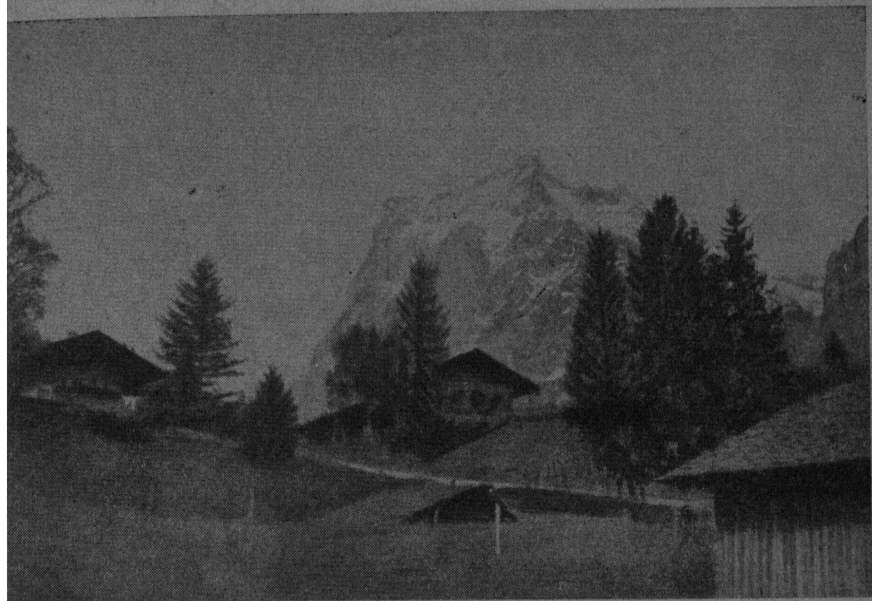
আল্‌পসের পাদদেশে য়ুরোপের স্বর্গ
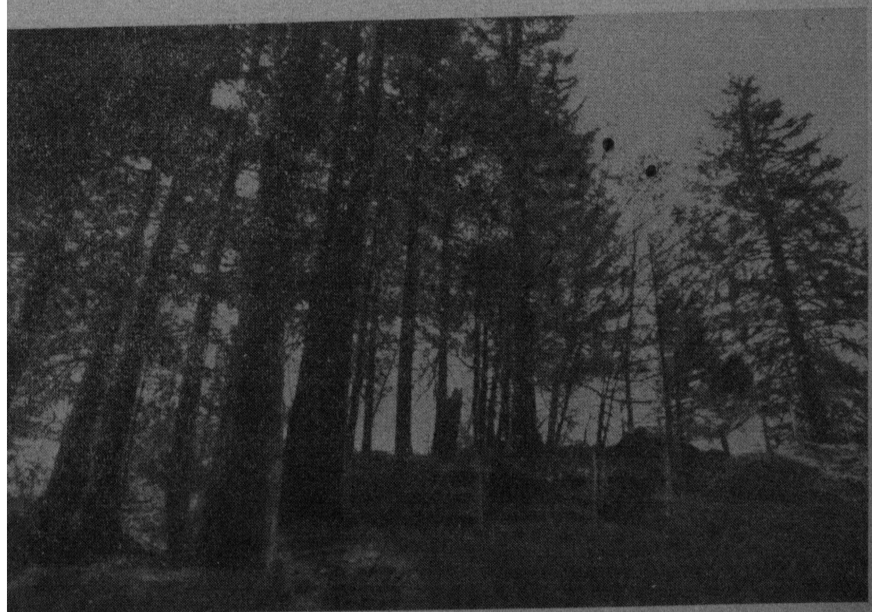
নগর যেখানে অরণ্যকে ফেরায় নি
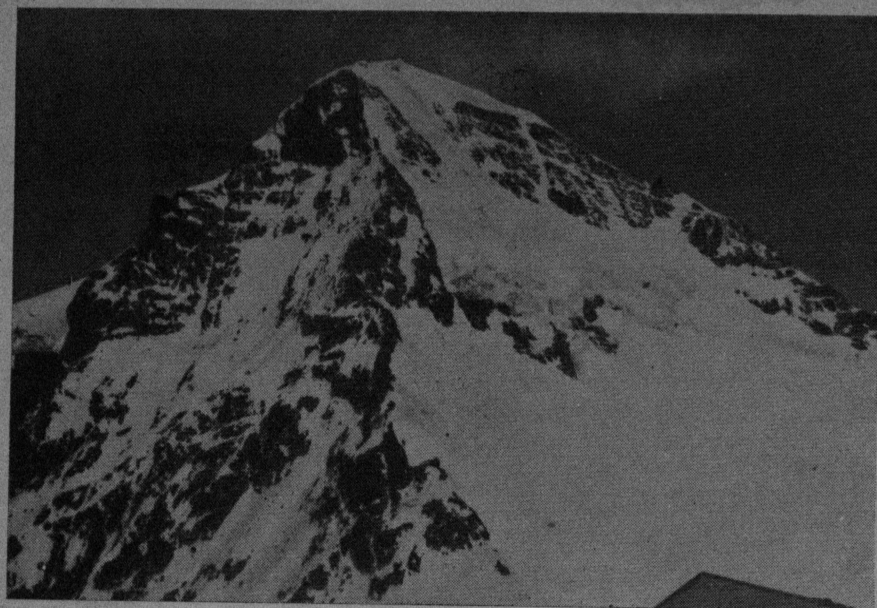
ইয়ুঙ্গফ্রাও-য়ের চূড়া (১৩,৬৪৮´), যেন মিশরীয় স্ফিংক্স

গ্রামের দুয়ার থেকে পাহাড়িয়া পথে

জুরিখের উপকণ্ঠে

জুগ সেণ্ট্‌ম
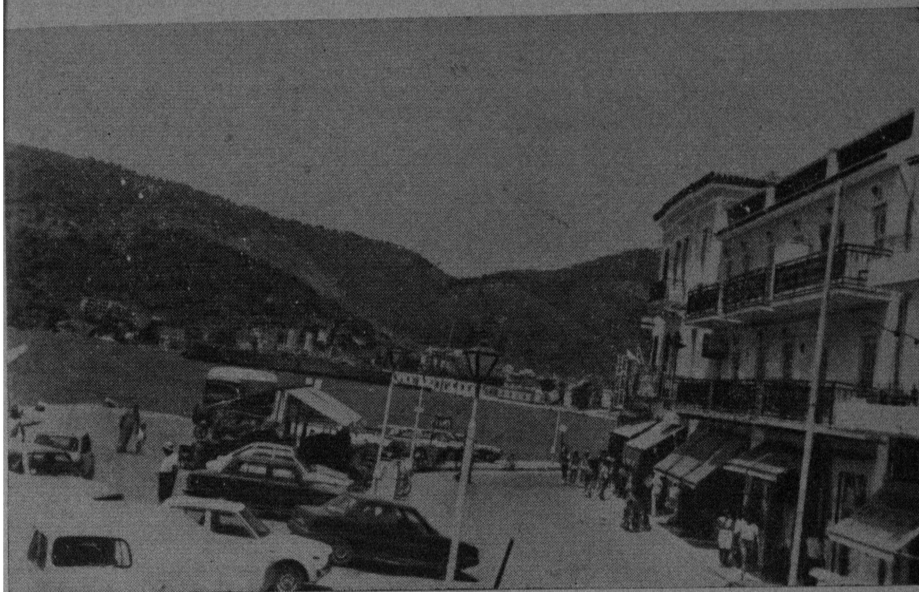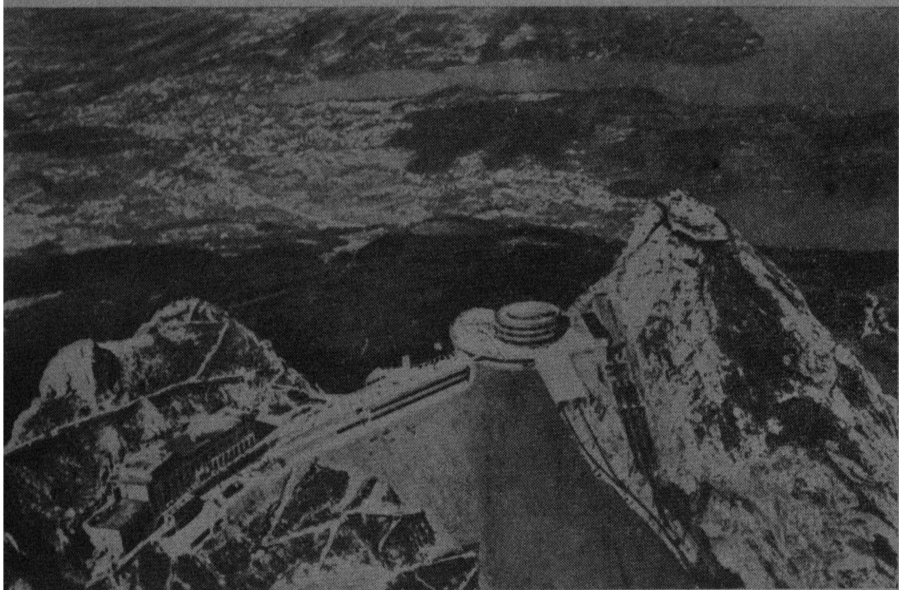
পিলাটাস (৭০০০´) শিখর, যেন রক্ পিরামিড
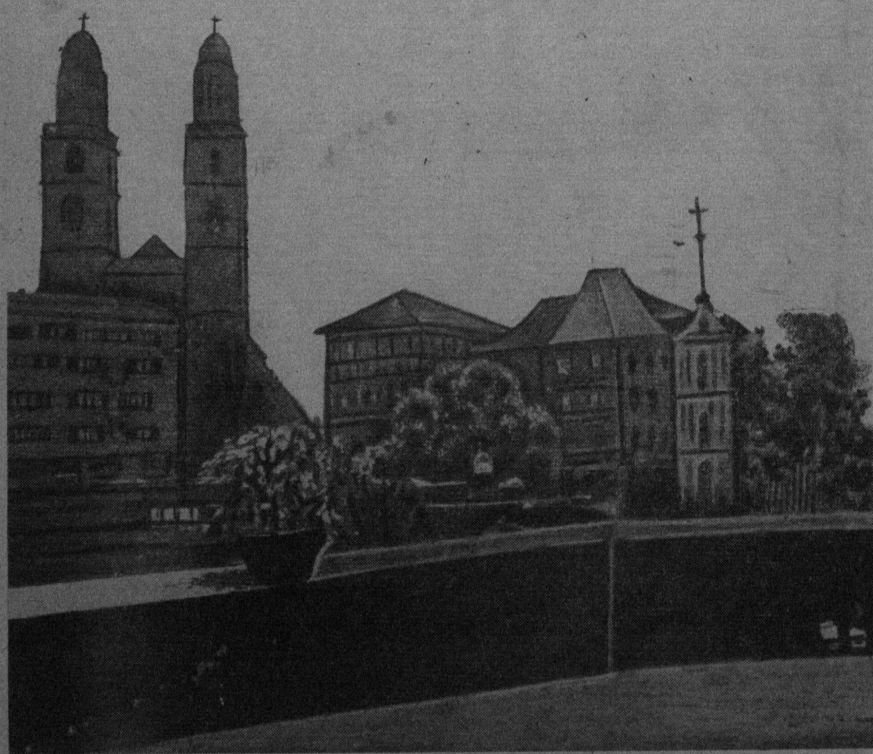
স্বপ্ন কি সত্য হয় ?

নিশ্চয়ই হয়। এবং তা যখন হয়, তখন স্বপ্ন আর স্বপ্ন থাকে না, বাস্তব হয়ে যায়। তবে সে বাস্তব স্বপ্নের মতই সুন্দর, স্বপ্নের মতই মধুর।

ভ্রমণ আমার নেশা। কিন্তু এতকাল সে ভ্রমণ ছিল আসমুদ্র হিমাচল ভারতভূমিকে অবলম্বন করে। আমি তাই বিদেশ ভ্রমণের স্বপ্ন দেখতাম—য়ুরোপ ভ্রমণ।

আমার সেই স্বপ্ন সত্য হল। কেমন করে? তা-ই আগে বলে নিই। তারপরে ভ্রমণের কথায় আসা যাবে।

আমার প্রপিতামহের পিতৃদেব গঙ্গাধর ঘোষ দস্তিদার বিবাহের পরে বেশ কয়েক বছর অপুত্রক ছিলেন। বহু পুজা-পার্বণ কোবরেজ পীর জ্যোতিষী করেও তাঁর স্ত্রীর পুত্র না হওয়ায় তিনি যখন একেবারে ভেঙে পড়লেন, তখন তাঁর এক জ্ঞাতিভাই তাঁকে কাশী যাবার পরামর্শ দিলেন। বললেন—কাশীতে গিয়ে বাবা বিশ্বনাথের কাছে পুত্র কামনা করো, তিনি নিশ্চয়ই তোমার কামনা পূর্ণ করবেন।

কাজটা কিন্তু কোনমতেই সহজ ছিল না। কারণ ঘটনাটি শ'দেড়েক বছর আগেকার। তখনকার দিনে বরিশাল থেকে বারাণসী যাওয়া যেমন ব্যয়সাধ্য, তেমনি কষ্টকর ও বিপজ্জনক।

তবু গঙ্গাধর পরামর্শটা মেনে নিলেন। খাবার-দাবার টাকা-পয়সা ওষুধ-পথ্য ও লোক-লস্কর নিয়ে দিন-ক্ষণ দেখে গাভার খালে বজরা ভাসালেন।

কালিজিরা কীর্তনখোলা পদ্মা ও গঙ্গা হয়ে বেশ কিছুদিন বাদে বজরা কাশীর ঘাটে নোঙর করল। গঙ্গাস্নান করে গঙ্গাধর সস্ত্রীক বিশ্বনাথ মন্দিরে গেলেন। পুজো দিলেন, মানত করলেন। বার বার বাবা-বিশ্বনাথের কাছে পুত্র কামনা করে অবশেষে বললেন—আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ না করলে আমরা আর ঘরে ফিরব না। তোমার শ্রীচরণে দেহ রাখব।

গঙ্গাধর সস্ত্রীক কাশীবাস করতে থাকলেন। প্রতিদিন সকালে তাঁরা গঙ্গাস্নানের পরে জলগ্রহণ না করে বাবা-বিশ্বনাথের কাছে যেতেন। বাবার কাছে বার বার একই প্রার্থনা পেশ করতেন।

তাঁদের কিন্তু খুব বেশিদিন কাশীবাস করতে হল না। কিছুদিন বাদেই বিশ্বনাথ গঙ্গাধরের প্রার্থনা পূর্ণ করলেন। আমার পিতামহের পিতামহী সন্তানসম্ভবা হলেন।

সশ্রদ্ধ চিত্তে ও পুলকিত অন্তরে গঙ্গাধর বারাণসী থেকে বরিশালের গাভা গ্রামে ফিরে এলেন। যথাসময়ে তাঁদের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলেন। তিনিই আমার পিতামহের পিতৃদেব, গঙ্গাধরের একমাত্র পুত্র। বিশ্বনাথের বরপুত্র বলে গঙ্গাধর তাঁর নাম রাখলেন বিশ্বেশ্বর।

আমি সেই বিশ্বেশ্বর ঘোষ দস্তিদারের বংশধর। সেদিন বাবা-বিশ্বনাথ

গঙ্গাধরের প্রার্থনা পূর্ণ করেছিলেন বলেই আমি এই সুন্দর ভুবনে চোখ মেলতে পেরেছি।

আর তাই বোধ করি কাশীশ্বর আমার প্রতিও এমন করুণাময়। তাঁর কৃপা না হলে আমার য়ুরোপ ভ্রমণের স্বপ্ন কখনই সত্য হত না।

ঘটনাটা তাহলে গোড়া থেকেই বলতে হয়। ভারত সেবাশ্রম সংঘের পূজনীয় শ্রীদিলীপ মহারাজের আমন্ত্রণে পুজো দেখতে কাশী গিয়েছিলাম। দিনগুলো বড়ই আনন্দে কেটেছে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ঘুরে বেরিয়েছি মঠে মন্দিরে আর ঘাটে ঘাটে। অবশেষে কলকাতায় ফিরে আসার দিনটি সমাগত হল।

সেদিন সকাল থেকেই মনটা ভারী হয়ে উঠল। তবু রামকৃষ্ণ অদ্বৈতমঠের অধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী অচ্যুতানন্দজীর সঙ্গে প্রাত্যহিক কাশীপরিক্রমায় বের হলাম। পথ চলতে চলতে ভাবতে থাকলাম কাশীর কথা আর আমাদের পরিবারের প্রতি কাশীশ্বরের অকৃপণ করুণার কথা।

ভাবতে ভাবতে একসময় উপস্থিত হলাম বিশ্বনাথ মন্দিরে। দর্শন শেষে কাশীনাথের কাছে করজোড়ে প্রার্থনা জানালাম—বাবা, আবার কবে তোমার কাছে আসতে পারব জানি না। আজ তাই বিদায় বেলায় তোমাকে মনের কথাটি জানিয়ে যাই। তুমি অন্তর্যামী, তবু তোমাকে বলি—ঠাকুর, তুমি তো আমার সব বাসনাই পূর্ণ করেছো। তোমার আশীর্বাদে আমি শিবালয় হিমালয়ের গহন-গিরি কন্দরে আর সমতল ভারতের পথে পথে প্রচুর পরিক্রমা করতে পেরেছি। তোমার করুণায় আমি অসংখ্য মানুষের অকুণ্ঠ ভালোবাসা লাভ করেছি। সত্যি বলতে কি আমার আর চাইবার কিছু নেই, তোমার আশীর্বাদে আমি সবই পেয়েছি। তবু আমি তোমার কাছে আরেকটি প্রার্থনা করব—আমি একবার য়ুরোপ ভ্রমণ করতে চাই।

হ্যাঁ, বাবা-বিশ্বনাথ আমার সে প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন। কেমন করে সেকথা এখন থাক। শুধু বলে রাখি, কাশী থেকে কলকাতায় ফিরে যাবার পরেই খবর পেলাম শ্রদ্ধেয় সলিসিটর শ্রীভগবতী প্রসাদ খৈতান দুদিন আমার খোঁজ করেছেন। তিনি আমাকে ছেলের মতো স্নেহ করেন আর আমি তাঁকে বাবুজি বলি। তাহলেও আমি তাঁর কাছে কোনদিন য়ুরোপ ভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করি নি।

দেখা করার পরে তিনি নিজের থেকেই কথাটা বললেন। মনে মনে কাশী-বিশ্বনাথের শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করলাম।

বাবুজি এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রদীপকুমার খৈতানের আনুকূল্যে আমার স্বপ্ন সত্য হল। আমার মতো একজন সাধারণ লেখকের প্রতি তাঁদের মতো অসাধারণ আইনজীবীদের এই উদার পৃষ্ঠপোষকতা সত্যই বিস্ময়কর। কিন্তু আমি একেবারেই বিস্মিত নই। কারণ আমার স্থির বিশ্বাস তাঁদের মাধ্যমেই বাবা-বিশ্বনাথ আমার প্রার্থনা পূর্ণ করলেন। আমার স্বপ্ন সত্য হল। আর এ সত্য স্বপ্নের মতো সুন্দর, স্বপ্নের মতই মধুর।

এবারে ভ্রমণের কথায় আসা যাক। প্রথমেই মনে পড়ছে আজ সকালের কথা। অবশ্য সকাল না বলে শেষরাত বলা উচিত হবে। রাত আড়াইটেয় ঘুম থেকে উঠতে হয়েছে। সকাল সাড়ে পাঁচটায় রিপোর্টিং টাইম। পিন্টুবাবু (প্রদীপকুমার খৈতানের ডাকনাম) অবশ্য গাড়ির বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। তাহলেও আমি ঢাকুরিয়ায় থাকি। আমাকে সাড়ে চারটায় বাড়ি থেকে রওনা দিতে হয়েছে।

না, একা বিমানবন্দরে আসি নি। আজ আমি প্রথম বিদেশ ভ্রমণে যাচ্ছি। তাই মা সহ বাড়ির সবাই দমদমে এসেছিল। এসেছিল আমার অনুজপ্রতিম বন্ধু ও প্রখ্যাত পর্বতারোহী অমূল্য সেন।

সকাল ছ'টা পঞ্চাশ মিনিটে ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্স-এর বিমান ছেড়েছে দমদম থেকে। কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমান-বন্দর। কিন্তু 'সুইসএয়ার' কলকাতায় আসে না। ভারত থেকে কাউকে সোজাসুজি জুরিখ যেতে হলে তাকে সুইসএয়ারের টিকেট কাটতেই হবে। কারণ এয়ার ইন্ডিয়া কেবল জেনিভা যায়। তাও সপ্তাহে মাত্র একদিন, বম্বে থেকে।

আর শুধু সুইসএয়ারের কথাই বা বলি কেন? এয়ারোফ্লোট ছাড়া প্রায় সমস্ত পশ্চিমী বিমানসংস্থাই তো কলকাতা থেকে পাততাড়ি গোটালেন। ফলে পর্যটক ও প্রবাসীদের এখন কলকাতায় আসা-যাওয়া রীতিমত কষ্টকর হয়ে উঠেছে। প্রথমত সপ্তাহে এয়ারোফ্লোটের একটি ও এয়ার ইন্ডিয়ার দুটি ফ্লাইট দিয়ে কলকাতার পশ্চিমগামী যাত্রীদের সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত যাতায়াতের পথে এই দুটি সংস্থার বিমানযাত্রীদের মস্কো কিম্বা বম্বে বিমানবন্দরে দীর্ঘসময় অতিবাহিত করতে হয়। ফলে বিদেশী পর্যটকরা পূর্বভারতকে বাদ দিয়ে ভারতদর্শন শেষ করেন। এবং ভারতের পর্যটন-মানচিত্রে কলকাতা অপাঙতেয় হয়ে পড়েছে।

যাকগে, যেকথা বলছিলাম। আমাকেও তাই সুইসএয়ারের টিকেট কিনতে হয়েছে। এটি পুরো দামের অর্থাৎ কোন ডিসকাউন্ট না নেওয়া টিকেট। তাই তাঁরা আমাকে ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্স-এর বিমানে বম্বে যাওয়া এবং সেখানে হোটেলে উঠবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

আমাদের এই বিমানটি বোয়িং ৭৩৭।

কলকাতা থেকে বম্বে এই ১৬৯০ কিলোমিটার আকাশপথ পাড়ি দিতে বিমানটির দু'ঘণ্টা দশ মিনিট সময় লাগবে। আমি সকাল ন'টায় বম্বে পৌঁছব।

কলকাতা বিমানবন্দরের নাভিশ্বাস উঠেছে আর বম্বেতে নূতন একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর তৈরি করা হয়েছে, নাম 'সাহার'। রাতে আমাকে সেখান থেকেই জুরিখ রওনা হতে হবে। কিন্তু এখন আমি বম্বের পুরোন বিমানবন্দর সান্তাক্রুজে অবতরণ করব। তাই দাদাকে আমি সান্তাক্রুজে আসতে লিখেছি।

আমার দাদা রণেশচন্দ্র সরকার 'ভাবা এ্যাটমিক এস্টাবলিশমেন্ট'-এর সিনিয়ার সায়েন্টিফিক অফিসার ছিল। গতবছর অবসর নিয়েছে। ছেলেরা বম্বেতে চাকরি করে। তাই চেম্বুরে একটা ফ্ল্যাট নিয়ে দাদা বম্বেতেই স্থায়ী হয়েছে।

দাদা বিমানবন্দরে এলেও আমি এখন তাঁর বাড়িতে যাবো না। কারণ আগেই বলেছি সুইসএয়ার আমাকে হোটেল দিয়েছেন—ওবেরয় টাওয়ার্স। শুনেছি ন্যারিমান পয়েণ্টস্-এ অবস্থিত এই হোটেলটি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিলাসবহুল হোটেল। তাছাড়া সুইসএয়ার বিমানবন্দর থেকে হোটেলে যাতায়াতের ট্যাক্সিভাড়া পর্যন্ত দিচ্ছেন। সুতরাং দাদাকে নিয়ে ওবেরয় টাওয়ার্সে চলে যাবো। সেখানে স্নান-খাওয়া সেরে দাদার সঙ্গে চেম্বুর ঘুরে আসা যাবে।

বিমান আকাশে ওঠার পরেই চকোলেট ও ফলের রস পাওয়া গিয়েছিল। এবারে ব্রেকফাস্ট এলো—রুটি মাখন জেলি, ভেজিটেবল কাটলেট, আলুভাজা ও কফি।

খেয়ে নিয়ে সিটে গা এলিয়ে দিলাম। আমি সত্যই সৌভাগ্যবান। বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় ও আমার বাবুজির ভালোবাসায় আমি আজ সত্য-সত্যই য়ুরোপ ভ্রমণে চলেছি। কিন্তু এই যাবার জন্য ঝামেলা কম পোহাতে হয় নি। আমি সরকারী চাকুরে। আমাদের পাসপোর্ট করাতে হলে অফিস থেকে একখানি 'নো-অবজেকশন' সার্টিফিকেট লাগে। সেটি যোগাড় করে পাসপোর্ট পেতে অনেক দেরি হয়ে গেল। ফলে গত সপ্তাহে বাবুজির সঙ্গে আমি জুরিখ যেতে পারলাম না। শিল্পপতি শ্রীঘনশ্যাম দাস বিড়লার অতিথিরূপে বাবুজি আগামী সপ্তাহটাও জুরিখে থাকবেন। যাবার সময় তিনি বলে গেছেন—আমার ইচ্ছা তুমি ২৯শে মে-র মধ্যে জুরিখ পেঁছিও। তাহলে কয়েকটা দিন আমরা একসঙ্গে সুইজারল্যাণ্ডে বেড়াতে পারব।

অথচ তখন পর্যন্ত আমার পাসপোর্ট হয় নি। শেষ পর্যন্ত বাল্যবন্ধু ডি.এস.পি. হরিশ গাঙ্গুলি ও পাসপোর্ট অফিসের পি আর. ও শ্রীসুশান্তকুমার গুপ্তের সহায়তায় মাত্র ছ'দিন আগে পাসপোর্ট হাতে পেলাম। হরিশ শুধু ডি. এস. পি. নয়, সে সুলেখকও বটে। 'নটরাজন' ছদ্মনামে বেশ কয়েকখানি বই লিখেছে। আর সুশান্তবাবু আমাদের শ্রদ্ধেয়া মাসিমা আশাপূর্ণা দেবীর একমাত্র পুত্র।

পাসপোর্ট পাবার পরেও প্রচুর ছুটোছুটি করতে হয়েছে। কারণ আমি এ যাত্রায় সাতটি দেশে যেতে চাই—সুইজারল্যাড, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী, গ্রীস ও মিশর। বৃটেন ছাড়া আর সব দেশেরই ভিসার দরকার। তার মধ্যে আবার প্রথম সুইজারল্যাণ্ডে যাবো অথচ কলকাতায় সুইস কন্সুলেট অফিস নেই। তাই এ্যামেরিকান এক্সপ্রেসের মাধ্যমে দিল্লীতে পাসপোর্ট পাঠিয়ে সুইস ভিসা করিয়ে আনতে হয়েছে। ফ্রেঞ্চ, জার্মান ও ইতালীয়ান ভিসা করাতেই বাকি দিনক'টি ফুরিয়ে গেল। ফলে গ্রীস ও মিশরের ভিসা নিতে পারি নি। জানি না লণ্ডনে করাতে পারব কিনা? কারণ আজকাল নাকি নিজের দেশ থেকেই ভিসা সংগ্রহ করতে হয়।

জনৈক স্টুয়ার্টের প্রশ্নে আমার ভাবনা থেমে যায়। তিনি আমার নাম জিজ্ঞেস করেন।

নাম বলতেই তিনি আবার বলেন—আপনাকে কম্যাণ্ডার একবার ডাকছেন।

—কম্যাণ্ডার! আমি বিস্মিত। বলি—কোথায়?

—হ্যাঁ, কম্যাণ্ডার মানে চীফ পায়লট। আপনাকে ককপিটে ডাকছেন।

ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। তাহলেও উঠে দাঁড়াই। ভাবি—গিয়েই দেখা যাক না। বহুবার বিমানে চড়েছি কিন্তু কখনও কক্‌পিটে পা দেবার সুযোগ ঘটে নি।

অতএব স্টুয়ার্টের সঙ্গী হলাম। বলা বাহুল্য আমরা বিমানের সামনের দিকে এগিয়ে চলেছি। প্রথম শ্রেণীকে ডানদিকে রেখে এগিয়ে চলি। তারপরে ফ্লাইট্ ইঞ্জিনীয়ারের কেবিন ছাড়িয়ে এগিয়ে আসি। অবশেষে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে একটু ওপরে উঠি। দরজা ঠেলে ককপিটে প্রবেশ করি।

মাথায় হেড-ফোন লাগিয়ে দুপাশে দুজন ভদ্রলোক বসে আছেন। বাঁদিকের ভদ্রলোক বলে ওঠেন—আসুন, আসুন। তিনি মাথা থেকে হেড-ফোনটা খুলে বললেন—বসুন।

তাঁদের দুজনের মাঝখানে ছোট একখানি টুল। বোধ করি আমাকে ডাকতে পাঠিয়ে আনিয়ে রেখেছেন। আমি বসে পড়ি।

স্টুয়ার্ট বলেন—আমি তাহলে আসছি স্যার?

—হ্যাঁ, এসো। কিন্তু যাবার পথে আমাদের জন্য একটু চা বলে যাও।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে স্টুয়ার্ট অদৃশ্য হলেন। এবারে ভদ্রলোক আমাকে বলেন—আমার নাম এস কে মুখার্জি। আমার সহকর্মীর নাম ক্যাপ্টেন এ কে কালিয়া।

ক্যাপ্টেন কালিয়া বিমান চালাচ্ছেন, তবু তিনি তারই মধ্যে মাথা নাড়িয়ে আমাকে নমস্কার করেন। আমিও প্রতিনমস্কার করি।

ক্যাপ্টেন মুখার্জি আবার বলেন—আমাদের ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেণ্টের দিলীপ বোস আপনার আত্মীয়?

—হ্যাঁ। আমার ভগ্নীপতি।

—মিঃ বোস দমদমে আমাকে বলে দিয়েছেন, আমি যেন আপনাকে আমাদের এই ককপিট্-টা একটু দেখিয়ে দিই। তাই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি।

—কিন্তু দিলীপ তো আমাকে কিছুই বলে নি।

—হয়তো আপনাকে অবাক করে দিতে চেয়েছেন। একটু হাসেন তিনি। তারপরে আবার বলেন—বম্বে থেকে তো আপনার ফ্লাইট সেই শেষরাতে!

—হ্যাঁ, রাত পৌনে দুটোয়।

—তাহলে সান্তাক্রুজ থেকে আমার সঙ্গেই চলুন। তাজ হোটেলে থাকবেন। আমার ফ্লাইট কাল সকালে। আপনাকে রাতে সাহার পৌঁছে দেব।

তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বলি—সুইসএয়ার আমাকে হোটেল দিয়েছেন, ওবেরয় টাওয়ার্স। তাছাড়া বম্বেতে আমার দাদা থাকেন, তিনি এয়ারপোর্টে আসবেন।

কথাবার্তা বলতে বলতে এবারে আমি ককপিটের দিকে নজর দিই। সামনে

ও দুপাশে কাচের Cockpit window, তারপরে ওপরের দিকে Instrumental Panel. ছোট-বড় নানা আকারের নানা রঙের অসংখ্য যন্ত্রপাতি। বেশ কয়েকটি আলো জ্বলে আছে। কোনটি আবার জ্বলছে-নিভছে। দেখেই প্রায় মাথা ঘুরে যাচ্ছে। যাঁরা মাথা ঠিক রেখে এইসব পরিচালনা করতে পারেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে অসাধারণ।

যন্ত্রপাতির নিচে দুই পায়লটের বসবার জায়গা। তাঁদের সামনে Control Column—অর্থাৎ স্টীয়ারিং। তবে মোটরের মতো বৃত্তাকার নয়, অর্ধবৃত্তাকার।

ক্যাপ্টেন মুখার্জি এই বিমানের কম্যাণ্ডার। তাঁর প্রধান কাজ 'টেক্ অফ্' এবং 'ল্যাণ্ডিং'। অন্যসময় সাধারণতঃ কো-পায়লট চালান। এখন যেমন চালাচ্ছেন। এর মানে অবশ্য এই নয় যে কো-পায়লট টেক্-অফ্ কিম্বা ল্যাণ্ড্ করাতে পারেন না। তিনি নিশ্চয়ই পারেন এবং প্রয়োজন হলে করেনও। তবে সাধারণতঃ ও দুটি কাজ কম্যাণ্ডারের। আবার অনেক সময় তিনিও বিমান চালান।

এঁরা দুজন ছাড়া এইসব বড় বিমানে আরেকজন যন্ত্রবিদ্ থাকেন, তিনি ফ্লাইট ইঞ্জিনীয়ার। তাঁর কাজ যন্ত্রপাতির দিকে নজর রাখা এবং আকাশে কোন যন্ত্রপাতি বিগড়ে গেলে তৎক্ষণাৎ সেই খবর কম্যাণ্ডারকে দিয়ে সেটি সারিয়ে ফেলা। তাঁর কেবিনটি কক্‌পিটের ঠিক পেছনে।

অসীম শূন্যের ওপর দিয়ে আমরা দুর্বার বেগে ভেসে চলেছি। নিচে মেঘের আস্তরণ। তবে খুবই হালকা মেঘ। মাঝে মাঝে আবার মেঘশূন্য আকাশ। তখন নিচের জগৎ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। না, এখন নিচে সবুজ সমতল, নদী-নালা কিম্বা বাড়ি-ঘর নয়, সারি সারি পাহাড়।

কম্যাণ্ডার বলেন—আমরা এখন মধ্যপ্রদেশের পাহাড়ী অঞ্চলের ওপর দিয়ে চলেছি। আমরা কলকাতা থেকে টাটানগরের আকাশ দিয়ে বিহার অতিক্রম করেছি। এখন চলেছি মধ্যপ্রদেশের ওপর দিয়ে। এর পরে নাগপুরের আকাশ দিয়ে মহারাষ্ট্রে পেঁছিব।

—আচ্ছা আমরা এখন কত ওপরে আছি ?

ওপর দিকে কি একটা দেখে নিয়ে বললেন—প্রায় ঊনত্রিশ হাজার ফুট ওপরে।

—আমাদের গতিবেগ ?

—ঘণ্টায় আটশ' কিলোমিটার।

বসতে কোন অসুবিধে ছিল না। কিন্তু বেশিক্ষণ বসতে পারলাম না। কেমন যেন গা ছমছম করে। তাই চা খাওয়া হলে ওদের দুজনকে ধন্যবাদ দিয়ে ফিরে এলাম নিজের জায়গায়।

আমাকে ককপিটে ডেকে নিয়ে যাবার জন্য কাছাকাছি সিটের সহযাত্রীরা খুবই কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। এবারে কারণ জানতে পেরে জনৈক সহযাত্রী বলে উঠলেন—আপনি ভারী ভাগ্যবান মশায়। একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করে এলেন।

আমি মাথা নাড়ি। মনে মনে ভাবি—ভদ্রলোক ঠিকই বলেছেন, আমি সত্যই সৌভাগ্যবান। তা নইলে বাবুজি আমাকে এতখানি ভালবাসবেন কেন? পিণ্টু-বাবুই বা কেন নিজের থেকে আমার এই ভ্রমণের ব্যবস্থা করে দেবেন? আর ক্যাপ্টেন মুখোজীই বা কেন এভাবে কক্‌পিটে ডেকে নিয়ে গিয়ে চা খাওয়াবেন? আমি তাই আবার বাবা-বিশ্বনাথকে প্রণাম করি।

নিজের সৌভাগ্যের ভাবনায় বিভোর হয়ে পড়েছিলাম। সহসা কানে এলো এয়ার হোস্টেসের কণ্ঠস্বর। তিনি আমাদের সিট-বেল্ট্ বাঁধতে বলছেন। তাকিয়ে দেখি ধূমপান নিষেধ ও বেল্ট্ বাঁধার আলো দুটিও জ্বলে উঠেছে। তাহলে কি বম্বে এসে গেল!

তাড়াতাড়ি ঘড়ি দেখি। হ্যাঁ, ন'টা বাজে। তার মানে বম্বে এসে গেল। আমি বেল্ট্ বেঁধে ঠিক হয়ে বসি।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা সান্তাক্রুজ বিমানবন্দরে অবতরণ করলাম। মালপত্র নিয়ে লাউঞ্জে এসে দেখি দাদা দাঁড়িয়ে আছে। আর দাঁড়িয়ে আছে সুইসএয়ারের টুপি মাথায় দিয়ে জনৈকা ভারতীয় তরুণী। তার কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিতেই সে হাত বাড়িয়ে দেয়। সহাস্যে করমর্দন করে বলে—আমি আপনার জন্যই সাহার থেকে এখানে এসেছি। এখানে আমাদের কোন অফিস নেই। পথে কষ্ট হয় নি তো?

—না। খুব আরামে এসেছি।

সে খুশি হয়। তারপরে সে তার ব্যাগ খুলে একখানি কাগজ আমাকে দিয়ে বলে—চলুন, আমি ট্যাক্সি করে দিচ্ছি। আপনি ওবেরয় টাওয়ার্স হোটেলে চলে যান। রিসেপশানে গিয়ে এই কাগজখানা দিলেই ওঁরা আপনার ট্যাক্সিভাড়া দিয়ে থাকা-খাবার সব ব্যবস্থা করে দেবেন। আপনার কোন অসুবিধে হবে না।

দাদাকে সঙ্গে নিয়ে আমি মেয়েটির সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসি। সে ট্যাক্সি ডাকে। আমরা গাড়িতে উঠে বসি। সে আবার আমার সঙ্গে করমর্দন করে। বলে—আপনার ফ্লাইট রাত পৌনে দুটোয়। আপনি রাত বারোটা নাগাদ সাহার বিমানবন্দরে পেঁছে আমাদের কাউণ্টারে চলে আসবেন।

আমি মাথা নেড়ে মেয়েটিকে ধন্যবাদ দিই। ড্রাইভার ট্যাক্সি ছেড়ে দেয়। মেয়েটি হাত নাড়ে। আমাকে হাত নাড়তে হয়।

গাড়ি এগিয়ে চলে। আমি কিন্তু মেয়েটির কথাই ভাবতে থাকি। কি আশ্চর্য সুন্দর মধুর ব্যবহার! যেন তার সঙ্গে আমার কতদিনের পরিচয়! অবশ্য এ তার কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, সবটাই কম্প্যানীর কাজ। একজন যাত্রীর জন্য তাঁরা একজন কর্মচারীকে সাহার থেকে সান্তাক্রুজ পাঠিয়েছেন। আর সে তার মধুর ব্যবহারে আমাকে মুগ্ধ করে গেল। অথচ মেয়েটি ভারতীয়।

কোন ভারতীয় সংস্থায় চাকরি করলে সে এমন হ'ত কি ?

ট্যাক্সি এগিয়ে চলে। অফিস টাইম। তাই সময় একটু বেশি লাগল। তাছাড়া বম্বেতে রাস্তার অবস্থাও আজকাল বড্ড খারাপ হয়ে পড়েছে। খানা-খন্দ, ঝুপড়ি-হকার, নোংরা-নর্দমা—সবই দেখা দিয়েছে। ফলে কলকাতার মতই 'জ্যাম' লেগে আছে। তাহলেও স্কাই-স্ক্র্যাপারে ছাওয়া ন্যারিম্যান পয়েণ্ট্স-এ পেঁছিনো গেল।

শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বিশতলা হোটেল। সাতশ' নাকি ঘর আছে এ হোটেলে। ট্যাক্সি দোতলায় উঠে এলো। কার্পেটের ওপর দিয়ে হেঁটে রিসেপশানে আসি। সুইসএয়ারের কাগজখানি হাতে দিতেই জনৈক ভদ্রলোক খাতা খুলে আমার নাম-ঠিকানা ইত্যাদি সব লিখে ফেলেন। তারপরে খাতাখানি এগিয়ে দেন। আমি সই করি। ভদ্রলোক আমাকে পাঁচখানি কুপন দিলেন—দুখানি কুপন ট্যাক্সিভাড়া আর ব্রেক-ফাস্ট-এর জন্য পঁয়তাল্লিশ টাকা, লাঞ্চ-এর জন্য পঁয়ষট্টি টাকা এবং ডিনার-এর পঁচাশী টাকার কুপন।

একখানি কুপন ড্রাইভারকে দিলাম। সে সেলাম ঠুকে বিদায় নিল। সেলাম ঠোকার কারণ রয়েছে। হোটেল থেকে তাকে প্রায় দ্বিগুণ ভাড়া দিয়েছে।

বেয়ারার সঙ্গে লিফ্টে করে পনেরো তলায় উঠে এলাম। বেয়ারা ঘর খুলে দিল। ঘর নয় স্যুইট। ড্রয়িং-কাম্-ডাইনিং স্পেস্ সহ বেড্রুম, এ্যাটাচড্ বাথ্—গরম ও ঠাণ্ডা জল, তোয়ালে সাবান শ্যাম্পু অডিকোলন ইত্যাদি। ড্রয়িং স্পেসে সোফা সেণ্টার-টেব্ল, ডায়াল-টেলিফোন, টি ভি ও একটা ছোট ফ্রিজ, ভেতরে দুটি ক্যাম্পা কোলা। বাথরুম ছাড়া বাকি সব জায়গাতেই কার্পেট পাতা। বেডরুমে আধুনিকতম ডিজাইনের খাট-বিছানা, ড্রেসিং টেব্ল, ওয়ারড্রোব ইত্যাদি।

বিমানে বেশ ভাল খাবার দিয়েছে। অতএব আমার আর ব্রেক-ফাস্টের প্রয়োজন নেই। বাথরুমে ঢুকে ভারী আরামে স্নান করে নিলাম। তারপরে দাদাকে ঘরে বসিয়ে রেখে পঁয়ষট্টি টাকার লাঞ্চ্ কুপনটি নিয়ে নেমে এলাম নিচে। দেখেশুনে একটা রেস্তোরাঁয় এসে ঢুকলাম, নাম 'সমরখন্দ্'।

চেয়ারে বসতেই বেয়ারা এসে হাজির হয়। তাকে কুপনটি দিয়ে বলি—ভেজিটারিয়ান লাঞ্চ্।

লোকটি কুপনটি হাতে নিয়ে মাথা চুলকোতে শুরু করে।

—কি হল ? জিজ্ঞেস করি।

সে সবিনয়ে বলে—সাব্, এখানে লাঞ্চ্ খেতে হলে আপনাকে আরও পঁয়ত্রিশ টাকা দিতে হবে।

—কেন ?

—এ রেস্তোরাঁয় একশ' টাকার কমে লাঞ্চ হয় না।

—তাহলে তোমাদের হোটেল থেকে আমাকে পঁয়ষট্টি টাকার লাঞ্চ্-কুপন দিলেন কেন ?

—সাব্, আমাদের এ হোটেলে আরও অনেক রেস্তোরাঁ আছে। আপনি এই কুপনে লাঞ্চ্ পাবেন বৈকি। একবার থামে লোকটি। তারপরে আবার বলে—রিসেপশান থেকে এখানে আসার পথে বাইরের ল'নে যে রেস্তোরাঁটি দেখে এসেছেন, সেখানেই এই কুপনে লাঞ্চ্ পেয়ে যাবেন।

পেয়েছিলাম। কিন্তু সেকথা উল্লেখ করবার মতো নয়। উল্লেখযোগ্য হল, যে দেশে একটা মানুষ দিনভর প্রাণপাত পরিশ্রম করে দশটি টাকা রোজগার করতে পারে না, সেই দেশের একটি হোটেলে একশ' টাকার কমে একথালি নিরামিষ খাবার পাওয়া যায় না! এর চেয়ে বড় বৈষম্য আর কি হতে পারে?

॥ দুই ॥

দাদাকে বাড়ি ফিরতে হবে। তাই রাত বারোটার আগেই বিমানবন্দরে এলাম। হোটেল থেকে খেয়ে নিয়েই দাদার বাড়ি চেম্বুরে চলে গিয়েছিলাম। দেখা হয়েছে বৌদি মায়া, ভাইপো রথীন ও কমলের সঙ্গে, ভাইপোর স্ত্রী ত্রয়ী ও তার মেয়ে মানে আমার নাতনী রেশমীর সঙ্গে। খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে সন্ধ্যার পরে আবার দাদাকে নিয়ে ফিরে এসেছি হোটেলে। একই রেস্তোরাঁ থেকে পঁচাশী টাকার ডিনার খেয়ে বিমানবন্দরে এসেছি। দীর্ঘ পথ, ৩৫ কিলোমিটার।

সময় না হওয়া সত্ত্বেও সুইসএয়ারের কাউণ্টারে হাজির হতেই ওঁরা আমার স্যুটকেস নিয়ে Bording pass দিয়ে দিলেন। তাতে ফ্লাইট নম্বর, গেট নম্বর, সিট নম্বর, সময় ও গন্তব্যস্থল সবই লেখা রয়েছে। তবু দাদা বলে বসল—আমার জন্য চিন্তা করিস না, বম্বেতে রাত দুটো পর্যন্ত বাস চলে। আমি ঠিক বাড়ি ফিরতে পারব। তোর ইমিগ্রেশান ক্লিয়ারেন্স হবার আগে আমি তোকে ছেড়ে যাবো না।

অতএব দাদাকে নিয়েই একস্‌চেঞ্জ ব্যাংকে আসি। বোর্ডিং পাস এবং পাসপোর্ট দেখিয়ে দু'শ টাকার আমেরিকান ডলার পাই। আগে যে পাঁচশ ডলার পেয়েছি, এটা তার ওপরে পকেটমানি। তারপরে লাউঞ্জে এসে বসি। বসে বসে টারমিনাল বিল্ডিংটিকে দেখতে থাকি। নতুন বিমানবন্দর। সাধ্যমত আধুনিক ঢঙে সুসজ্জিত করা হয়েছে। আলোর বাহারও যথেষ্ট। ব্যস্তও বটে। প্রাচ্য মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের প্রায় সমস্ত সংস্থার বিমানই এখানে ওঠা-নামা করে। রাতের দিকেই বিমানের সংখ্যা বেশি। সুতরাং ব্যস্ততা স্বাভাবিক।

রাত সাড়ে বারোটার সময় ইমিগ্রেশান চেক্‌ইন-এর জন্য মাইকে আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হল। টি ভি. স্ক্রীন-এও লেখা ভেসে উঠল—SR 179 Immigration Clearance : অর্থাৎ সুইসএয়ার ১৭৯ নম্বর ফ্লাইটের যাত্রীদের ইমিগ্রেশান ক্লিয়ার করবার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে।

দাদাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালাম। দাদা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। একটু বাদে ছেড়ে দিয়ে ভারী গলায় বলে—সর্বদা সাবধানে থাকিস। জুরিখ পৌঁছেই একটা চিঠি দিস।

আমি মাথা নেড়ে আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিই। বলি—তোমরা অযথা চিন্তা ক'রো না। আমি ভাল থাকব।

কিন্তু দাদা বলে—এতদূরে যাচ্ছিস, আমাদের তো চিন্তা করতেই হবে।

হেসে বলি—মাইল কিম্বা কিলোমিটারের হিসেবে দূর সন্দেহ নেই, কিন্তু সময়ের হিসেবে যে কিছুই নয়। বম্বে মেল যে সময়ে হাওড়া থেকে মোগলসরাই আসে তার আগে আমি বম্বে থেকে জুরিখ পৌঁছে যাবো।

—তাহলেও মোগলসরাই ভারতে আর জ্যুরিখ স্যুইজারল্যাণ্ডে। অচেনা অজানা দেশ, চিন্তা তো হবেই।

—অচেনা অজানা দেশ হলেও তুমি চিন্তা ক'রো না। সেখানে আমার এমন একজন আপনজন রয়েছেন, যিনি সর্বদা আমাকে আগলে রাখবেন।

—জানি, তোর বাবুজি রয়েছেন। তাই আশা করছি তুই নিরাপদে য়ুরোপ ভ্রমণ শেষ করে নির্বিঘ্নে আমাদের কাছে ফিরে আসবি।

দাদার দেরি হয়ে যাচ্ছে। তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠি—আমি এবারে আসি দাদা!

—হ্যাঁ, এসো।

আমি রেলিং পার হয়ে আসি। পুলিস অফিসারকে পাসপোর্টখানা দিই। কম্‌পিউটরে আমার নাম ও পাসপোর্ট নম্বর সন্নিবেশিত করা হয়। তারপরে ভিসা পরীক্ষা করে ছবিখানি দেখেন। অবশেষে প্রথম পৃষ্ঠায় একটা গোল ছাপ মারেন—'A RPORT IMMIGRATION BOMBAY/DEPARTURE 27 MAY 1933/TERMINAL II' হিন্দীতে লেখা—'বম্বই বায়ুপত্তন আপ্রবাস প্রস্থ।' তারপরে পুলিস অফিসার সই করে পাসপোর্টখানি আমাকে ফেরত দিয়ে দেন, অর্থাৎ আমার ইমিগ্রেশান ক্লিয়ারেন্স হয়ে গেল।

তা হ'ল। কিন্তু একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারছি না—ইংরেজী ছাপের মধ্যে ঐ হিন্দী লেখাগুলোর সার্থকতা কি? আমি যেসব দেশে যাচ্ছি সেখানকার কোন বিমানবন্দরে কেউ যে ওগুলো বুঝতে পারবেন না।

যাই হোক পুলিস অফিসারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কাস্টমস অফিসারের সামনে আসি। তাঁকে পাসপোর্ট দিই। তিনি আমার স্যুইস ভিসা পরীক্ষা করে বোর্ডিং পাসের ওপর ছাপ মেরে সই করে দিলেন।

পেছনে তাকিয়ে দেখি দাদা তখনও দূরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাকে ইসারায় চলে যেতে বলি। দাদা খুশি মনে বিদায় নেয়। আমি সিকিউরিটি চেকিং-এর জন্য এগিয়ে চলি।

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে যায়। থমকে দাঁড়াই। তাই তো, আমার সঙ্গে যে একটা ইয়সিকা-৬৩৫ ক্যামেরা রয়েছে। সেটা তো পাসপোর্টে লিখিয়ে নেওয়া দরকার। নইলে ফেরার সময় ঝামেলায় পড়ব।

ফিরে আসি কাস্টমস অফিসারের কাছে। তাঁকে বলি কথাটা। তিনি জিজ্ঞেস করেন—ক্যামেরা কোথায়?

—স্যুটকেসে দিয়ে দিয়েছি।

—স্যুটকেস কোথায়?

—লাগেজে চলে গেছে।

—তাহলে তো পাসপোর্টে উল্লেখ করতে পারব না। আমাকে ক্যামেরাটা দেখাতে হবে।

মুশকিলে পড়া গেল। কাস্টমস অফিসার ও পুলিস অফিসারের অনুমতি

নিয়ে ছুটে এলাম সুইসএয়ার-এর কাউণ্টারে। যে মেয়েটি আমার মাল নিয়েছেন, তাঁকে সমস্যাটার কথা বলি। তিনি আমার টিকেট দেখতে চান। তারপরে বলেন—আপনার স্যুটকেস যে নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে!

—কিন্তু ক্যামেরাটার কথা পাসপোর্টে না লিখিয়ে নিলে ফেরার সময় বিপদে পড়ব।

—তাই তো! মেয়েটি কি যেন একটু ভাবেন। তারপরে একটা কাগজে আমার লাগেজ নম্বরটি লিখে নিয়ে সহসা ডাক দেন—রহমান!

—জী মেম্‌সাব!

—ইধার আও।

রহমান এসে সামনে দাঁড়ায়। কালো রোগা ও খাটো মানুষটি। দেখে মনে হচ্ছে গোয়ানিজ। তার পরনে সুইসএয়ারের ইউনিফর্ম।

মেয়েটি কাগজখানি তার হাতে দিয়ে আমাকে দেখিয়ে হিন্দীতে বলে—এই সাব্‌কে নিয়ে নিচে চলে যাও। এঁর স্যুটকেসটা খুঁজে দাও। ইনি সেটা খুলে একটা ক্যামেরা বের করে আনবেন।

রহমান গম্ভীরভাবে লাগেজ নম্বরটি পরীক্ষা করে। তারপরে বলে—এ স্যুটকেস তো বহুক্ষণ আগে নিচে চলে গেছে মেমসাব্! এ কি এখন খুঁজে পাওয়া যাবে?

—নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। মেয়েটি ধমক লাগান। তারপরে বলেন—তুমি এনাকে নিয়ে নিচে যাও, স্যুটকেসটা খুঁজে দাও।

রহমান আর কোন আপত্তি না করে আমাকে বলে—চলিয়ে। সে চলতে শুরু করে।

আমি মেয়েটিকে ধন্যবাদ দিয়ে তার সঙ্গী হই। সকালে সান্তাক্রুজ বিমান-বন্দরে সুইসএয়ারের সেই মেয়েটির কথা মনে পড়ছে। এ মেয়েটিও ভারতীয়। এরও মধুর ব্যবহার মুগ্ধ করল আমাকে। সেই একই প্রশ্ন ফিরে আসে—কোন ভারতীয় সংস্থায় চাকরি করলে এরা এমন হত কি?

রহমানের সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে চলি। এদিকটা বিমানক্ষেত্রের কর্ম-চারীদের জন্য নির্দিষ্ট, তাই লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। রহমান খুবই বিরক্ত। মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে কি যেন বলছে। বোধ করি নিজের মাতৃভাষায় আমার চতুর্দশ পুরুষের শ্রাদ্ধ করছে। আমি নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করি।

গোলকধাঁধার মতো অনেকখানি নির্জন পথ। বেশ খানিকটা সিঁড়ি পেরিয়ে অবশেষে আমরা এসে পৌঁছই টারম্যাক্‌-এর (বিমানক্ষেত্র) ধারে, একটা খোলা বারান্দার নিচে। দেখি সুইসএয়ার লেখা কয়েকটি মাল বোঝাই খোলা ট্রলি দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারই একটির কাছে পৌঁছে রহমান বলে—এই গাড়িতে আপনার স্যুটকেস রয়েছে। দেখিয়ে দিন, কোনটা আপনার!

স্যুটকেসটা তলার দিকে রয়েছে। তবু বের করতে তেমন একটা অসুবিধে

হয় না। আমি স্যুটকেস খুলে ক্যামেরা বের করে নিই। রহমান স্যুটকেস রেখে দিয়ে বলে—চলিয়ে!

আমি তার সঙ্গে ফিরে চলি। সত্যি বলতে কি ভারী আনন্দ হচ্ছে। এত সহজে যে সমস্যাটার সমাধান হবে আশা করতে পারি নি।

রহমান প্রথম থেকেই আমার প্রতি বিরক্ত। খুবই স্বাভাবিক, আমার ভুলের জন্য তাকে খানিকটা বাড়তি পরিশ্রম করতে হল। তাই আসার সময় আমার সঙ্গে একটি কথাও বলে নি। মাঝে মাঝে কেবল বিড়বিড় করে কি যেন বলেছে। কিন্তু এবারে সে কথা বলে এবং তা হাসিও এবং কোমল কণ্ঠে। জিজ্ঞেস করে—সাব্, আপ বিলায়েত যা রহা হ্যায়?

—যাবো। তবে এখন জুরিখ যাচ্ছি।

—সাব্, হামলোগ জুরিখ কো হি বিলায়েত বোলতা।

আমি মাথা নাড়ি।

এবারে রহমান কোমলতর কণ্ঠে বলে—সাব, আপ বড়ে আদমী। কিতনি অচ্ছি অচ্ছি সিটিমে সফর করেঙ্গে।

—তা করব। কিন্তু আমি কোন বড় আদমী নই। কয়েকজন বড়া আদমী আমার সফরের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

—আপ বহোৎ 'লাকি' হ্যায়।

—তা বলতে পারো।

—সাব্, ম্যাঁয় আপকি ক্যামেরা নিকাল দিয়া। হামে কুছ বকশিশ মিলনা চাহিয়ে।

কথাটা মিথ্যে নয়। ওকে কিছু দেওয়াই উচিত। কিন্তু আমার কাছে যে টাকা-পয়সা কিছুই নেই। বিমানবন্দরে এসে খরচাপাতির পরে যা কিছু অবশিষ্ট ছিল সবই দাদাকে দিয়ে দিয়েছি। কারণ ভারতীয় টাকা নিয়ে বিদেশে পাড়ি দেওয়া বেআইনী, অর্থহীনও বটে। টাকা বলতে এখন আমার কাছে রয়েছে পাঁচশ' ডলারের ট্রাভেলরস চেক আর নগদ কুড়ি ডলার দশ সেণ্ট—দু'শ' টাকার বিনিময়ে পকেট-মানি পেয়েছি। এটি এখন আমার কাছে যখের ধনের মতো।

তাই রহমানকে বলি—আমার কাছে তো টাকা-পয়সা কিছু নেই ভাই। হাতে যা ছিল সবই আমার দাদাকে দিয়ে দিয়েছি। সে বাড়ি চলে গেছে।

—আপকে পাস ডালার হোগী সাব্!

এরা বিমানবন্দরে কাজ করে, সবই জানে। সুতরাং বলতে হয়—তা আছে।

—হামে ডালার দিজিয়ে সাব্!

—লেকিন···

—উহু ম্যাঁয় একচেনজ্ কর লুঙ্গা সাব্। কুছ তক্‌লিফ নহী হোগী।

—তকলিফ্ তোমার নয়, তকলিফ আমার হবে।

—কেয়া তক্‌লিফ সাব্, একঠো ডালারকে লিয়ে আপকো কেয়া তক্‌লিফ

হোগী। একঠো ডালার দিজিয়ে সাব্, আপকো সফর বহোৎ অচ্ছী হোগী।

—মেরে পাস এক ডলার তো নহী হ্যাঁয় ভাইয়া, দো ডলারকা নোট হ্যাঁয়।

—ঠিক হ্যাঁয় সাব্,দো ডালার হি দিজিয়ে,আপকি সফর বহোৎ বড়ীয়া হোগী।

তাতে আর সন্দেহ কি? এক ডলার দিলে যতখানি 'বড়িয়া' হ'ত, দু ডলার দিলে তার চেয়ে বেশি বড়িয়া হবে। আমি কেবল বুঝতে পারছি না, তা কেমন করে হবে? পাঁচশ' বিশ ডলার সম্বল করে ছ'টি দেশ ভ্রমণে চলেছি। বিমান টিকেট রয়েছে এবং বাবুজি, তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও আমার বন্ধু-বান্ধবরা আমাকে সাহায্য করবেন। তাহলেও রোম এবং এথেন্সে আমার কেউ জানাশোনা নেই। হোটেলে থাকতে হবে। কাজেই পাঁচশ' বিশ ডলার থেকে যদি এখানেই দু' ডলার বকশিশ দিতে হয়...

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাই দিতে হল আমাকে। রহমান আমার কাছ থেকে কেড়ে নিল, এমন কথা বলতে পারছি না, তবে দিতে বাধ্য হলাম।

অবশেষে আমার প্রতীক্ষার অবসান হল। মাইক্রোফোনে সুইসএয়ার-১৭৯ নম্বর ফ্লাইটের যাত্রীদের বিমানে আরোহণ করবার আহ্বান জানানো হল। টি. ভি স্ক্রীনেও একই লেখা ফুটে উঠতে থাকল। আমি এম্বার্কমেন্ট লবী থেকে পাঁচ নম্বর গেটের দিকে এগিয়ে চলি। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার দরকার হচ্ছে না। আমি শুধু আমার ফ্লাইটের অন্যান্য যাত্রীদের অনুসরণ করছি।

এতদিন, এমন কি আজ সকালেও বিমানে আরোহণ করবার সময় গাড়িতে করে বিমানের কাছে পেঁচেছি। তারপরে সিঁড়ি দিয়ে বিমানে উঠেছি। কিন্তু আজ গাড়ি চড়তে কিম্বা সিঁড়ি ভাঙতে হল না। পাঁচ নম্বর গেট খুলে দেবার পরে আমরা একটা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত 'র‍্যাম্প্' (Ramp) বা 'প্যাসেজওয়ে'-তে প্রবেশ করলাম। কার্পেট বিছানো জেটির মত আলোকোজ্জ্বল পথটি দিয়ে এম্বার্কমেন্ট লবী থেকে একেবারে সোজাসুজি এসে বিমানে উঠলাম।

বিমান! হ্যাঁ, জানি বলেই বলছি বিমান, নইলে বলতাম রাজভবন। ডাকোটা ফকার ফ্রেন্ডশিপ, বোয়িং—৭০৭ ও ৭৩৭, প্রভৃতি বিভিন্ন বিমানে এর আগে আমি চড়েছি, কিন্তু এর সঙ্গে তাদের কোন তুলনাই হয় না। যেমন আকারে বড় তেমনি দেখতে সুন্দর। শুনেছি এর নাম ডি সি টেন, বিশ্বের বিমান-প্রযুক্তি-বিদ্যার সর্বাধুনিক অবদান। অন্যান্য বড় বিমানের মতই তিনটি শ্রেণী—ফার্স্ট ক্লাস, এগ্জিকিউটিভ ক্লাস ও ইকনমী ক্লাস। একেবারে সামনে কক্পিটের নিচে ফার্স্ট ক্লাস, তারপরে এগ্জিকিউটিভ এবং পেছনে ইকনমী ক্লাস। কিন্তু ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সয়ের বিমানগুলির মতো একটানা সিট নয়। ইকনমী ক্লাসটি তিন ভাগে বিভক্ত। আমি জায়গা পেয়েছি প্রথম ভাগে, আমার সিট নম্বর 10A, জানালার ধারে।

আমার পাশে আরেকটি আসন, তারপরে প্যাসেজ। প্যাসেজের পরে পাশাপাশি চারখানি আসন, তারপরে প্যাসেজ। ওপাশে আবার দুটি সিট। অর্থাৎ সব মিলিয়ে একসারিতে আটখানি আসন। আসনগুলো অপেক্ষাকৃত বড় এবং সামনে অনেকটা ফাঁকা। বেশ ভালভাবে পা মেলা যাবে, আর আসনটি পেছনদিকে অনেকটা হেলিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু ঘুমোনো যাবে কি? সটান না শুতে পারলে আমি যে আবার ঘুমোতে পারি না। না পারলেই বা ক্ষতি কি? একটা রাত বৈ তো নয়। সিটের সঙ্গে রিডিং লাইট রয়েছে, কারও অসুবিধে না ঘটিয়ে আমি লেখা-পড়া করতে পারব। অথবা গান শুনতে পারি। আমার সামনের সিটের পেছনে একটা থলি আছে। তাতে আমার জন্য 'ইয়ার-ফোন' রয়েছে। সেটা কানে দিয়ে আমার সিটের হাতলে জ্যাক্ বক্সে লাগিয়ে দিলে গান বাজনা শোনা যাবে—ফোর চ্যানেলড মিউজিক। শুনেছি সিনেমা যখন দেখানো হয়, তখনও এইভাবে ইয়ার ফোনের মারফতে কথা শুনতে হয়। আগেই বলেছি বিমান প্রযুক্তিবিদ্যার সর্বাধুনিক অবদান এই ডি. সি. টেন। বোয়িং ৭৪৭-এর মতো এর চারখানি ইঞ্জিন নয়, তিনখানি। দুখানি সামনে দুদিকে, আরেকখানি পেছনে—লেজের সঙ্গে। ফলে তেল কম লাগে। অবশ্য এর ক্ষমতাও কম, তিনশ'র মতো যাত্রী বহন করতে পারে। ৭৪৭ চারশ'র ওপরে যাত্রী বহন করে থাকে। কিন্তু সে বিমানের খরচ অনেক বেশি।

আমার পাশের সিটের ভদ্রলোক এলেন। দেখে আশ্বস্ত হলাম—তিনি ভারতীয়। বয়স বোধ করি বছর পঞ্চাশ। ভারী শান্ত ও সুশ্রী চেহারা। সদালাপীও বটে। নাম বললেন—এস এল. চাওড়া। একটা উইভিং মেশিন কোম্পানীর সিনিয়র সেল্স একজিকিউটিভ। প্রায় প্রতিমাসে জুরিখ যাতায়াত করেন। ভদ্রলোককে ভালো লাগে আমার।

তাঁকে সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিয়ে বলি—বাবা-বিশ্বনাথের করুণায় আমি য়ুরোপ ভ্রমণের একটা সুযোগ পেয়েছি। এর আগে যেমন যাই নি, এর পরেও হয়তো আর কোনদিন যাওয়া নাও হতে পারে। কাজেই আমাকে আপনার একটু শিখিয়ে-পড়িয়ে দিতে হবে।

—নিশ্চয়ই। মিঃ চাওড়া বলেন—আমি আপনাকে যতটা পারি সব বলে দেব। আপনি একেবারেই 'নার্ভাস' হবেন না। নার্ভাস হবার কি আছে?

সেকথা ওঁকে আমি বোঝাই কেমন করে? বরিশালের বাঙাল হয়ে সত্যি সত্যি সুইজারল্যাণ্ড চলেছি। তার ওপরে আবার এই প্রাসাদ সদৃশ বিলাসবহুল বিমান। আমি নার্ভাস হব না তো কে হবে?

সে যা-ই হোক, এমন একজন সহানুভূতিশীল অভিজ্ঞ মানুষকে আমার পাশের সিটে পাবার জন্য বাবা-বিশ্বনাথকে আবার ধন্যবাদ দিই।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই যাত্রী ওঠা শেষ হল। এ বিমানটি এসেছে ম্যানিলা থেকে, পথে কলম্বোতে নেমেছে একবার। আগের যাত্রীরা সবাই শুয়ে বসে

ছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ হয়তো কিঞ্চিৎ বিরক্ত আমাদের ওপরে। খুবই স্বাভাবিক, আমাদের আগমনে তাঁদের শান্তির ব্যাঘাত ঘটেছে। তাহলেও তাঁদের অনেকে আবার চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করছেন।

সহসা বিমানের আলো কমে গেল। তারপরেই ধূমপান বন্ধ করার এবং সিট-বেল্ট বাঁধার নির্দেশ জ্বলে উঠল। আমরা নির্দেশ পালন করে সোজা হয়ে বসি।

বিমানের ইঞ্জিন গর্জে উঠল। বিমান চলতে শুরু করল। বিমান মুল রাণওয়েতে পেঁছিল। বিমানের গতি বাড়ল। বিমান আকাশে উঠল—ওপরে আরো ওপরে। বিমান স্থির হল। প্রথমে ধূমপান ও পরে বেল্ট বাঁধার নির্দেশনামা নিভে গেল। আলোঝলমল বম্বে শহর পড়ে রইল পেছনে। আমি ভারতের মাটি ছেড়ে আরব সাগরের আকাশে উঠে এসেছি। জীবনে প্রথম দেশের মাটির কাছ থেকে বিদায় নিয়েছি। মনে পড়ছে মাইকেল মধুসূদনের সেই অমর-কবিতা—

'রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে।
প্রবাসে দৈবের বশে, জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে,—নাহি খেদ তাহে।...'

বিমানের আলো আবার বেড়ে গেল। এয়ারহোস্টেস এবং স্টুয়ার্টরা ছোট ছোট গাড়িতে করে পানীয় নিয়ে এলেন—ফলের রস, কোকাকোলা, বীয়ার এবং ওয়াইন। চাইলে এক পেগ ওয়াইন 'ফ্রি' পাওয়া যেতে পারে। তার বেশি পেতে হলে ডলারে দাম দিতে হবে। দাম অবশ্য কম, কারণ আন্তর্জাতিক বিমান মানেই ডিউটি ফ্রি শপ।

আমি এক গ্লাস কোকাকোলা নিলাম। এই জনপ্রিয় পানীয়টি বর্তমানে ভারতে নিষিদ্ধ। অতএব সুযোগ যখন পাওয়া গেছে, নিষিদ্ধ পানীয়ই পান করা যাক।

বিমানবন্দরে এসে আমি ও দাদা দু'কাপ কাফি পান করেছি। কিন্তু তা বহুক্ষণ আগের কথা। তারপরে ইমিগ্রেশান, কাস্টমস, সিকিউরিটি, বিশেষ করে ক্যামেরা উদ্ধারের জন্য প্রচুর ছুটোছুটি করতে হয়েছে। এমবার্কমেণ্ট লবীতে বসে একটা কাম্পা-কোলা খাবার খুব ইচ্ছেও হয়েছিল, কিন্তু ভারতীয় টাকা-পয়সা না থাকায় সে ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারি নি। এখন শীতল কোকা-কোলা আমার শরীর ও মন স্নিগ্ধ করে তুলল।

মন অবশ্য বিমানে আরোহণ করেই পূর্ণ হয়ে উঠেছে। একখানি বিমান যে এমন বিলাসবহুল, এত সুন্দর হতে পারে তা যেমন জানা ছিল না,তেমনি জানতাম না যে এমন বিমানে চড়ে আমি কোনদিন ইওরোপের ভূস্বর্গ সুইজারল্যাণ্ড রওনা হব। মনে মনে আবার বাবা-বিশ্বনাথের উদ্দেশে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। তিনি বাবুজি ও পিণ্টুবাবুর মাধ্যমে আমার স্বপ্নকে সত্য করে তুললেন।

এয়ারহোস্টেস আবার আবির্ভূতা হলেন। এবারে তাঁর সঙ্গে পানীয়ের পরিবর্তে

খাবারের ট্রলি কিন্তু এ খাবারকে কি বলব, ডিনার কিম্বা ব্রেক-ফাস্ট ! আমার ঘড়িতে এখন রাত সওয়া দুটো।

আমি এবং মিস্টার চাওড়া দুজনেই নিরামিষ খাবার চেয়েছি। আমি ঘরের বাইরে সাধারণতঃ আমিষ খাই না, আর মিঃ চাওড়া নিরামিষাশী।

খাবার কিন্তু চমৎকার। একেবারে হাতে গরম ফ্রায়েড রাইস, কড়াইশুঁটি সহযোগে আলুর দম ও ভেজিটেবল কাটলেট সঙ্গে টমেটো সস্, মাখন, নুন, মরিচ ও সালাড এবং দই, পাঁপড় ও মিস্টি সুপারি।

খাবারগুলো সবই পলিথিন কাগজ দিয়ে মোড়া। এগুলি খুলবার একটা বিশেষ নিয়ম আছে। মিঃ চাওড়া আমাকে সেটি শিখিয়ে দিলেন। বললেন—য়ুরোপের সর্বত্র আপনি এ রকমের প্যাকিং করা খাবার পাবেন। খুলবার এই কায়দাটা শিখে না নিলে আপনার অসুবিধে হবে।

খাবার পরে বাথরুম থেকে ঘুরে এলাম। সে আবার আরেক রাজসিক ব্যাপার। সাবান থেকে অডিকোলন, টয়লেট পেপার থেকে পেপার, টাওয়েল গরমজল—ঠাণ্ডাজল, ফ্ল্যাশ-বেসিন সব ব্যবস্থার সুষ্ঠু ও সুচারু সমাবেশ।

এবারে সাদা শক্তিশালী আলোগুলো নিভে গেল, কেবল প্যাসেজের নীল আলো অর্থাৎ নাইট-ল্যাম্প জ্বলতে থাকল। তার মানে যাত্রীরা এখন নিদ্রাদেবীর শরণ নিতে পারেন। ম্যানিলা এবং কলম্বোর যাত্রীরা নিশ্চয়ই খুশি হলেন। তাঁদের চোখে ঘুম। বম্বের অন্যান্য যাত্রীরা কি করবেন জানি না, তবে মিঃ চাওড়া রিডিং লাইট জ্বালিয়ে একখানি বই হাতে নিয়ে আধশোয়া হলেন। আমিও সিটটা হেলিয়ে আধশোয়া হয়ে যাই। তারপরে ইয়ারফোন কানে লাগিয়ে গান-বাজনা শুনতে থাকি। একটি নয়, চারটি চ্যানেলে গান কিম্বা বাজনা চলেছে। শুনতে মন্দ লাগছে না।

শুনতে শুনতে ভেবে চলি—কোথাকার মানুষ আমি আর কোথায় চলেছি। ঠিক কত ওপরে আছি জানি না, তবে অন্তত হাজার তিরিশেক ফুট ওপরে তো বটেই। প্রায় ঘণ্টাখানেক হল বম্বে থেকে রওনা হয়েছি। এখনও কি আমরা আরব সাগরের আকাশে রয়েছি ? বোধ করি, না, কারণ এক ঘণ্টায় কম করেও বম্বে থেকে আট/নয়শ' কিলোমিটার এগিয়ে এসেছি। অনুমান করছি এখন আমরা পাকিস্তানের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছি। দিন হলে একবার দেখে নেওয়া যেত। আজ ভিন্ন দেশ হলেও একদিন সে যে ছিল আমার জন্মভূমির অভিন্ন অংশ।

কিন্তু থাক, এই আনন্দের রাতে সে বেদনার কথা থাক। তার চেয়ে গান শুনতে শুনতে আজকের পথের কথা ভাবা যাক। পাকিস্তানের আকাশ থেকে আমরা পৌঁছব ইরানের আকাশে, তারপরে ইরাক সিরিয়া ও তুরস্কের আকাশ ছাড়িয়ে এজিয়ান সী (Aegean Sea) পার হব। যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীসের সীমারেখা অতিক্রম করে রোমের আকাশে পৌঁছব। রোম থেকে ভূমধ্যসাগরের

ওপর এবং অবশেষে আলপস অতিক্রম করে পৌঁছব জুরিখ।

তবে তার এখনও অনেক বাকি, অতএব গান-বাজনা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়া যাক। আমি শুনি সুইস গান ও বাজনা।

অন্যান্য দেশের মতো সুইজারল্যান্ডেও গান-বাজনা সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচয়। শুনেছি রাখাল বালকদের লোকসঙ্গীত এবং যন্ত্রসঙ্গীত (Orchestra) সুইসদের সবচেয়ে জনপ্রিয় গান ও বাজনা। সাধারণতঃ বিভিন্ন ধরনের ঢোল (Drum), তারের বাদ্যযন্ত্র (Zither), একর্ডিয়ান (Accoruian) এবং নানা রকমের ছোট বড় বাঁশি এদের অর্কেস্ট্রার প্রধান অঙ্গ।

ইয়ারফোনে শুনেও আমার তাই মনে হচ্ছে। তবে এই রেকর্ডগুলি সুইসএয়ার-এর নিজস্ব সংকলন। বিদেশী যাত্রীদের কাছে সুইস সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার জন্য গ্রন্থিত। সুইস সংস্কৃতির সঙ্গে আমার কোন সাক্ষাৎ পরিচয় নেই। কিন্তু এই গান-বাজনা শুনতে ভাল লাগছে আমার। আমি তাই শুনি, শুনি আর শুনি।

শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনে করতে পারছি না। ঘড়ি দেখি ন'টা বাজে, তার মানে অন্তত ঘণ্টা পাঁচেক ঘুমিয়ে নিয়েছি। অবাক কাণ্ড! তাহলে শরীর শ্রান্ত থাকলে সটান না শুতে পারলেও আমার ঘুম আসে, আমি আধশোয়া হয়ে ঘুমুতে পারি!

উইনডো স্ক্রীনটা সরিয়ে দিই, একমুঠো ভোরের আলো এসে আমার গায়ে আছাড় খেয়ে পড়ে। নিচে হালকা মেঘের সারি আর ওপরে নীল আকাশ। আকাশ নয়, মেঘমালাকেই বড় সুন্দর লাগছে। মাঝে মাঝে মেঘের ফাঁক দিয়ে নিচের পৃথিবীকে দেখা যাচ্ছে। মাটি জল বন পাহাড় ভারী ভাল লাগছে।

মিঃ চাওড়ারও ঘুম ভেঙে গেছে, তিনি ঘড়ি দেখে বললেন—আমরা এখন তুরস্কের ওপর দিয়ে চলেছি। এর পরে এজিয়ান সী পার হব, তারপরে গ্রীস ভূমধ্যসাগর ও ইতালীর ওপর দিয়ে সুইজারল্যান্ডের আকাশে পৌঁছব। আর ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে আমরা জুরিখে অবতরণ করছি। যান, তাড়াতাড়ি বাথরুম সেরে আসুন, এর পরে ভিড় হয়ে যাবে। তাছাড়া ব্রেকফাস্ট আসার সময়ও বোধ হয় হয়ে গেল।"

বাথরুম সেরে ফিরে আসার একটু পরেই ব্রেকফাস্ট পাওয়া গেল। ফলের রস রুটি মাখন জ্যাম জেলি আলুভাজা প্যাস্ট্রি ও চা কিম্বা কফি।

খাবার পরে আবার সিটে গা এলিয়ে দিলাম। গান শুনতে শুনতে নিচের জগৎকে দেখতে থাকি—ছবির মতো সুন্দর। ঐ তো আমার পৃথিবী—সসাগরা বসুন্ধরা। আমি ওর বুক থেকে যাত্রা করেছি আবার ওরই বুকে ফিরে যাবো, মাঝখানে কিছুক্ষণ কেবল এই মহাকাশে বিচরণ করছি।

কিছুক্ষণ, হ্যাঁ, কিছুক্ষণ বৈকি! মাত্র ন' ঘণ্টায় বম্বে থেকে জুরিখ পৌঁচচ্ছি। ভাস্কো ডা গামার কথা বাদই দিলাম। রাজা রামমোহন রায় প্রায় দেড় বছর বসে কলকাতা থেকে লণ্ডন গিয়েছিলেন। ১৮৩০ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর জাহাজ ছেড়েছিল, তিনি ১৮৩২ সালের এপ্রিল মাসে লণ্ডন পেঁছান। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর কথা থাক। মাত্র সাতাশ বছর আগেও ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ নামে আমার এক ইঞ্জিনীয়ার জামাইবাবুর কলকাতা থেকে লণ্ডন যেতে উনত্রিশ ঘণ্টা সময় লেগেছিল। পথে তেল নেবার জন্য করাচী, কুয়েত, বেইরুট ও রোমে বিমানকে নামাতে হয়েছিল। আর এখন কোথাও না নেমে প্রায় ন' হাজার কিলোমিটার পথ পেরিয়ে মাত্র এগারো ঘণ্টায় কলকাতা থেকে লণ্ডন চলে যাচ্ছে। আমরাও ন' ঘণ্টায় বম্বে থেকে জুরিখ পেঁছব।

ক্যাপ্টেনও তাই বলছেন। আমি ইয়ারফোনে বাজনা শুনছিলাম। সহসা বাজনার শব্দ স্তিমিত হল, ভেসে উঠল ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বর। তিনি বলছেন— আমরা এখন ইতালীর ওপর দিয়ে যাচ্ছি। কয়েক মিনিট বাদেই রোম মহানগরীকে বাঁদিকে রেখে এগিয়ে যাবো।

ভাবতে ভাল লাগছে, ফেরার পথে আমি রোম ও এথেন্স দর্শন করব। এজিয়ান সী আর ভূমধ্যসাগরে জলবিহার করব।

॥ তিন ॥

আমার স্বপ্ন সার্থক হল। ডি সি-টেন জুরিখের ক্লোটেন (Kloten) বিমানবন্দরে অবতরণ করল। রাণওয়ের ওপর দিয়ে খানিকটা চলে সে নিশ্চল হল।

ক্যাপ্টেন মাইক্রোফোনে আমাদের ধন্যবাদ দিয়ে জানালেন—জুরিখের আবহাওয়া চমৎকার, তাপমাত্রা ২৩০ সেণ্টিগ্রেড। এখন সময় সকাল সাড়ে সাতটা।

ঘড়ি দেখি বেলা এগারোটা। অর্থাৎ বম্বে থেকে এখানে এসে আমি সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় লাভ করলাম। তাড়াতাড়ি ঘড়ি ঠিক করে নিলাম। ফেরার সময় অবশ্য এই সময়টুকু লোকসান হবে। তখন আবার ঘড়ি এগিয়ে দিতে হবে।

তা হোক্ গে। আজ তো ভোরের সোনালী আলোয় আমার প্রথম দেখা হল জুরিখের সঙ্গে—য়ুরোপের সঙ্গে। গতকাল সকাল সাতটায় কলকাতা থেকে রওনা হয়ে আজ সকাল সাড়ে সাতটায় জুরিখ পেঁছিলাম। এর মধ্যে প্রায় সতেরো ঘণ্টা বম্বেতে ছিলাম। সে যাক গে, আজকের পুরো দিনটাই আমার হাতে। মনের আনন্দে ঘুরে নেওয়া যাবে।

মিস্টার চাওড়ার সঙ্গে বেরিয়ে এলাম বিমান থেকে। তেমনি র্যাম্প্ বা প্যাসেজওয়ে দিয়ে পেঁছিলাম টার্মিনাল বিল্ডিংস-য়ে। কিন্তু এ কোথায় এলাম ? এটা কি টার্মিনাল বিল্ডিংস, না ইন্দ্রপুরী ?

মিস্টার চাওড়া বিমানে বসে বলেছিলেন যে জুরিখ বিমানবন্দরটি ভারী সুন্দর, ছবির মতো। কিন্তু সেকথা শুনে আমার মনের ক্যানভাসে যে ছবি এঁকেছিলাম, এ যে তার চাইতে অনেক অনেক বেশি সুন্দর।

মেঝেতে পা দিয়েই চমকে উঠলাম। তারপরে সাজ-সজ্জা, অফিস, দোকান, বাথরুম আর আলোর বাহার। কেবলি চোখ ঝলসে যাচ্ছে।

ভিড়, হ্যাঁ, ভিড় আছে বৈকি। ভিড় তো থাকবেই। সুইজারল্যাণ্ডের কোন সমুদ্র উপকূল নেই। অথচ বছরে এক কোটি বিদেশী পর্যটক এদেশে বেড়াতে আসেন। তার ওপরে নিজেদের যাওয়া-আসা তো আছেই। যাতায়াত সবই প্রায় বিমানপথে। যদিও এদেশে চারটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর—জুরিখ, জেনিভা (Geniva), ব্যাসেল (Basel) এবং বার্ণ (Berne)। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিমানপথের জংশন হল জুরিখের এই ক্লোটেন (Kloten) এবং জেনিভার কয়েনট্রিন (Cointrin)। তার মধ্যে আবার জুরিখ বড়। সুতরাং জুরিখ খুবই ব্যস্ত বিমানবন্দর। এখানে পঞ্চাশটির ওপরে গেট আছে। সারা দিন-রাত ধরে প্রায় প্রতি পাঁচ-দশ মিনিটে একটি করে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট যাওয়া-আসা করছে।

অতএব ভিড় লেগেই আছে। ছুটোছুটিও যথেষ্ট আছে। কিন্তু চেঁচামেচি

কিম্বা ধাক্কাধাক্কি একেবারে নেই। এত ব্যস্ততার মধ্যেও একটা বিস্ময়কর নিয়মানুবর্তিতা। আর তারই ফলে সর্বদা সর্বত্র শান্ত ও ভদ্র পরিবেশ।

সিকিউরিটির ছাড়পত্র পেতে কোন সময় নষ্ট হল না। একবার পাসপোর্টটায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে অফিসার সেটিকে নিজের ডেস্কের একটা বিশেষ জায়গায় রেখে দিলেন কয়েক সেকেণ্ড। বোধ করি ফটো তুলে নিলেন। তারপরে সুইস ভিসার ওপর ছাপ মারলেন—'SCHWEIZ/E 28 MAI 83

ZURICH-FLUGHAFEN' (বিমানবন্দর)।

অর্থাৎ আজ ১৯৮৩ সালের ২৮শে মে আমি জুরিখ বিমানবন্দর দিয়ে সুইজারল্যাণ্ডে প্রবেশ করলাম।

মিস্টার চাওড়ার সঙ্গে মালপত্র পাবার জায়গায় এলাম। পাশাপাশি কয়েকটি কন্‌ভেয়ার বেল্ট। তারই একটির সামনে টি. ভি. স্ক্রীনে লেখা—SR 179

অর্থাৎ এখানেই আমাদের মাল আসবে। মিঃ চাওড়া গিয়ে দুটি ট্রলি নিয়ে এলেন। এ ট্রলিগুলো দেখছি বম্বে বিমানবন্দরের ট্রলিগুলির মতো ভারী নয়, বেশ হালকা। তাছাড়া দেখতে সুন্দর, জোরে চলে এবং শব্দ কম হয়, ঠিক মানুষগুলোর মতই। এঁরা সর্বদা ফিটফাট থাকেন, ছুটে চলেন এবং কখনই চেঁচামেচি করেন না।

ট্রলিটা আমার হাতে দিয়ে মিঃ চাওড়া বললেন—শুধু এয়ারপোর্টে নয়, প্রায় প্রত্যেক রেল এবং স্টীমার স্টেশনে এইরকম ট্রলি পাবেন, তাতে মাল নিয়ে আপনি কাছের বাসস্টপ কিম্বা ট্যাক্সিস্ট্যাণ্ড পর্যন্ত চলে যাবেন। তারপরে বাস অথবা ট্যাক্সিতে মাল তুলে ট্রলিটাকে সেইখানে রেখে যেতে পারেন। এয়ার-পোর্ট কিম্বা স্টেশনের কর্মচারীরা ট্রলিটাকে নিয়ে এসে যথাস্থানে রেখে দেবে।

—কিন্তু এমন সুন্দর ট্রলিটা রাস্তায় ফেলে রেখে গেলে কেউ চুরি করে নিয়ে যাবে না?

—না। মিঃ চাওড়া মৃদু হাসেন। বলেন—সুইজারল্যাণ্ডে চোর-ডাকাত আছে বলে শুনি নি। তবে য়ুরোপের যেসব দেশে চোর-ডাকাত আছে, সেসব দেশেও এসব জিনিস কেউ চুরি করে না। কারণ এগুলো জাতীয় সম্পত্তি।

—আচ্ছা ট্রলির এমন ঢালাও ব্যবস্থা কেন, য়ুরোপে কি কুলি নেই?

—না। মিঃ চাওড়া আবার একটু হাসেন। বলেন—শুধু কুলি নয়, এদেশে আপনি কারও বাড়িতে ঝি চাকর জমাদার প্রভৃতি দেখতে পাবেন না। এখানে অধিকাংশ লোকের গাড়ি আছে। কিন্তু কারও ড্রাইভার নেই। এখানে সব বাড়িতে লিফ্‌ট আছে, কিন্তু কোথাও 'লিফ্‌ট-ম্যান' নেই। শুধু তাই নয়, বাড়ি-ঘর সারানো অথবা রং করা, গাড়ি ধোয়ানো, জামাকাপড় কাচা, রান্না ও গৃহস্থালির বিভিন্ন যন্ত্র, টি ভি—টেপ্‌ রেকর্ডার, জলের কল বৈদ্যুতিক লাইন সারানো—সবই নিজেদের করতে হয়। না করতে পারলে এদেশে বাস করা মুশকিল হয়ে পড়ে। কারণ এখানে মজুরি অর্থাৎ মানুষের দাম বড়ই বেশি।

আমাদের স্যুটকেস পেতে দেরি হল না। ট্রলিতে মাল তুলে নিয়ে মিস্টার চাওড়ার সঙ্গে এগিয়ে চলি। গেটের কাছে এসে একবার দাঁড়াতে হয়। কাস্টমস্ অফিসার পাসপোর্ট দেখে মিঃ চাওড়াকে কিছু বললেন না কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—ট্যুরিস্ট্ ?

মাথা নেড়ে উত্তর দিলাম—হ্যাঁ।

—কোন বন্ধুর জন্য গাঁজা-ভাঙ নিয়ে আসেন নি তো ?

—না। কারণ আমার তেমন কোন বন্ধু এদেশে নেই।

—Thank you Have a nice trip. Enjoy Switzerland.

আমিও ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে আসি লাউঞ্জে। আবার সেই প্রশ্নটা মনে এলো—এ আমি কোথায় এলাম ? এ কি বিমানবন্দর, না ইন্দ্রপুরী ? শুধু ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে নয়, সযত্নে সুসজ্জিত। চমৎকার বসবার জায়গা, আলো-ঝলমল দোকান, বিন্যস্ত অফিস। কয়েক পা পরে পরেই টি ভি স্ক্রীন, তাতে ক্রমাগত বিমান আসা-যাওয়ায় খবর দেওয়া হচ্ছে। আর রয়েছে এসক্যালেটার—কোনটি ওপরে উঠছে কোনটি বা নিচে নামছে। আমি দেখছি আর দেখছি। দু-চোখ ভরে কেবলি দেখছি।

আমার মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরেই বোধ হয় মিঃ চাওড়া বলে উঠলেন—সত্যি তাকিয়ে থাকবার মতো। লণ্ডনের হিথ্‌রো (Heathrow) কিম্বা পারীর শার্ল-দ্য-গল (Charles de Gaulle)-এর চেয়ে অনেক বড় বিমান-বন্দর। সেখানে বড় বড় এয়ারওয়েজগুলোর জন্য পৃথক পৃথক টার্মিন্যাল। এখানে শুধু সুইসএয়ারের আলাদা টার্মিন্যাল। অন্য সব বিমানের জন্য একটি টার্মিন্যাল। কি করবে, একে ছোট দেশ তার ওপরে সমতল আরও কম, তাই বিমানবন্দরের জন্য অত জায়গা খরচ করতে পারে নি। অল্প জায়গা হলেও আধুনিকতম প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে এমনভাবে নির্মাণ করেছে যে এটি বিশ্বের একটি শ্রেষ্ঠ বিমানবন্দর। শুনলে, অবাক হবেন যে, এই এয়ারপোর্টের 'কার-পার্ক' মানে গাড়ি রাখার জায়গাটি হচ্ছে এই টার্মিন্যাল বিল্ডিংস-য়ের ছাদে। এবং সেটিও কয়েক তলা। প্রতি তলা থেকে যাত্রীরা যাতে সোজাসুজি বিভিন্ন টার্মিন্যাল বিল্ডিংস-এ চলে আসতে পারেন, তার জন্য এসক্যালেটর রয়েছে।

মিঃ চাওড়া থামতেই জিজ্ঞেস করি—আচ্ছা সুইসএয়ার তো সরকারী বিমানসংস্থা ?

—না, সম্পূর্ণ সরকারী নয়। এটা বেসরকারী কম্প্যানী তবে সরকারের শেয়ার রয়েছে।

—আচ্ছা কোন্ সালে এই কম্প্যানী স্থাপিত হয়েছে ?

—১৯৩১ সালে।

আশ্চর্য, সুইসএয়ার এবং আমার একই বয়স !

দেখতে দেখতে আর মিঃ চাওড়ার কথা শুনতে শুনতে তাঁর সঙ্গে এগিয়ে

চলেছি। শুধুই দেখছি আর শুনছি। বলতে পারছি না কিছু। আমার সব কথা যেন হারিয়ে গেছে। আমি কেমন অবশ ও হতবাক হয়ে গিয়েছি। কেবল একটা প্রশ্ন বার বার মনে আসছে—এ কি পৃথিবী না স্বর্গ ?

স্বর্গ ! হতেও বা পারে। কারণ সুইজারল্যাণ্ডকে যে য়ুরোপের ভূস্বর্গ বলা হয়।

মিস্টার চাওড়া বলেন—আমার এক সহকর্মীর গাড়ি নিয়ে আসার কথা আছে। সে নিশ্চয়ই এসে গেছে, সেণ্ট্রাল-লাউঞ্জে বসে আছে। চলুন, তার কাছে আমার ট্রলিটা রেখে আপনাকে রেলস্টেশনে দিয়ে আসি। আপনি তো জুগ্ (Zug) যাবেন, তাই না ?

মাথা নেড়ে বলি—হ্যাঁ। সেখানে গুগিতাল হোটেলে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

একবার ভাবি বলি, আমাকে দেখিয়ে দিলেই আমি রেলস্টেশনে চলে যেতে পারব। তারপরেই মনে হয়, ভদ্রতা করে নিশ্চয়ই বিপদে পড়ে যাবো। যদিও বা রেলস্টেশনে পেঁছিতে পারি, টিকেট কেটে ঠিক ট্রেনটি ধরতে পারব কি ?

তার চেয়ে লজ্জার মাথা খেয়ে চুপ করে থাকাই ভাল। তাছাড়া বাবা-বিশ্বনাথ যখন কৃপা করে এই পরোপকারী মানুষটিকে জুটিয়ে দিয়েছেন, তখন তাঁর সাহায্য না নেওয়া মানে বিশ্বনাথের প্রসাদ প্রত্যাখ্যান করা। এমন অন্যায় আচরণ করা একেবারেই উচিত হবে না। সুতরাং আর কিছু না বলে নিঃশব্দে মিঃ চাওড়ার সঙ্গে এগিয়ে চলি।

আমরা টার্মিন্যাল বিল্ডিংস-এর সেণ্ট্রাল লাউঞ্জে আসি। এ জায়গাটি আরও সুন্দর করে সাজানো, অনেক বড়ও বটে। দু'পাশে সারি সারি সোফা। বহু লোক বসে আছেন। কেউ নিজের ফ্লাইটের অপেক্ষায়, কেউ বা আত্মীয়-স্বজনের প্রতীক্ষায়।

আমাদের দেখতে পেয়েই জনৈক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক হাত নাড়েন, উঠে দাঁড়ান। মিঃ চাওড়া তাঁকে ইশারায় সেখানেই অপেক্ষা করতে বলেন। একটু বাদে আমরা তাঁর কাছে পেঁছিই। মিঃ চাওড়া করমর্দন করে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। আমিও করমর্দন করি। তারপরে মিঃ চাওড়া নিজের ট্রলিটা তাঁর হাতে দিয়ে বলেন—এটা নিয়ে তুমি এখানে ব'সো, আমি এই ভদ্রলোককে একটু রেল-স্টেশনে দিয়ে আসছি।

ভদ্রলোক মিঃ চাওড়ার হাত থেকে ট্রলিটা নিজের সামনে টেনে নেন। তারপরে বলেন—ঠিক আছে, আমি এখানেই অপেক্ষা করছি।

এবারে মিঃ চাওড়া সহসা আমার ট্রলিটা নিজের হাতে নিয়ে চলতে শুরু করেন। আমি আপত্তি করি। তিনি একটু হেসে বলেন—আমাদের এসক্যালেটারে নামতে হবে। আপনি ট্রলি নিয়ে চড়তে পারবেন না।

এসক্যালেটার মানে চলমান সিঁড়ি, কলকাতার রিজার্ভ ব্যাঙ্কে যে সিঁড়ি

রয়েছে। তাতে চড়তে না পারার কি ব্যাপার আছে? তাছাড়া তিনি আমাকে রেলস্টেশনে পৌঁছে দিতে চাইছেন। কোথায় সে স্টেশন, কত দূরে?

হঠাৎ মিঃ চাওড়া থমকে দাঁড়ালেন। আমিও চলা বন্ধ করি। পাশের একটা অফিস দেখিয়ে বলেন—এটা একস্‌চেঞ্জ ব্যাংক্‌। বম্বে বিমানবন্দরে যে বিশ ডলার পকেট-মানি পেয়েছেন, সেটা ভাঙিয়ে সুইস ফ্রাংক্‌ করে নিয়ে আসুন, আমি এখানে অপেক্ষা করছি।

হেসে বলি—বিশ ডলার নেই, দু' ডলার রহমানকে বকশিশ দিতে হয়েছে।

তারপরে তাঁকে ক্যামেরা অন্বেষণের কাহিনীটা বলি। সব শুনে তিনি বলেন—ঠিক আছে, আঠারো ডলারই ভাঙিয়ে নিয়ে আসুন। এখন তাতেই আপনার চলে যাবে।

ডলার ভাঙাতে সামান্যই সময় লাগল। ভিড় ছিল না বলা ঠিক নয়, কিন্তু কর্মীরা এত তাড়াতাড়ি কাজ করছেন যে কাউকে দু মিনিটের বেশি দাঁড়াতে হচ্ছে না। এঁদের কাছে যে সময়ের দাম বড়ই বেশি।

ডলার ভাঙিয়ে মিঃ চাওড়ার সঙ্গে আবার এগিয়ে চলি। চলতে চলতে তিনি জিজ্ঞেস করেন—কি রেট পেলেন?

—এক ডলারের বদলে আড়াই ফ্রাংক্‌। তার মানে, এক সুইস ফ্রাংক্‌ মানে চার টাকা।

—আড়াই ফ্রাংক্‌ হলে তাই দাঁড়ায়। তবে য়ুরোপে যতদিন আছেন, টাকা কথাটা ভুলে থাকবেন। নইলে প্রতি মুহূর্তে অযথা কষ্ট পাবেন। তার চাইতে এক ডলারকে এক টাকা মনে করে খরচ করবেন, দেখবেন বেশ শান্তিতে আছেন।

একটু বাদে আমরা এসে পৌঁছই এসক্যালেটারের সামনে। একটি নয়, দুটি এসক্যালেটার—একটা ওপরে উঠছে একটা নিচে নামছে। মিঃ চাওড়া এসে নেমে যাবার অংশের সামনে দাঁড়ালেন। বললেন—আমি ট্রলি নিয়ে নেমে যাচ্ছি, আপনিও আসুন।

বলতে বলতে তিনি মুহূর্তের মধ্যে আশ্চর্য তৎপরতায় ট্রলিটাকে একটা নিম্নগামী চলন্ত সিঁড়ির ওপর বসিয়ে দিয়েই নিজে তার ওপরের সিঁড়িটায় দাঁড়িয়ে পড়লেন। ট্রলি এবং মিঃ চাওড়াকে নিয়ে সিঁড়িগুলো নিচে ছুটছে।

ভদ্রলোক কেমন করে ট্রলি ধরে ঐ চলমান সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন বুঝতে পারছি না। তিনি তখন ঠিকই বলেছেন, আমি কিছুতেই ট্রলিসহ এই সিঁড়িতে চড়তে পারতাম না।

মিঃ চাওড়া প্রায় নিচে পৌঁছে গেলেন। আর দেরি করা ভাল দেখায় না। আমিও একটা সিঁড়ির ওপরে উঠে যাই। রেলিং ধরে থাকি। শুধু সিঁড়ি নয়, রেলিংটাও আমার সঙ্গে নিচে নামছে।

নিচে এসে পৌঁছই। আর পৌঁছেই বুঝতে পারি, কেন মিঃ চাওড়া আমাকে বার বার রেলস্টশনের কথা বলেছেন। আমরা রেলস্টেশনে এসে গেছি। বিমান-

বন্দরে টার্মিন্যালের নিচে রেলস্টেশন।

—পারী আর লণ্ডনেও আপনি একই জিনিস দেখতে পাবেন। মিঃ চাওড়া বলেন—তবে সেখানে 'মেট্রো', এখানে 'সারফেস' ট্রেন। সুইজারল্যাণ্ডে 'আণ্ডার-গ্রাউণ্ড' ট্রেন নেই, সবই মাটির ওপর দিয়ে।

—সত্যই ভারী মজার ব্যাপার!

—শুধু মজার নয়, সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয়ও বটে।

—কি রকম? আমি প্রশ্ন করি।

মিঃ চাওড়া উত্তর দেন—য়ুরোপে অধিকাংশ মানুষের গাড়ি আছে, কিন্তু কারও ড্রাইভার নেই। এই মহাদেশে বিমান এখন প্রায় আমাদের দেশের লোক্যাল ট্রেনের মতো। কাজেই বিমানবন্দরে তাঁদের হামেশাই আসতে হয়। অথচ একজন মানুষের পক্ষে ট্যাক্সিতে আসা অত্যন্ত ব্যায়সাপেক্ষ। ড্রাইভার না থাকায় তাঁরা গাড়ি নিয়েও আসতে পারেন না। ফলে সরকার বিমানবন্দরে বাস রেল কিম্বা মেট্রো নিয়ে এসেছেন। যাতে সাধারণ মানুষ অল্প ভাড়ায় সোজাসুজি বিমান-বন্দরে আসা-যাওয়া করতে পারেন। আপনি এখন এই রেলস্টেশন থেকে সুইজারল্যাণ্ডের যে কোন জায়গায় চলে যেতে পারেন।

কথা বলতে বলতে মিঃ চাওড়া আমাকে টিকেট কাউণ্টারের সামনে নিয়ে এসেছেন। এবার বলেন—একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট নিয়ে আসুন, বলবেন জুগ।

টিকেট কিনে গেটের কাছে আসি। ভাড়া নিল ১১ ফ্রাঙ্ক্ অর্থাৎ সাড়ে চার ডলারের মতো।

ভেতরে একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। মিঃ চাওড়া বলেন—এই ট্রেনটাই জুগ যাবে, মিনিট পাঁচেক পরে ছাড়বে। এখান থেকে জুরিখ শহর ১১ কিলোমিটার, সেখান থেকে জুগ সাতাশ কিলোমিটার। পেঁছিতে মিনিট পঞ্চাশ সময় লাগবে। যান গাড়িতে গিয়ে বসুন। এখানেও ট্রেনে দুটি শ্রেণী। বলা বাহুল্য, আপনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠবেন। য়ুরোপের ট্রেনে লেডিস কম্প্যার্টমেণ্ট নেই। য়ুরোপের মেয়েরা অবলা নন।

আমি তাঁর সঙ্গে করমর্দন করি। বলি—আপনার উপকারের কথা বহুদিন মনে থাকবে। ধন্যবাদ, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

—উপকারের কথা মনে না রেখে আমাকে মনে রাখলেই বেশি খুশি হব। আপনাকেও আমার বড় ভাল লাগল। এই কার্ডটা রাখুন। দেশে ফিরে চিঠি লিখে জানাবেন, সুইজারল্যাণ্ড ভ্রমণ কেমন হল?

একটু হেসে বলি—ভালই হবে।

—তা তো বটে।

—না, সেজন্য নয়।

—তাহলে?

—আপনার সঙ্গে দেখা হওয়া থেকেই বুঝতে পারছি, আমার যাত্রা শুভ। তা

নাহলে পথে বের হয়ে এমন উপকারী বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ?

অবশেষে বিদায় নিই। মাত্র ঘণ্টা দশেকের পরিচয়, তবু মানুষটিকে বড়ই আপন মনে হচ্ছে। ছেড়ে যেতে মন চাইছে না। কিন্তু ছাড়তে হয়, নিতে হয় বিদায়। আমি পথিক, পথের নিয়ম না মেনে উপায় নেই আমার।

বিদায় নিয়ে প্ল্যাটফর্মে আসি। ঝক্‌ঝকে প্ল্যাটফর্ম। কোথাও একটুকরো কাগজ পর্যন্ত পড়ে নেই। ট্রলিটা প্ল্যাটফর্মের ওপর রেখে স্যুটকেস হাতে নিয়ে গাড়িতে উঠি।

গাড়িগুলিও ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। গাড়িতে যাত্রীসংখ্যা সামান্য। গাড়িগুলো দেখছি আমাদের ব্রডগেজ রেলগাড়ির চেয়ে চওড়ায় ছোট। মিটারগেজ গাড়ি কি ? হয়তো হবে। এক সারিতে চারখানি করে সিট, মাঝখানে প্যাসেজ। প্রতি পাশে জানালার ধারে মুখোমুখি চারখানি সিট, মাঝখানে একটা টেব্‌ল। অবিকল আমাদের এ সি চেয়ার কার-এর মতো। গাড়ির দেওয়ালের সঙ্গে প্রতি খোপে একটি করে 'বিন্‌স'—ময়লা ফেলার জন্য। গাড়িতে কোন ফ্যান নেই। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ি। এখন গ্রীষ্মকাল, তাই ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে।

গাড়ির দু'দিকের দেওয়ালের প্রায় সবটাই কাচের। জানালা বলে আলাদা কিছু নেই। তবে প্রতি খোপের দেওয়াল দুটি অংশে বিভক্ত। ওপরের অংশটি খুলে দেওয়া যায়।

আগে বলেছি, আবারও বলছি, গাড়িগুলো স্টেশন ও প্ল্যাটফর্মের মতই পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। কোথাও একটু ধুলো পর্যন্ত লেগে নেই। কি জানি, এদেশে বোধ করি ধুলো বা ধোঁয়া বলে কিছু নেই।

সাড়ে সাতটায় বিমান অবতরণ করেছে, আর এখন আটটা বেজে দশ। তার মানে মাত্র চল্লিশ মিনিটের মধ্যে আমি বিমান থেকে নেমে ইমিগ্রেশান ও কাস্টমস্‌-এর নিয়ম-কানুন পালন করে ডলার ভাঙিয়ে মালপত্র নিয়ে বিমানবন্দর থেকে রেলস্টেশনে এসেছি। রেলের টিকেট কেটে গাড়িতে চড়ে বসেছি। এটা অবশ্য মিস্টার চাওড়ার জন্যই সম্ভব হয়েছে। আমি একা হলে জিজ্ঞেস করে করে জেনে নিয়ে সবকিছু করে এখানে পৌঁছতে হত। তাতে অনেক সময় লেগে যেত। এ ট্রেনটা তার আগেই চলে যেত। আমাকে হয়তো এর পরের ট্রেনে যেতে হত। তবে খুব একটা দেরি হত না। কারণ আধঘণ্টা বাদে বাদেই ট্রেন আছে।

অথচ ট্রেনে একদম ভিড় নেই। এই কম্পার্টমেন্টে ষাট/সত্তরজন যাত্রী বসতে পারেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত মাত্র আটজন যাত্রী উঠেছেন। আর উঠবেন কি ? কখন উঠবেন ? গাড়ি ছাড়ার সময় হয়ে এলো যে !

গার্ডের বাঁশি বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে গাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল। গাড়ি চলতে শুরু করল। গাড়ির দরজা-জানালা সবই বন্ধ। সুতরাং শব্দ সামান্যই হচ্ছে। কিন্তু কাচের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে বুঝতে পারছি গাড়ি বেশ জোরে চলেছে। দু-পাশের দৃশ্যকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে রঙীন চলচ্চিত্র দেখছি।

আমি জুরিখ বিমানবন্দর থেকে জুগ চলেছি। মিঃ চাওড়া বলেছেন জুগ জুরিখের শহরতলী, যেমন বম্বের কল্যাণ কিম্বা কলকাতার কাঁচরাপাড়া। তবে একটা তফাৎ আছে, জুগ সুইজারল্যাণ্ডের একটি 'ফ্রি-ট্রেড জোন'। অর্থাৎ ওখানে অফিস কিম্বা কারখানা করে ব্যবসা-বাণিজ্য করলে কোন ট্যাক্স দিতে হয় না। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলগুলির উন্নয়নের জন্য সুইস সরকার ব্যবসায়ীদের এরকম সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকেন।

কিন্তু জায়গাটা নাকি ভারী শান্ত ও সুন্দর। হ্রদ, বন আর পাহাড় দিয়ে ঘেরা, একেবারে ছবির মতো। ভাল না হলে বাবুজী কেন সেখানে আমার থাকার ব্যবস্থা করবেন?

আগেই বলেছি, গাড়ি বেশ জোরে চলেছে। এখন আমরা জুরিখ শহরের ভেতর দিয়ে চলেছি। রেলপথের দুপাশেই বাড়ি-ঘর। কোথাও বহুতল স্কাই-স্ক্র্যাপার, আবার কোথাও বা চার-পাঁচতলা। সবই আধুনিক বাড়ি, কিন্তু টালির চাল। শীতের দেশ, প্রতি বছর বরফ পড়ে, ঢাল না থাকলে বরফের ভারে ছাদ ভেঙে যাবে। তাই য়ুরোপে কাঠের চাল করে তার ওপরে টালি ছেয়ে দেওয়া হয়।

আমরা ক্লোটেন বিমানবন্দর থেকে প্রায় সোজাসুজি দক্ষিণে এসেছি। জুরিখ শহরের উত্তরে ক্লোটেন। দূরত্ব এগারো কিলোমিটার। এই পথটুকু রেলে আসতে মিনিট পনেরো সময় লেগেছে।

জুরিখ সেন্ট্রাল রেলস্টেশনে এসে গাড়ি থামল। বিরাট স্টেশন। ব্যস্ত তো বটেই। সহযাত্রীরা কয়েকজন নেমে গেলেন। তাঁরা এখান থেকে রেলে চড়ে য়ুরোপের যে কোন জায়গায় চলে যেতে পারবেন।

কামরা কিন্তু যাত্রীশূন্য হল না। বরং যাত্রীসংখ্যা বাড়ল। বেশ কয়েকজন নারী-পুরুষ এখান থেকে ট্রেনে উঠলেন। মিনিট পাঁচেক বাদেই গাড়ি আবার চলতে শুরু করল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা জুরিখ শহরের ঘনবসতি অঞ্চল ছাড়িয়ে এলাম। এখন আমাদের বাঁদিকে হ্রদ—জুরিখ সী (Zurich See)। সুইসরা হ্রদকে See অথবা Lac বলেন।

জুরিখ হ্রদের উত্তর তীরে জুরিখ শহর। হ্রদ সুইজারল্যাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক অবদান। এদেশে হ্রদের সংখ্যা অনেক। ফ্রান্স সীমান্তের লেক লেমাঁ (Lac Leman) এবং জার্মান সীমান্তের কনস্তানৎস (Kon·tanz) হল আয়তনে সুইজারল্যাণ্ডের সবচেয়ে বড় হ্রদ। জেনিভা শহর লেক লেমাঁর তীরে অবস্থিত। নয়সাতেল (Neuchatel) লম্বায় সবচেয়ে বড় সুইস হ্রদ। জুরিখ, লুসার্ন ও জুগ হ্রদের স্থান এগুলির পরে। একটা কথা জেনে আনন্দিত হয়েছি, জুগের হ্রদটিও নাকি ভারী সুন্দর এবং আমার হোটেলটি সেই হ্রদেরই তীরে।

জুরিখ সেন্ট্রাল থেকে আমরা দক্ষিণ-পূবে চলেছি। এখন হ্রদকে বাঁয়ে রেখে ডাইনে অর্থাৎ পশ্চিমে যাচ্ছি। পুলের ওপর দিয়ে একটা ছোট নদী পেরিয়ে

এলাম। মিস্টার চাওড়া বলেছেন, এ নদীটার নাম সিহি (Sihi)। দুটি নদী জুরিখ শহরের ভেতর দিয়ে গিয়েছে লিম্যাৎ (Limmat) ও সিহি। লিম্যাৎ এসেছে জুরিখ সী থেকে আর সিহি নদী সিহি সী থেকে। সিহি সী ছোট হ্রদ, জুরিখ হ্রদের দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত।

নদী পেরিয়ে আমাদের ট্রেন তীরভূমি ধরে চলেছে। জলের ধার দিয়ে রেল লাইন। একটি নয় দুটি লাইন। আমাদের গাড়ি ডানদিকের লাইনটি দিয়ে ছুটে চলেছে। একমাত্র গ্রেট বৃটেন ছাড়া য়ুরোপের সর্বত্র পথের ডানদিক দিয়ে গাড়ি চলে।

জুরিখ হ্রদের মতো সিহি নদীর বুকেও ছুটে বেড়াচ্ছে নানা জলযান। তবে হ্রদের বুকে পর্যটকরা জলকেলি করছিলেন আর এখানে যাত্রী এবং পণ্য চলাচল করছে। আমরা নদীকে পুজো করি আর এঁরা নদীকে যত্ন করেন। ফলে আমাদের নদী মরে যায় আর এঁদের নদী বেঁচে থাকে।

রেলপথের পাশেই মোটরপথ, ন্যাশনাল হাইওয়ে। পাহাড়ী জায়গা, তাই নদীর উপত্যকা দিয়ে রেলপথ ও মোটরপথ তৈরি করেছেন।

হঠাৎ গাড়ির সব আলোগুলো একসঙ্গে জ্বলে উঠল। আর তারপরেই আমরা একটা টানেল বা মানুষের তৈরি গুহায় প্রবেশ করলাম।

বেশ লম্বা টানেল। পেরোতে আট মিনিট সময় লাগল। তার মানে ছ/সাত কিলোমিটার পথ। কি কঠোর পরিশ্রম করে এঁরা দেশকে উন্নত করেছেন।

টানেলে ঢোকার পরেই সিহির সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। আমরা এখন একটা সবুজ উপত্যকার ওপর দিয়ে চলেছি। রেলপথের দুপাশেই সবুজের ছড়াছড়ি, কোথাও বন, কোথাও ক্ষেত। আর দূরে পাহাড়ের রেখা। সত্যি সুইজারল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপরূপ।

সুইজারল্যাণ্ড, হ্যাঁ, ইংরেজদের মতো আমরাও এ দেশকে Switzerland বলি। কিন্তু প্রতিবেশীদের কাছে এদেশের ভিন্ন ভিন্ন নাম। যেমন জার্মানরা বলেন 'Schwiez' ফরাসীরা 'Suisse' ইতালীয়ানরা 'Svizzera' আর লাতিনে এদেশের নাম 'Helvetia'। সুইজারল্যাণ্ডে লাতিন ভাষাভাষী মানুষদের সংখ্যা শতকরা মাত্র একজনের মতো, তবু এই Helvetia শব্দটাই ডাকটিকেটের ওপর লেখা থাকে।

সুইজারল্যাণ্ড একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতান্ত্রিক কনফেডারেশান। বাইশটি ক্যাণ্টন (Canton) বা জেলায় বিভক্ত। জুরিখ এবং জুগ দুটি পৃথক ক্যান্টন।

সুইজারল্যাণ্ড মধ্য-য়ুরোপে অবস্থিত। এই দেশের উত্তরে পশ্চিম-জার্মানী, পূবে অস্ট্রিয়া, দক্ষিণ-পূবে ও দক্ষিণে ইতালী এবং দক্ষিণ-পশ্চিম, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে ফ্রান্স। ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সুইজারল্যাণ্ড তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে নিকট-সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে।

আকারের দিক থেকে অত্যন্ত অসমান এই দেশ—কোথাও লম্বা কোথাও

সরু। এর আয়তন ৪১,২৮৮ বর্গকিলোমিটার। তার মধ্যে যেখানে সবচেয়ে বেশি লম্বা সেখানকার দৈর্ঘ্য ৩৬৪ কিলোমিটার আর যেখানটা সবচেয়ে বেশি চওড়া সেখানকার প্রস্থ ২২০ কিলোমিটার। অর্থাৎ দেশটি লম্বায় হাওড়া থেকে ঝাঝা আর চওড়ায় হাওড়া থেকে সীতারামপুর।

এর মধ্যে আবার কোথাও পাহাড়, কোথাও মালভূমি, কোথাও বনভূমি আবার কোথাও বা হ্রদ। দেশের মোট আয়তনের শতকরা ২২.৬ ভাগ জুড়ে শুধুই পাথর, বরফ আর হ্রদ, সেখানে কোন গাছপালা পর্যন্ত জন্মায় না। শতকরা ২৪.৮ ভাগ জুড়ে বনভূমি আর ২৪.৩ ভাগ জুড়ে আলপসীয় তৃণভূমি। অর্থাৎ দেশের মোট আয়তনের মাত্র ২৮.৩ অংশের মাটি উর্বর ও চাষাবাদের উপযোগী। এই শস্যশ্যামলা অংশের আয়তন মাত্র ১১,৬৮৪.৫০ বর্গ কিলোমিটার।

ক্ষুদ্র দেশ সুইজারল্যাণ্ড, ক্ষুদ্রতর তার জনসংখ্যা—মাত্র ৬৫ লক্ষ মানুষ। হ্যাঁ, সত্যই মানুষ। তাঁরা তাঁদের এই ক্ষুদ্র দেশটিকে নানা দিক থেকে জগদ্বরেণ্য করে তুলেছেন।

সুইজারল্যাণ্ড বিশ্বের সবচেয়ে আস্থাভাজন নিরপেক্ষ দেশ, তাই ক্রুশ (Cross) এদেশে জাতীয় পতাকার প্রতীক এবং এই দেশের জেনিভাতেই আন্তর্জাতিক রেডক্রসের সদর দপ্তর। জেনিভার সমাজসেবী অঁরি দুন (Henry Dunant) ১৮৬৪ সালে জেনিভায় এই মানবসেবা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সুইজারল্যাণ্ড রাষ্ট্রসংঘের সদস্য নয়। কিন্তু বিশ্বসমস্যা সমাধানের জন্য বৃহৎ শক্তিবর্গের সবচেয়ে জনপ্রিয় মিলনস্থল। ১৮১৫ সালের ভিয়েনা কংগ্রেসে সুইজারল্যাণ্ড নিরপেক্ষতার যে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে, আজও সে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সেই আদর্শ রক্ষা করে চলেছে। ১৭৯৮ সালে ফরাসী বিপ্লবী বাহিনীর আক্রমণের পর থেকে আজ পর্যন্ত সুইজারল্যাণ্ড আর কোন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে নি। এমন কি দুটি বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত তাঁদের নিরপেক্ষতার আদর্শ রক্ষা করেছেন।

ঘড়ি ওষুধ ও কম্পিউটর শিল্প এবং ব্যাংক ও ইনসিওরেন্স ব্যবসায়ে সুইজারল্যাণ্ড বিশেষ অগ্রণী। কেবলমাত্র জুরিখ শহরেই সাড়ে তিনশ' ব্যাংক রয়েছে। সুইস ব্যাংকে টাকা রাখা পৃথিবীর সব দেশের ধনীদের একটি ঐকান্তিক ইচ্ছা। সুইজারল্যাণ্ডে সমুদ্র নেই, কিন্তু এদেশের ম্যারাইন ইনসিওরেন্স কম্প্যানীগুলো বিশ্ববিখ্যাত। শুনেছি জুরিখ শহরের শতকরা তিরিশ ভাগ স্থায়ী বাসিন্দা ব্যাংক অথবা ইনসিওরেন্স কম্পানীতে চাকরি করেন।

কম্পিউটর এবং ওষুধ শিল্পেও সুইজারল্যাণ্ড অত্যন্ত অগ্রণী। কিন্তু শুনেছি সে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে পর্যটন ব্যবসায়ে। পঁয়ষট্টি লক্ষ মানুষের দেশে বছরে প্রায় এক কোটি বিদেশী পর্যটক ভ্রমণে আসেন। এবং প্রতি বছর এই আগন্তুকদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ফলে ভারতে যেখানে জনপ্রতি গড়

জাতীয় আয় ১৩৫ ডলার, সুইজারল্যাণ্ডে সেখানে ৬৩৫০ ডলার। অর্থাৎ এঁদের জাতীয় আয় আমাদের সাতচল্লিশ গুণ।

কেন? এর কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্যই আমার সবার আগে এদেশে আসা। য়ুরোপের অন্যান্য দেশ, আমেরিকা ও জাপান প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশ থেকে এত মানুষ কেন সুইজারল্যাণ্ডে ভ্রমণে আসেন? অথচ এদেশে দক্ষিণ-ফ্রান্স কিম্বা স্পেনের মতো কোন জনপ্রিয় সমুদ্র-সৈকত নেই, ভ্যাটিক্যানের মতো কোন বিশ্ববিখ্যাত গীর্জা নেই, ভার্সাই-য়ের মতো কোন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রাসাদ নেই। কেবল আছে আল্পস। কিন্তু আল্পস তো ফ্রান্স আর ইতালীতেও আছে। তাহলে সেসব দেশে না গিয়ে মানুষগুলো এমন পাগলের মতো এদেশে ছুটে আসেন কেন?

॥ চার ॥

নির্দিষ্ট সময়ে জ্বগ স্টেশনে এসে ট্রেন থেমে গেল। জ্বরিখ সেণ্ট্রাল থেকে জ্বগ ২৭ কিলোমিটার। লোকাল ট্রেনে এই পথটুকু আসতে মাত্র আধঘণ্টা সময় লেগেছে। খ্ববই স্বাভাবিক, এদেশে যে মান্বষের হাতে সময় বড়ই কম।

আমাদের গাড়িটার যাত্রা এখানেই শেষ হয়ে গেল। অতএব তাড়াহ্বড়োর দরকার নেই। শেষ না হলেও তাড়াহ্বড়োর কিছ্ব ছিল না। এই ক'টি যাত্রী, নামতে আর কতই বা সময় লাগবে।

স্বাটকেস, ও ব্যাগ নিয়ে নেমে আসি প্ল্যাটফর্মে। এখানেও দেখছি ট্রলি রয়েছে। রয়েছে যখন, তখন আর অযথা কষ্ট করি কেন?

ট্রলিতে মাল নিয়ে গেটের দিকে এগিয়ে চলি। এতবড় লম্বা গাড়ি অথচ শ'খানেক যাত্রীও বোধ করি আসে নি। অতএব প্ল্যাটফর্ম পার হয়ে আসতে সময় সামান্যই লাগল।

গেটের সামনে একজন টিকেট-কালেক্টর দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর হাতে টিকেট-খানি দিতেই তিনি ম্দ্ব হেসে ধন্যবাদ দিলেন।

ট্রলিটা থামিয়ে হ্যাণ্ডব্যাগের সাইডপকেট থেকে বাব্বজীর টেলেক্সটা বের করি। লেখা রয়েছে—আমি যেন বিমানবন্দর থেকে রেলে জ্বগ এসে এখান থেকে বাসে করে হোটেল গ্বগিতাল-এ চলে যাই।

প্রথমে স্বইসএয়ার আমার জন্য জ্বরিখে হোটেল 'গেলাবেনহোপ' 'ব্বক' করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বাব্বজীকে সেই সংবাদ জানালে তিনি ঐ টেলেক্স পাঠিয়েছেন। ভালই হয়েছে, আমি বাব্বজীর সঙ্গে একই হোটেলে থাকব।

যাক্‌গে যে কথা ভাবছিলাম। বাব্বজী এখান থেকে বাসে করে হোটেল গ্বগিতালে চলে যেতে বলেছেন। কিন্তু কোথায় বাস, কত নম্বর বাস?

স্টেশনের বাইরে আসি। ছোট স্টেশন কিন্তু যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তেমনি স্বন্দর করে সাজানো। আশ্চর্য, এটি নাকি এঁদের অন্বন্নত অঞ্চল! সে যাই হোক, এখন আমি আমার হোটেলে যাবার বাস কোথায় পাই? কাকেই বা জিজ্ঞেস করি? লোকজন দেখতে পাচ্ছি না যে! এতগ্বলো মান্বষ আমার সঙ্গে গাড়িতে এলেন, তাঁরা কোথায়? এরই মধ্যে সবাই চলে গেলেন!

আমি একটা মাঝারি আকারের হলঘরে এসে দাঁড়িয়েছি। এখানেই স্টেশন-মাস্টারের অফিস ও টিকেট-কাউণ্টার। কিন্তু কোন লোক নেই।

না, আছে। ঐ যে একজন ভদ্রলোক এদিকে আসছেন। আমি তাড়াতাড়ি ট্রলি ঠেলে তাঁর কাছে এগিয়ে আসি। নমস্কার করে ইংরেজীতে বলি—হোটেল গ্বগিতাল যাবার বাস কোথায় পাবো?

ভদ্রলোক একটুকাল চুপ করে থাকেন। কি যেন ভাবেন। তারপরে হাত নেড়ে আমাকে অপেক্ষা করতে বলে তাড়াতাড়ি স্টেশন মাস্টারের অফিসের ভেতরে ঢুকে যান।

ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। ভদ্রলোক কি বোবা, না ভাষা-বিভ্রাট? তাই বোধ করি হবে। সুইজারল্যাণ্ডের জাতীয় ভাষা চারটি। ১৮৭৪ সালে ফেডারেল পার্লামেণ্টে জার্মান, ফ্রেঞ্চ এবং ইতালীয়ান জাতীয় ভাষা রূপে স্বীকৃতিলাভ করে। ১৯৩৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী থেকে লাতিন ভাষাও জাতীয় ভাষা রূপে স্বীকৃতিলাভ করেছে। ফ্রান্স, ইতালী ও অস্ট্রিয়া সীমান্তের খানিকটা অংশ জুড়ে ফ্রেঞ্চ, ইতালীয়ান ও লাতিন ভাষাভাষী অধিবাসীরা বাস করেন। দেশের বৃহত্তর অংশ জুড়ে অর্থাৎ প্রায় সমগ্র উত্তর ও মধ্যাঞ্চল এবং দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের অনেকখানি অংশ জুড়েই জার্মান ভাষাভাষী মানুষদের বাস। শতকরা সত্তরজন মানুষই জার্মান ভাষাভাষী। অন্যান্যদের মধ্যে শতকরা উনিশজন ফ্রেঞ্চ ও দশজন ইতালীয়ান এবং মাত্র একজনের মতো লাতিন ভাষায় কথা বলেন। জুরিখ জুগ ও লুসার্ন সহ রাজধানী বার্ন—সবই জার্মান অঞ্চলে। জেনিভা অবশ্য ফরাসী অঞ্চলে।

এই চারটি ভাষা ছাড়াও আঞ্চলিক শ্বাসাঘাত (ঝোঁক) সহ বহু সুইস জার্মান উপভাষা এদেশে প্রচলিত আছে। এই সব উপভাষাকে সাধারণ ভাবে সুইজেদশ (SCHWYZERDIITSCH) বলে। তবে এইসব উপভাষা-ভাষীরা একে অপরের ভাষা বুঝতে পারেন না। যেমন আমরা চট্টগ্রাম কিম্বা শ্রীহট্টের বাংলা বুঝতে পারি না।

এতগুলি নিজস্ব ভাষা থাকা সত্ত্বেও শুনেছি পর্যটন ব্যবসার প্রয়োজনে সুইসরা অনেকেই আজকাল মোটামুটি ইংরেজী বলতে ও বুঝতে পারেন। সেই ভরসাতেই ভদ্রলোককে আমি ইংরেজীতে হোটেল গুগিতাল যাবার বাস-এর কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি এদেশেও ভাষা-বিভ্রাটের শিকার হতে হবে।

কিন্তু আমার দুর্ভাবনা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। দরজা খুলে সেই ভদ্রলোক বেরিয়ে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে আরেকটি যুবক। আগের ভদ্রলোক আমাকে দেখিয়ে তাঁকে কি যেন বলেন। তিনি এগিয়ে আসেন আমার কাছে। বলেন—গুড মর্নিং।

—মর্নিং।

এবারে যুবকটি পরিষ্কার ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করেন—আপনি কোথা থেকে এসেছেন?

—ক্যালকাটা, ইণ্ডিয়া।

—ক্যালকুট্টা, ইণ্ডিয়া! গুড, ভেরী গুড। এখন কোথায় যেতে চাইছেন?

আমি পকেট থেকে বাবুজীর টেলেক্স মেসেজটা বের করে তাঁর হাতে দিই।

তিনি ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলেন—হ্যাঁ, যেতে পারেন। এখান থেকে এক বাসে আপনি একেবারে হোটেল গুগিতালের সামনে পৌঁছে যাবেন।

—কত নম্বর বাস ?

—এগারো।

—কোথায় পাবো ?

—চলুন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

তারপরে যুবকটি জার্মান ভাষায় কি যেন বলেন আগের ভদ্রলোককে। তিনি ঘাড় নাড়েন। একখানি হাত তুলে একটু হেসে আমার দিকে তাকান। বুঝতে পারছি তিনি বিদায় চাইছেন। আমি সহাস্যে দুহাত তুলে নমস্কার করি। ওরা দুজনেই হেসে দেন। ভদ্রলোক বিদায় নিয়ে অফিসের ভেতরে ঢুকে যান।

যুবকটি ইংরেজীতে বলেন—আসুন, আমার সঙ্গে।

ট্রলি নিয়ে তাঁর সঙ্গী হই। স্টেশনের বাইরে আসি। এখানে গাড়ি-বারান্দার মতো খানিকটা বাঁধানো জায়গা রয়েছে। তার একদিকে রেললাইন, আরেকদিকে রাস্তা। রাস্তাটা এখানে পৌঁছে একটা সুপ্রশস্ত বাঁধানো চত্বরে পরিণত। চত্বরটা বৃত্তাকারে ওপাশের পথের সঙ্গে মিশেছে।

যুবকটি একটা জায়গায় এসে বলেন—আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। এগারো নম্বর বাস এসে এখানেই দাঁড়াবে। বাসে উঠে গুগিতাল বলবেন, পায়লট আপনাকে নামিয়ে দেবেন।

যুবকটির সঙ্গে করমর্দন করি, তাঁকে ধন্যবাদ দিই। তিনি চলে যান।

নীরবে দাঁড়িয়ে তাঁর কথাই ভাবতে থাকি। না, শুধু তাঁর কথা নয়, তাঁকে যিনি ডেকে নিয়ে এসেছেন, সেই সহৃদয় ভদ্রলোকের কথাও ভাবতে হয় বৈকি! আর এই ভাবনার ভেতর দিয়ে বুঝতে পারি, পর্যটন ব্যবসায় বিস্ময়কর সাফল্যের চাবিকাঠি কোথায় ? এরা প্রত্যেকে প্রত্যেক পর্যটককে অতিথি জ্ঞান করেন। দেশের মানুষদের মাঝে এই মানসিকতা সৃষ্টি না করতে পারলে পর্যটন ব্যবসায় সাফল্য আসতে পারে না।

দুজন বৃদ্ধা আগের থেকেই এখানে দাঁড়িয়েছিলেন। এঁরাও বোধকরি ঐ বাসে যাবেন। ভালই হল। কিন্তু কথা বলতে সাহস পাই না। পাছে আবার ভাষা-বিভ্রাট হয়।

এখানেও ট্রলি পেয়েছি, কাজেই স্যুটকেশ বয়ে আনতে কোন কষ্ট হল না। কিন্তু আমার হোটেলের স্টপে নিশ্চয়ই ট্রলি পাওয়া যাবে না। বাসস্টপ থেকে বেশিদূর হাঁটতে হলে অসুবিধায় পড়ব। আমার স্যুটকেশটি বেশ বড় এবং ভারী। প্রথমতঃ ফ্রান্স ইংলণ্ড ও জার্মানীতে যাঁদের বাড়িতে থাকব, তাঁদের জন্য কয়েকখানি বই নিয়ে এসেছি। দ্বিতীয়তঃ শীতের ভয়ে বেশ কিছু গরম পোশাক নিয়ে আসতে হয়েছে। কিন্তু গত দেড় ঘণ্টার অভিজ্ঞতা থেকে মনে হচ্ছে এত গরম পোশাকের প্রয়োজন ছিল না। এখন গ্রীষ্মকাল। মেঘলা কিম্বা

বৃষ্টি না হলে একটা হাফ-হাতা সোয়েটার হলেই চলে যাবে। বিমান অবতরণের পরে পায়লট বলেছেন, তখন জুরিখের তাপমাত্রা ২৩° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

কিন্তু এখন আর এসব কথা ভেবে কি হবে? তার চেয়ে জুগকে দেখা যাক। পথের কথা আগেই বলেছি। মসৃণ ও ঝকঝকে পথ। কোথাও এক-টুকরো কাগজ পর্যন্ত পড়ে নেই। পথে পথচারীর সংখ্যা সামান্য কিন্তু গাড়ির সংখ্যা অনেক। গাড়িগুলো ঝড়ের বেগে চলেছে। পথের পাশে আধুনিক ডিজাইনের বড় বড় বাড়ি ও দোকান। চারদিকের দেওয়ালের প্রায় সবটাই কাচ। প্রশস্ত ও মসৃণ ফুটপাথ আর গাড়ি-বারান্দা। বেশির ভাগ বাড়ি চার-পাঁচ তলা, ওপরে টালির চাল, কয়েকখানি স্কাই-স্ক্র্যাপারও দেখছি। আর দেখছি গাছ। ছোট-বড় অসংখ্য গাছ। যেদিকেই তাকাচ্ছি বেশ খানিকটা সবুজ চোখে পড়ছে।

একটা বাস আসছে! হ্যাঁ, ঐ তো, এগারো নম্বর। ভালই হল, আমার বাস-ই এসে গেছে। অনেকটা কলকাতার সরকারী স্পেশাল বাসের মতো, তেমনি কমলা রঙ। তবে কাচের অংশটা বেশি। সামনে এবং দুপাশে প্রায় সবটা জুড়েই কাচ।

বাসটা আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। হুঁস করে একটা শব্দ হল, দরজা খুলে গেল। একখানি নয়, তিনখানি দরজা—পায়লটের পাশে, মাঝখানে ও পেছনে।

আট-দশজন যাত্রী ছিলেন। তাঁরা নেমে এলেন বাস থেকে। কয়েকজনের সঙ্গে মালপত্র রয়েছে। যাক গে, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ভয় ছিল, আমাকে সুটকেশ নিয়ে বাসে উঠতে দেবে কিনা?

যাবার যাত্রী বলতে আমরা তিনজন—আমি আর সেই দুই বৃদ্ধা। এখন পর্যন্ত আর কেউ আসেন নি। কে জানে আবার যাত্রীর জন্য বাস কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে?

আমরা উঠে আসি বাসে। দরজার সামনে খানিকটা করে ফাঁকা জায়গা। সেখানেই সুটকেশটা রেখে ব্যাগ নিয়ে এসে সিটে বসি।

গাড়িতে কোন কণ্ডাক্টর দেখতে পাচ্ছি না, কেবল পায়লট রয়েছেন। প্যান্ট-কোট-টাই পরা জনৈক স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ। গম্ভীরভাবে নিজের জায়গায় বসে রয়েছেন।

আমার দুই সহযাত্রী বৃদ্ধার একজন বাসে উঠেছেন পেছনের দরজা দিয়ে আরেকজন আমার সঙ্গে মাঝখানের দরজা দিয়ে। তিনি বসেছেন আমার পেছনের সিটে। হঠাৎ ভদ্রমহিলা আমাকে লক্ষ্য করে বলে ওঠেন—মঁসিয়ে টিকেট?

ইনি কি কণ্ডাক্টর নাকি আমার টিকেট দেখতে চাইছেন!

না। তাহলে তিনি তাঁর টিকেটখানি আমাকে দেখাবেন কেন? ভদ্রমহিলা আবার বলেন—ইওর টিকেট?

এবারে বুঝতে পারি তাঁর প্রশ্ন। আমি তাঁর মতো বাসের টিকেট করেছি

কিনা তা-ই জিজ্ঞেস করছেন। তাড়াতাড়ি উত্তর দিই—নো।

তিনি বলেন—পারচেজ টিকেট। হ্যাভ ইউ গট্ সুইস সেণ্টাইম—ফরটি ?

আমি পকেট থেকে খুচরোগুলো বার করে দুহাতে তাঁর সামনে তুলে ধরি। তিনি পরীক্ষা করে মাথা নেড়ে বলেন—নো, নো।

তার মানে আমার কাছে যে খুচরো আছে। তা দিয়ে বাসের টিকেট পাওয়া যাবে না। তাহলে উপায় ?

উপায় তিনিই বাৎলে দেন। আমার হাত থেকে একটি এক ফ্রাংক-এর মুদ্রা নিয়ে নিজের ব্যাগ খোলেন। এক ফ্রাংক-এর খুচরো বের করে প্রথমে দুটি বিশ সেণ্টাইম আলাদা করে আমার হাতে দিয়ে বলেন—এই দুটো দিয়ে 'অটোম্যাট' থেকে টিকেট করে নিয়ে এসো, বাকিগুলো সব পকেটে রেখে দাও।

তাঁর নির্দেশ পালন করি। বাস থেকে নেমে আসি। কিন্তু কোথায় 'অ্যাটোম্যাট' ? কেমন করে টিকেট পাবো ? আবার স্টেশনের ভেতরে যেতে হবে কি ? না, তিনি তো বার বার এখানেই কিছু একটা দেখিয়ে বলেছেন, অটোম্যাট থেকে টিকেট নিয়ে এসো ! কি দেখিয়েছেন ? আমি বোকার মতো এদিক-ওদিক তাকাতে থাকি।

যে ভদ্রমহিলা পেছনের দরজা দিয়ে বাসে উঠে এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলেন, এবারে তিনি নেমে এলেন বাস থেকে। আমার কাছে এসে হাত থেকে বিশ সেণ্টাইম দুটি নিয়ে সেই গাড়িবারান্দা তথা প্ল্যাটফর্মের দিকে এগোলেন একটা কমলা রঙের বাক্সের সামনে এসে থামলেন। মাটি থেকে ফুট চারেক ওপরে একটা লোহার খুঁটির সঙ্গে লাগানো রয়েছে বাক্সটা। ওপরে লেখা-'Fahrkarterau-tomat' বুঝতে পারি আগের ভদ্রমহিলা বার বার ইসারা করে এই বাক্সটাই দেখাচ্ছিলেন। এটাই অটোম্যাট বা 'অটোমেটিক টিকেট সাপ্লাই মেশিন।'

বাক্সটায় বিভিন্ন জায়গার নাম লেখা আটটি পুশ-সুইচ এবং আরও কয়েকটি সুইচ রয়েছে। তার একটাতে Guggital লেখাটা দেখতে পেয়েই আমি তাড়াতাড়ি ভদ্রমহিলাকে সেটা দেখিয়ে দিই। আগে একটা সুইচ টিপে নিয়ে তিনি সেটা পুশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে ওপরে লেখা ওঠে 'O. 40'

ভদ্রমহিলা নির্দিষ্ট জায়গা দিয়ে বিশ সেণ্টাইম দুটি ফেলে দিলেন। নিচের ফুটো দিয়ে আমার টিকেট বেরিয়ে এলো। ভদ্রমহিলা টিকেটখানি আমার হাতে দেন। আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিই। তারপরে বুক ফুলিয়ে বাসে ফিরে আসি।

একটু বাদে আবার সেই 'হুঁস' শব্দটায় সচকিত হয়ে উঠি। বাসের দরজা বন্ধ হয়ে গেল, ইঞ্জিন গর্জে উঠল। তাহলে কি বাস ছেড়ে দেবে ? নিশ্চয়ই, নইলে দরজা বন্ধ হবে কেন ? কিন্তু এতবড় বাসে আমরা যে মোটে তিনজন !

—তাতে কি ? আমার প্রশ্ন শুনে একটু হেসে ভদ্রমহিলা পাল্টা প্রশ্ন করেন। তারপরে বলেন—আমাদের এখানে সব বাসকে টাইম টেবল মেনে চলাচল করতে হয়। প্রত্যেক স্টপেজে টাইম টেবল লটকানো আছে। সুতরাং যাত্রী না হলেও

সময়ে ছাড়তে হবে।

লোক্যাল বাসের টাইম টেব্‌ল! কি আর বলব? নীরবে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকি।

খুব প্রশস্ত নয়। কেনই বা হবে, ছোট শহর। কিন্তু ভারী মসৃণ পথ। বেশ জোরে বাস চলেছে—অন্তত ৮০/৯০ কিলোমিটার তো বটেই। কিন্তু শব্দ সামান্যই কানে আসছে। একে গাড়িতে শব্দ কম, তার ওপরে জানালা-দরজা সব বন্ধ। কিন্তু কাচের ভেতর দিয়ে দোকান-পাট, বাড়ি-ঘর আর গাছপালা রঙীন ছবির মতো সুন্দর লাগছে।

এতক্ষণ ড্রাইভারকে কোন কথা বলতে শুনি নি। এবারে তিনি সামনে লাগানো মাইকের সামনে মুখ নিয়ে বলে ওঠেন—সেণ্ট মাইকেল (St. Michael)

তারপরেই বাসটা দাঁড়িয়ে পড়ল, দরজা খুলে গেল। বুঝতে পারছি এই স্টপেজ-এর নাম সেণ্ট মাইকেল।

দুটি যুবক-যুবতী সামনের দরজা দিয়ে গাড়িতে উঠল। তারা পায়লটের সামনে এসে দাঁড়ালো। দুজনেই পায়লটকে পয়সা দিল, পায়লট টিকেট দিলেন। তারা একটা সিটে বসে পড়ল। দরজা বন্ধ করে পায়লট বাস ছেড়ে দিলেন।

তাহলে আমার অটোম্যাট-এর ঝামেলা করার দরকার ছিল না। পায়লটের কাছে চাইলেই টিকেট পাওয়া যেত।

প্রশ্ন শুনে বৃদ্ধা উত্তর দিলেন—না, তুমি স্টেশন থেকে টিকেট পেতে না, মানে পায়লট তোমাকে টিকেট দিতেন না। কারণ ওখানে অটোম্যাট রয়েছে। যেসব স্টপেজে অটোম্যাট নেই, সেখানেই পায়লট টিকেট দেন।

আরও একটা প্রশ্ন আমার মনে দেখা দিয়েছে, কিন্তু বৃদ্ধাকে প্রশ্নটা করতে পারি না। এইমাত্র যারা বাসে উঠল, সেই যুবক যুবতীদ্বয়ের ঘনিষ্ঠতা দেখে মনে হচ্ছে, তারা স্বামী-স্ত্রী কিম্বা নিদেনপক্ষে প্রেমিক-প্রেমিকা। কিন্তু ওরা দুজনেই নিজনিজ টিকেটের পয়সা দিল, কেউ কারও টিকেট কাটল না। কেনই বা কাটবে? আমি যে অর্থনৈতিক স্বাধীন দেশে এসেছি। এখানে প্রাণের সম্পর্ক যতই মধুর হোক, আর্থিক সম্পর্ক সর্বদা—'হিজ হিজ, হুজ হুজ।'

বাস ছুটে চলেছে, বাড়ি-ঘর কমে এসেছে পথের পাশে গাছপালা বেড়েছে। জায়গাটার ভূ-প্রকৃতি উঁচু-নিচু। মাঝে মাঝে উঁচুতে উঠছি, আবার নিচে নামছি। কিন্তু রাস্তা এবং গাড়ি এত ভাল যে আমরা কিছুই টের পাচ্ছি না।

দূরে বনময় পাহাড়। মাঝে মাঝে পথের ডানদিকে একটা হ্রদ উঁকি দিচ্ছে। জুরিখ শহরের মতো জুগ জনপদটিও একটা হ্রদের তীরে। স্টেশনের সেই ইংরেজী জানা যুবকটি বলেছে—আমার হোটেল নাকি এই হ্রদের তীরে। হ্রদটির নাম Zuger See।

যত দেখছি, ততই অভিভূত হচ্ছি। মনে পড়ছে জনৈক লেখকের কথা। তিনি লিখেছেন—'In many ways, Switzerland is like its famed watches

—:mall, compact, reliable and aesthetic'

এদেশে পা দিয়েই কথাটার সত্যতা উপলব্ধি করছি।

ইতিমধ্যে আমরা আরও দুটি স্টপেজ ছাড়িয়ে এসেছি। পায়লট যথারীতি তাঁদের নাম বলেছেন—ওবার উইলার কির্‌শ্‌ওয়েগ (Oberwiler Kirchweg) এবং হেয়্‌নিবিউল (Hanibuhl) তারপরে গাড়ি থামিয়েছেন, দরজা খুলে দিয়েছেন। যাত্রীরা ওঠা-নামা করেছেন। আবার গাড়ি চলতে শুরু করেছে। হ্যাঁ, ঠিক কথা। বাসের যাত্রী বেড়েছে। এখন আমরা জনাদশেক যাত্রী রয়েছি। আগের চেয়ে ভাল লাগছে।

বাসে যাত্রী না উঠলে আমার কোন লোকসান নেই। তার ওপরে আমি ভারতের মানুষ, কলকাতায় বাস করি। আমার তো যাত্রী দেখলেই বিরক্ত হবার কথা। কিন্তু কি আশ্চর্য, এখানে স্টপেজে যাত্রী দেখলে আমার রীতিমত আনন্দ হচ্ছে।

সুইজারল্যান্ড বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনীদেশ সমূহের অন্যতম। আর তাঁদের এই সমৃদ্ধির অন্যতম কারণ পর্যটন ব্যবসায় অসামান্য সাফল্য। সুন্দর দেশকে তাঁরা বুদ্ধি ও পরিশ্রম দিয়ে সুন্দরতর করে গড়ে তুলেছেন। কিন্তু সর্বদা লক্ষ্য রেখেছেন যে যান্ত্রিক সভ্যতা যেন কখনও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে বিনষ্ট না করে ফেলে। আর তাই জনৈক লেখক বলেছেন—'…even the cities can't blot out ratural beauty.'

সুইজারল্যান্ডের সমৃদ্ধির আরেকটা কারণ একতা। সুইসরা এক আশ্চর্য ঐক্যবদ্ধ জাতি। অথচ আগেই বলেছি এখানে বহু ভাষা। ধর্মের দিক থেকেও এখানে দুটি মত—ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট। তাছাড়া রয়েছে তিন হাজারের ওপর সম্প্রদায়। তারা সবাই আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন। কিন্তু কখনই ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার নামে দেশের ঐক্যকে বিনষ্ট করতে উদ্যোগী হন নি।

—গুগিতাল।

পায়লটের কথা কানে আসতেই আমার ভাবনা থেমে যায়। তাহলে তো আমার গন্তব্যস্থল গুগিতাল এসে গেল। ভদ্রমহিলাও আগের স্টপেজ লিব্‌ফ্রাউয়েন-হোপ (Liebfrauenhot) থেকে বাস ছাড়ার পরে বলেছিলেন—এর পরেই তোমার স্টপ্‌।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াই। ভদ্রমহিলা মৃদু হেসে ইসারায় আমাকে বসতে বলেন। আমি তাঁর নির্দেশ অমান্য করতে পারি না।

বসার পরে তিনি আস্তে আস্তে বলেন—স্টপেজ আসুক, বাস থামুক, দরজা খুলুক। তারপরে নামবে।

মনে মনে লজ্জা পাই। ভদ্রমহিলা আমাকে বাঙাল ভাবলেন। কিন্তু আমি যে নিরুপায়। আমি কেন, খাস কলকাতার কোন আদিবাসীকেও এদেশে এনে ফেললে তিনিও যে বরিশালের বাঙালের মতই আচরণ করবেন, একথাটি সুইস

মহোদয়ার জানার কথা নয়।

যাক্ গে, অবশেষে বাস থামল, দরজা খুলল। ভদ্রমহিলাকে ধন্যবাদ দিয়ে স্যুটকেশ ও ব্যাগ নিয়ে নেমে আসি বাস থেকে। ভদ্রমহিলা ইসারা করে বলে ওঠেন—হোটেল গুগিতাল।

আরে তাই তো, পায়লট যে আমাকে একেবারে হোটেলের সামনে নামিয়ে দিয়েছেন। তাই বাবুজি আমাকে বাসে করে চলে আসতে লিখেছেন।

আমি আবার দেখি, সামনেই হোটেল গুগিতাল, রাস্তার এপাশেই। একেবারে হ্রদের তীরে—চমৎকার অবস্থান। তবে আকারে বড় নয়, বরং ছোটই বলা যেতে পারে। ভালই হল। বড় হোটেলে আমার কেমন যেন সবকিছু বড় নিষ্প্রাণ মনে হয়। গতকাল বম্বেতেও তাই হয়েছিল।

বাস রাস্তাটা 'হাইওয়ে'। হ্রদের তীরে হোটেল, তাই বাড়িটা বাসরাস্তা থেকে অনেকটা নিচে। মোটরপথ দিয়ে হোটেলে পেঁছিতে হলে বেশ খানিকটা ঘুরতে হবে। কিন্তু এখান থেকে নিচে অর্থাৎ হোটেলের অঙ্গনে নেমে যাবার জন্য একসারি সিঁড়ি রয়েছে। আমি সেই সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসি নিচে, পেঁছিই হোটেল গুগিতালের আঙিনায়। এখানে যেমন বাঁধানো 'কারপার্ক' রয়েছে, তেমনি আছে একফালি ফুলবাগান। তাতে ফুটে আছে নানা রঙের মরশুমী ফুল।

আমি বাগান পেরিয়ে হোটেলের সামনে আসি। বন্ধ কাচের দরজা দুপাশে সরে যায়। না, বিস্মিত হই না। কেন হবো? আমাদের দমদম বিমানবন্দরেও যে এমন দরজা রয়েছে।

ভেতরে ঢুকে সামনেই 'রিসেপশান'। আমি সেখানে এসে দাঁড়াই। জনৈকা কর্মরতা যুবতী কাজ ফেলে উঠে দাঁড়ায়। হাসিমুখে বলে ওঠে—গুড মর্নিং। মে আই হেলপ্ ইউ।

—ও ইয়েস। আমিও হাসিমুখে জবাব দিই। বলি—আমার নাম……। আজ থেকে এখানে আমার বুকিং রয়েছে।

মেয়েটি আবার আমার নাম জিজ্ঞেস করে। খুবই স্বাভাবিক। ওদের নামও আমরা মনে রাখতে পারি না। তাই আমি ওর দিকে আমার পাসপোর্টটা এগিয়ে ধরি। সেটা হাতে নিয়ে মেয়েটি কম্পিউটার অপারেট করতে লেগে যায়।

একটু বাদে বলেন—আমি দুঃখিত, এখানে তো আপনার নামে কোন বুকিং নেই।

সেকি! এ যে দেখছি তীরে এসে তরী ডুবল। এতগুলো উদার মানুষের সাহায্য নিয়ে যদি বা কোনমতে হোটেল গুগিতালে পেঁছিতে পারলাম, এখন শুনছি আমার ঠাঁই নেই।

কিন্তু বাবুজি নিজে আমাকে টেলেক্স করে এখানে আসতে বলেছেন। তাঁর তো এমন ভুল হবার কথা নয়! তাড়াতাড়ি টেলেক্স মেসেজটা মেয়েটির হাতে দিই।

মেয়েটি আবার কম্পিউটরের শরণ নেয়। আমি উৎকণ্ঠার সঙ্গে তার দিকে

তাকিয়ে থাকি।

একটু বাদে সে বলে—হ্যাঁ। মিস্টার বি. পি. খৈতান আপনার জন্য এখানে একটা 'সিঙ্গল-রুম' বুক্ করেছিলেন। কিন্তু প'চিশ তারিখে তিনি নিজেই সেটা 'ক্যানসেল' করে দিয়েছেন।

এবারে আরও বেশি বিস্মিত হই। কিন্তু সেকথা প্রকাশ না করে যথা সম্ভব শান্তস্বরে বলি—মিঃ খৈতান কি এই হোটেলেই আছেন ?

—হ্যাঁ। কিন্তু উনি তো ঘরে নেই। খুব সকালে গাড়ি করে কোথায় যেন বেড়াতে গেছেন। আজ ব্রেক-ফাস্ট পর্যন্ত করেন নি।

বেড়াতে গেছেন ! না, না, বেড়াতে যাবেন কি ? আমি এখানে আসব আর বাবুজি বেড়াতে যাবেন ! এ হতে পারে না। নিশ্চয়ই কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। এবং বাবুজির সঙ্গে দেখা হবার আগে আমার পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। অতএব আমাকে এখানেই অপেক্ষা করতে হবে। মেয়েটিকে বলি—বুকিং না থাকলেও কি আপনি আমাকে একখানা সিঙ্গল-রুম দিতে পারেন না ?

সে আবার কম্পিউটরের সাহায্য নেয়। আমি চুপ করে থাকি। একটু বাদে মেয়েটি বলে—পারি, কিন্তু মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার জন্য।

মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা ! তার মানে আগামীকাল সকালে ঘর ছেড়ে দিতে হবে। তা হোক্ গে, কালকের ভাবনা বাবুজি ভাববেন, আমার শুধু তাঁর ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তাই সানন্দে বলে উঠি—বেশ, তাই দিন।

মেয়েটি কম্পিউটরে কি যেন একটু করে। তারপরে আমার পাসপোর্ট ও টেলেক্স মেসেজ ফেরৎ দিয়ে একখানি খাতা এগিয়ে দেয়।

আমি নাম ঠিকানা ও পাসপোর্ট নম্বর ইত্যাদি লিখে খাতাটায় সই করে দিই।

এবং আমি য়ুরোপের ভূস্বর্গে ঘর পেয়ে যাই।

॥ পাঁচ ॥

ঘরখানির নম্বর ৩০৭। অর্থাৎ তিনতলার সাত নম্বর ঘর। লিফ্‌ট আছে তবে লিফ্‌টম্যান নেই। মিঃ চাওড়া বলেছেন। থাকে না। য়ুরোপে সর্বদা সর্বত্র নিজেকেই লিফ্‌ট চালাতে হয়। কাজটা কঠিন নয়, কিন্তু ভেতরে একা পড়ে গেলে গা ছমছম করে।

এখন অবশ্য আমাকে একা আসতে হল না। আমার স্যুটকেস নিয়ে একজন বেয়ারা সঙ্গে এলো। সে শুধু লিফ্‌ট চালায় নি,চাবি দিয়ে দরজা খুলে দিয়েছে।

ছোট ঘর কিন্তু ভারী ছিমছাম। ঘরে ঢুকেই একফালি ড্রয়িং স্পেস। সেখানে সোফা, সেন্টারটেব্‌ল ও টেলিফোন। পাশে বাথরুম—সব রকমের আধুনিক ব্যবস্থা। যেমন বেসিন আয়না, বাথটব্‌ গরম জল, শাওয়ার, তোয়ালে, সাবান ইত্যাদি।

বসবার জায়গার পরে পর্দা দিয়ে আড়াল করা বেডরুম! একপাশে ফোমের গদি সহ ধবধবে বিছানা, আরেক পাশে ওয়ারড্রোব ড্রেসিং-টেবল্‌ ও রঙীন 'সোনি' টি. ভি। পুরু কার্পেট পাতা।

ঘরের পেছনদিকের দেওয়াল সবটাই কাচের—পর্দা টাঙানো। শুধু দেওয়াল নয়, একখানি দরজাও রয়েছে। সেটাও কাচের। দরজার ওপাশে ছোট ব্যালকনী। ওখানে দাঁড়ালে নিচে একফালি সবুজ 'লন' তারপরে হ্রদ—জুগের সী। 'সী' মানে হ্রদ কিন্তু 'তাল'? 'গুগিতাল' শব্দের মানে কি? কে বলে দেবে আমাকে? আমি শুধু জানি হিমালয়ে হ্রদকে 'তাল' বলে—নৈনিতাল। এখানেও কি তাই বলে? নইলে হ্রদের তীরে অবস্থিত এই হোটেলের নাম গুগিতাল হবে কেন?

যাক গে সে কথা। শুধু হোটেল নয়, চমৎকার অবস্থান আমার এই ঘরখানির। কিন্তু আমি যে একদিনকা সুলতান। মেয়েটি মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার জন্য ঘরখানি আমাকে দিয়েছে।

তা দিক গে। আপাতত আমার একটাই সমস্যা—বাবুজির সঙ্গে দেখা হওয়া। তাঁর সঙ্গে দেখা হবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

এবং আপাতত তাঁর সঙ্গে দেখা করা ছাড়া আমার আর কিছু করার নেই। তবে এই অবসরে একদিনের সংসার গুছিয়ে নেওয়া যেতে পারে। ব্যাগ ও স্যুটকেশ খুলে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো নামিয়ে সাজিয়ে রাখি। কোট-প্যাণ্ট ছেড়ে পায়জামা ও পাঞ্জাবী পরে নিই। শুধু ঘর নয়। সারা হোটেল 'সেণ্ট্রালী হিটেড'। সুতরাং ভেতরে ঠাণ্ডা লাগার কোন ব্যাপার নেই।

বাথরুমে ঢুকে হাতমুখ ধুয়ে নিই। গরমজল তোয়ালে সাবান—সবই

রয়েছে। এখন এক কাপ চা পেলে হত। আরেকটা কথাও বলা দরকার, ঘরে খাবার জলের কোন জায়গা নেই।

টেলিফোন তুলি। অপর প্রান্ত থেকে কোমল নারীকণ্ঠ ভেসে আসে—গুড মর্নিং। মে আই হেল্প ইউ স্যার ?

ঘরের নম্বর দিয়ে বলি—এক কাপ চা পাঠিয়ে দিন।

—উইথ মিল্ক স্যার ?

—ও ইয়েস। আরেকটা কথা।

—বলুন, স্যার।

—আমার ঘরে কোন 'ওয়াটার জার' নেই।

—ওয়াটার ! ডু ইউ মীন মিনারেল ওয়াটার স্যার ?

—নো নো, আই ওয়াণ্ট পিওর এ্যাণ্ড প্লেন ড্রিংকিং ওয়াটার।

এবারে ভদ্রমহিলার জবাব দিতে কেন যেন দেরি হচ্ছে। বোধকরি এমন একটা সাধারণ ভুল হবার জন্য বেচারী লজ্জা পেয়েছেন।

না। তিনি অন্য কথা বলেন—স্যার, দয়া করে একবার যদি বাথরুমে যান, দেখতে পাবেন দুটি কাচের গ্লাশ রয়েছে। আপনি সেই গ্লাশে করে বেসিনের জল পান করতে পারেন। আমি আপনাকে গ্যারাণ্টি দিচ্ছি, আমাদের জল 'হ্যাণ্ড্রেড পার্সেণ্ট পার্সেণ্ট পিওর।'

ছোটবেলা থেকেই জেনে এসেছি, জলের আরেক নাম জীবন। কিন্তু পানীয়জল পরিবেশনের ব্যবস্থা নেই এদেশের হোটেলে।

কেনই বা থাকবে ? এঁরা যে জল পান করেন না বড় একটা। সাধারণতঃ বীয়ার কিম্বা ওয়াইন পান করেন। না পেলে ফ্রুটজুস কিম্বা কোল্ড-ড্রিংকস নিদেনপক্ষে মিনারেল ওয়াটার। কিন্তু তাতে এঁদের পিপাসা মেটে কি ? আমার তো সাদাজল না হলে কিছুতেই পিপাসা যায় না। তাই বাথরুমে গিয়ে বেসিন থেকে জল খেয়ে আসি। 'যস্মিন দেশে যদাচার।'

একটু বাদে চা আসে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে টেলিভিশন খুলে দিই। চারটে চ্যানেলে টেলিকাস্ট হচ্ছে। একটায় নাচ-গান, একটায় সিনেমা, একটায় ছোটদের বিজ্ঞান প্রসঙ্গ আরেকটায় খেলা দেখানো হচ্ছে। কোথায় যেন কাদের মধ্যে ফুটবল খেলা হচ্ছে। আমি তা-ই দেখতে থাকি।

কিন্তু বাবুজির ভাবনা ভুলতে পারি না। তাঁরই চেষ্টায় আমার এই য়ুরোপ ভ্রমণ। আজ তাঁর আনন্দ আমার চেয়ে কোনমতেই কম নয়। অথচ আমাকে টেলেক্স পাঠিয়েও তিনি হোটেলে নেই। এমনকি কোন 'মেসেজ' পর্যন্ত রেখে যান নি। তাছাড়া হোটেলে আমার জন্য ঘর 'বুক' করে আবার কেন তা 'ক্যানসেল' করে দিলেন ?'

কিছুই বুঝতে পারছি না। কেবল আশায় আছি। তিনি এখুনি এসে যাবেন। এবং তিনি এলে আমার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

আমি বরং তাঁর আসার মধ্যে স্নানটা সেরে নিই।

কুণ্ডু ট্র্যাভেলস-এর মালিক আমার বন্ধু ফকির কুণ্ডু বলেন—য়ুরোপ আমেরিকার বাথরুম সজ্জা প্রায় ফাইন-আর্টস-এর পর্যায়ে পড়ে। তাঁর ভাষায় 'বাথরুম-শিল্প।'

সত্যই তাই। কি নেই এদের বাথরুমে? গরম জলের টবে শুয়ে বসে বহুক্ষণ ধরে অবগাহন করা গেল। পরশু শেষরাতে উঠেছি, কাল রাতেও সামান্যই ঘুমোতে পেরেছি। স্নান করে বড়ই আরাম বোধ করছি।

কিন্তু বাবুজি? রিশেপশানে ফোন করলাম। মেয়েটি বলল—না, তাঁর চাবি "কি-বোর্ডে" লাগানো রয়েছে।

অর্থাৎ তিনি ফেরেন নি এখনও।

ফোন ছেড়ে দিতে যাচ্ছিলাম। মেয়েটির কথায় থামতে হয়। সে জিজ্ঞেস করে—স্যার, আপনি কি লাঞ্চ করবেন এখানে?

—হ্যাঁ।

—আমাদের লাঞ্চ কিন্তু শুরু হয়ে গেছে।

—আপনাদের এখানে কি নিরামিষ খাবার পাওয়া যাবে?

—নিশ্চয়ই। আপনি এখন এসেও খেয়ে নিতে পারেন।

—ধন্যবাদ। আমি আসছি।

তা-ই ভাল। বাবুজি আসার মধ্যে খেয়ে নিয়ে একেবারে তৈরি হয়ে থাকি। তাছাড়া সেই ভোরবেলায় বিমানে ব্রেক-ফাস্ট করেছি। এখন দুপুর বারোটা। খিদেও পেয়েছে।

কিন্তু পায়জামা-পাঞ্জাবী পরে ডাইনিং হল-এ যাওয়া উচিত হবে কি? বোধ করি না। অতএব আবার প্যান্ট-সার্ট পরতে হয়।

নিচে নেমে রিসেপশানে আসি। মেয়েটির হাতে চাবি দিয়ে বলি—আমি লাঞ্চ করতে যাচ্ছি, মিস্টার খৈতান এলে আমাকে একটা খবর দেবেন।

—নিশ্চয়ই।

ওকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি ডাইনিং হলে আসি। খুব বড় 'হল' নয়। জনা পঁচিশেক লোকের খাবার ব্যবস্থা। এক-একটি টেবুলে দু থেকে চারজনের বসার ব্যবস্থা। সব টেবুলে ধবধবে সাদা টেবুল ক্লথ আর ফুলদানিতে রঙ্গীন ফুল।

ডাইনিংহলের পেছনেও একফালি বাগান—একেবারে হ্রদের তীরে। সেখানেও টেবুল চেয়ার পাতা। বোধকরি বিকেলে পানাহারের আসর বসে, এখন ফাঁকা।

পুরোদমে পান-ভোজনের পাট চলেছে। সাদা পোশাক পরা মেয়েরা প্রচুর ছুটোছুটি করে পরিবেশনে ব্যস্ত। কিন্তু কোন হাঁকা-হাঁকি কিম্বা চেঁচামেচি নেই। একটা আশ্চর্য-সুন্দর শৃঙ্খলা বিরাজ করছে।

খালি টেবুল একটাও নেই। কেবল একটা টেবিলে একজন দীর্ঘদেহী স্বাস্থ্যবান প্রৌঢ় একা বসেছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে একটা কুকুর। কুকুর মানে

প্রায় বাঘের মতো বিরাট লোমশ জানোয়ার। বাঁধা নয়, খোলা। সেও লাঞ্চ করতে এসেছে। প্রভুর পায়ের কাছে বসে তাঁর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করে চলেছে।

জনৈক কুকুরপ্রিয় বন্ধু একবার কতগুলো বিশ্ববিখ্যাত কুকুরের নাম বলেছিল। তার কয়েকটি নাম আমার আজও মনে আছে, যেমন—গ্রেডডেন, ককার স্প্যানিয়েল, বুলডগ, ব্লাডহাউন্ড, গ্রেহাউন্ড, জার্মান শেফার্ড, বক্সার, ম্যাঞ্চেস্টার টেরিয়ার ইত্যাদি। তাহলেও বলতে পারব না এটি কোন জাতের? কেবল কুকুর বিশারদরাই এর জাতি ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন। তবে আমি তা শুনতে একেবারেই আগ্রহী নই। আমার কেবল একবার কুকুরের কামড় খাবার দুর্ভাগ্য হয়েছে। সুতরাং আমি কুকুরকে ভয় করি। কিন্তু গলায় চেন না বেঁধে যে কুকুরকে তার প্রভু হোটেলে লাঞ্চ করাতে নিয়ে আসেন, সে কুকুর আশা করি অকারণে আমার প্রতি অকরুণ হবে না। অতএব নির্ভয়ে ভদ্রলোকের উল্টো-দিকে এসে বসি।

আগেই বলেছি মেয়েরা পরিবেশন করছেন। তাঁরা সবাই সুশ্রী যুবতী। ধবধবে সাদা পোশাকে প্রায় পরীর মতো লাগছে ওদের।

আমি বসতেই একটি মেয়ে প্রায় ছুটে আসে আমার কাছে। একটু মুচকি হেসে বলে—ইউ ইংলিশ?

—ইয়েস।

নিজের বুকে ডানহাতের বুড়ো আঙ্গুল ঠেকিয়ে সে বলে—মী সিল্‌ভিয়া। ক্যান স্পীক্ ইংলিশ।

অর্থাৎ আমার নাম সিলভিয়া। আমি ইংরেজী বলতে পারি। কেমন বলতে পারে, অনুমান করতে পারছি। তাহলেও খুশি হয়ে বলি—থ্যাংক্ ইউ। তারপরে তাকে নিরামিষ খাবার আনতে বলি।

সে জিজ্ঞেস করে—এ্যানি ড্রিংক্স?

—ইয়েস। অরেঞ্জ জুস।

সিল্‌ভিয়া হেসে খাবার আনতে চলে যায়।

পানীয় হলেও এরা কমলার রসকে ড্রিংক্স বলে মনে করে না।

জোরে জোরে পা ফেলে রিসেপশানের মেয়েটি এদিকে আসছে। সেও বোধকরি খেতে এসেছে।

না। মেয়েটি একেবারে আমার টেব্‌লের সামনে এসে থামে। আমাকেই বলে—স্যার, আপনার একটা টেলিফোন এসেছে।

বাবুজি, নিশ্চয়ই বাবুজি! এখানে তিনি ছাড়া আর কে আমাকে ফোন করবেন?

তাড়াতাড়ি প্রায় ছুটে অফিসে আসি। রিসিভার তুলে নিই। হ্যাঁ বাবুজি। সেই স্নেহময় কণ্ঠস্বর। তিনি জিজ্ঞেস করেন—তুমি কি আমার দ্বিতীয় টেলেক্স পাও নি, পঁচিশ তারিখের?

—দ্বিতীয় টেলেক্স ! না, আমি তো আপনার একটা টেলেক্স পেয়েছি। দ্বিতীয় টেলেক্সে কি বলেছিলেন ?

—হোটেল গুগিতালে রুম 'বুক' করার পরে আমার মনে হল, তুমি বেড়াতে আসছ। তোমার জুরিখ থাকাই ভাল হবে। জুগ বড়ই ছোট জায়গা প্রায় গ্রামের মতো। আমি বিড়লাজীর অতিথি বলে ওখানে আছি। তোমাকে ওখানে আটকে রাখা উচিত হবে না। তাই পঁচিশ তারিখে জুরিখ এসে তোমার জন্য হোটেল ব্রিস্টল এ-রুম বুক করে টেলেক্স পাঠিয়ে দিয়েছি। আর আজ সকাল আটটা থেকে এখানে বসে রয়েছি।

ছি ছি, সত্যি বড্ড লজ্জার কথা। উনআশী বছর বয়সে ব্রেক-ফাস্ট পর্যন্ত না করে জুরিখ গিয়ে সেই সকাল থেকে আমার পথ চেয়ে বসে আছেন, আর আমি জুরিখ থেকে এখানে চলে এসেছি। টেলেক্সটা না পাওয়ায় কি বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেল।

বাবুজি আবার বলেন—তুমি কি গুগিতালে ঘর নিয়েছো ?

—হ্যাঁ।

—তাহলে আজ ওখানেই থাকো, কাল সকালে এখানে চলে আসবে, আমি সেই ভাবেই ব্যবস্থা করে আসছি।

—কিন্তু আপনি তো এখানেই থাকবেন।

—হ্যাঁ। বিড়লাজী ওখানে আছেন।

—তাহলে আমিও এখানেই থাকব।

—কিন্তু জুরিখ ছেড়ে জুগ কি তোমার ভাল লাগবে ?

—কেন লাগবে না ? আমার তো ভারী ভাল লাগছে। তাছাড়া এখানে থেকেও জুরিখ বেড়ানো যাবে।

—তা যাবে।

—তাহলে আপনি ঐ হোটেলে আমার বুকিং ক্যানসেল করে তাড়াতাড়ি এখানে চলে আসুন।

—তুমি তাহলে এখানে থাকছ না।

—না। আপনি যেখানে থাকবেন, আমি সেখানেই থাকব। আমি আপনার কাছেই থাকব বাবুজি !

খেয়ে নিয়ে ঘরে আসি। বিছানায় গা এলিয়ে দিই। ভাবতে থাকি স্নেহময় মানুষটির কথা। ব্যবহারিক জীবনে বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করার পরেও কি আশ্চর্য কোমল প্রাণের অধিকারী। এমন ধর্মপ্রাণ ও সাহিত্যপ্রিয় মানুষ আমি জীবনে খুব কমই দেখেছি। তিনি রাজস্থানের মানুষ হলেও আশৈশব বাংলায় রয়েছেন। বাংলা তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভাষা এবং সর্বদা বলেন—আমি হিন্দীভাষা-

ভাষী বাঙালী। আইনপুস্তকের মতো তিনি নিয়মিত বাংলা বই পড়েন। সেই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। এবং এখন সেই পরিচয় বাৎসল্য স্নেহে রূপান্তরিত।

শেঠ ঘনশ্যামদাস বিড়লা বাবুজির বন্ধু। বিড়লাজীদের এখানে ব্যবসা ও বাড়ি আছে। তাই শেঠজী প্রতিবছর গ্রীষ্মকালে এখানে এসে কিছুদিন কাটিয়ে যান। এবারেও এসেছেন। তাঁরই আমন্ত্রণে বাবুজি এবারে সুইজারল্যাণ্ড এসেছেন। তাই তিনি এখানে এই হোটেলে বাস করছেন। প্রথমে ইচ্ছে হয়েছিল আমি তাঁর কাছেই থাকি। পরে ভেবেছেন আমি কেন তাঁর জন্য জুরিখ ছেড়ে জুগে থাকব। আর তাই সেদিন জুরিখ গিয়ে আমার জন্য হোটেল 'বুক' করেছেন, কলকাতায় টেলেক্স পাঠিয়েছেন এবং আজ সকাল থেকে সেই হোটেলে গিয়ে বসে রয়েছেন।

সত্যিই এর তুলনা নেই। আর তাই তাঁর এই অতুলনীয় ভালোবাসার জন্য আমি বার বার বাবা-বিশ্বনাথকে প্রণাম করে বলি—ঠাকুর, তুমি আমাকে এই অসীম ভালোবাসার যোগ্য করে তোলো।

আজ আমি সত্যিই য়ুরোপে এসেছি। সুইজারল্যাণ্ডের হোটেলে শুয়ে বাবুজির কথা ভাবছি। এখনও স্বপ্নের মতই মনে হচ্ছে।

কলকাতা হাইকোর্টের সঙ্গে যুক্ত একটি সরকারী অফিসে চাকরি করি। সুতরাং স্বনামধন্য সলিসিটর শ্রী বি পি খৈতানকে আমি বহুবছর ধরেই জানি। কিন্তু সে জানা ছিল ব্যবহারজীবী হিসেবে। তার সঙ্গে আজকের জানার কোন সম্পর্ক নেই।

তাঁর প্রকৃত পরিচয় পেয়েছি মাত্র বছর দুয়েক আগে। সেদিন কথায় কথায় জানালেন যে তিনি শুধু বাংলা বলতে পারেন না, পড়তে ও লিখতে জানেন।

তাই একদিন তাঁকে আমার 'রাজভূমি রাজস্থান' বইখানি পড়তে দিলাম। বইখানি ভাল লাগল তাঁর। আর সেই ভাল লাগাই আজ এই অতুলনীয় ভালোবাসায় রূপান্তরিত।

ফোন বেজে ওঠে, বাবুজির ভাবনায় ছেদ পড়ে। তাড়াতাড়ি ফোন ধরি।

যার ভাবনায় বিভোর ছিলাম, তিনি এসে গেছেন। রিসেপশানের মেয়েটি বলল—মিস্টার খৈতান এইমাত্র আপনার কাছে গেলেন।

তাড়াতাড়ি ফোন রেখে দরজা খুলি। তাড়াতাড়িতে মেয়েটিকে ধন্যবাদ দিতে ভুলে গেলাম, এটা য়ুরোপের শিষ্টাচার নয়। কিন্তু কি করব? বাবুজি এসে গেছেন। এখন ভদ্রতা করার সময় নেই আমার। আমি লিফটের কাছে ছুটে আসি।

লিফট্ এসে থামে। দরজা খুলে যায়। বাবুজি, আমার বাবুজি বেরিয়ে আসেন লিফট থেকে। আমি তাঁকে প্রণাম করি। উঠে দাঁড়াতেই দীর্ঘদেহী মানুষটি আমার মাথাটাকে তাঁর প্রশস্তবক্ষে টেনে নেন। আমি ছোটছেলের মতো আমার বাবুজির বুকে মুখ লুকিয়ে চুপ করে থাকি।

কয়েকটি মধুর মুহূর্ত কেটে যায়। তারপরে বাবুজি তাঁর হাত সরিয়ে

নেন। বোধকরি খেয়াল হয়, তিনি একা আসেন নি। তাঁর সঙ্গে আরেকজন ভদ্রলোক রয়েছেন।

আমি মুখ তুলে একটু সরে দাঁড়াই। বাবুজি ভদ্রলোকের পরিচয় দেন—মিঃ ব্যানার্জী। বম্বে থেকে বিড়লাজীর সঙ্গে এসেছেন। তাঁর গাড়ি চালান।

তাঁকে নমস্কার করি—ভারী খুশি হলাম আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায়। চলুন, ঘরে যাওয়া যাক।

মিঃ ব্যানার্জী প্রতি-নমস্কার করে বলেন—চলুন।

আমরা ঘরে আসি। সবাই বসার পরে মিস্টার ব্যানার্জী হাসতে হাসতে বলেন—খৈতানসাবকে আমি বহুদিন ধরে দেখছি। এতদিন জানতাম তিনি শুধু বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ও উদার মানুষ নন, অসাধারণ ধৈর্যশীল। অথচ আজ তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল।

—কেন বলুন তো? আমি বুঝতে পারি না তাঁর কথা।

আবার একটু হেসে ব্যানার্জীবাবু বলেন—কয়েকদিন ধরেই তিনি কেবল আপনার সুখ-সুবিধার কথা চিন্তা করছিলেন। একবার এই হোটেলে ঘর বুক করলেন, তারপরে আবার আমাকে নিয়ে জুরিখ গিয়ে হোটেল ব্রিস্টলে ঘর নিলেন। বললেন, এখানে থাকলে আপনার অসুবিধে হবে। আজ সকালে আমরা জুরিখ গিয়ে আপনার হোটেলে বসে রইলাম। আপনার আসার সময় চলে গেল। সুইসএয়ারে ফোন করে জানতে পারলাম, আপনি এসে গেছেন। তখন খৈতানসাব একেবারে দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়লেন। আমি ওঁকে অনেক করে বোঝালাম। বললাম, আপনি এর আগে বিদেশে না এলেও, দেশে প্রচুর ভ্রমণ করেছেন। আপনি জুরিখ এসে হারিয়ে যাবেন কেন? যাই হোক, শেষে এখানে ফোন করে আপনার গলার স্বর শুনে তবে নিশ্চিন্ত হলেন।

বাবুজি মৃদু হাসছেন। হয়তো বা এমন বিচলিত হবার জন্য মনে মনে একটু লজ্জা পাচ্ছেন। লজ্জা পাচ্ছি আমিও—এমন হৃদয়বান মানুষটি আজ আমার জন্য কি কষ্টটাই না ভোগ করেছেন। আর সেই সঙ্গে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে আমার হৃদয় ও মন পুনরায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

বাবুজি এতক্ষণ শুধু নিঃশব্দে মুচকি হাসছিলেন। এবারে কথা বলেন, যেন জবাবদিহি করেন—না, মানে কুয়োর ব্যাঙকে সমুদ্রে ছেড়ে দিলে তার যা অবস্থা হবে, আমাদেরও তো এদেশে এসে সেই অবস্থা হয়। তার ওপরে তুমি আজ প্রথম য়ুরোপ এলে। তাই ব্রিস্টল হোটেলে না আসায় আমি সত্যই একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম, কারণ ভাবতেই পারি নি যে তুমি আমার দ্বিতীয় টেলেক্সটা পাওনি। যাক্ গে, কেমন লাগছে বল?

—ভাল। খুব ভাল। চিত্রকূটে বসে আপনি মাঝে মাঝে সুইজারল্যান্ডের কথা বলতেন।*

---

* লেখকের 'চিত্রকূট' বইখানি দ্রষ্টব্য।

—হ্যাঁ, তুমি তা খুব মনযোগ দিয়ে শুনতে।

—তখন যে ভাবতেই পারি নি, ছ'মাসের মধ্যে আমি সত্যি সত্যি সুইজারল্যাণ্ড চলে আসব এবং এখানে এসেও আপনার সঙ্গে এক হোটেলে থাকব। এমন আনন্দময় দিন আমার জীবনে খুব কমই এসেছে।

—আমারও ভারী আনন্দ হচ্ছে। তুমি ভ্রমণকাহিনী লেখো, তোমার একবার য়ুরোপ ভ্রমণের দরকার ছিল।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে ব্যানার্জীবাবু বলেন—আমি এখন চলি স্যার! তিনটে বাজে, বাবুর যদি আবার কোন দরকার হয়। আপনিও তো এখন ওখানে যাবেন?

—না। বাবুজি বলেন—আমি একেবারে সাড়ে সাতটায় ডিনার করতে আসব।

—আমি তাহলে আসি স্যার!

—না। বাবুজিও ব্যানার্জীবাবুর সঙ্গে উঠে দাঁড়ান। বলেন—চলুন, নিচে গিয়ে এক কাপ করে কাফি খাওয়া যাক। তারপরে আপনি পারিজাতে, চলে যান আমরা বরং একবার জুগেরবার্গ থেকে বেরিয়ে আসি।

জুগেরবার্গ কোন বেড়াবার জায়গা কিন্তু পারিজাত? ব্যানার্জীবাবু পারিজাতে যাবেন কেন? উনি তো বিড়লাজীর বাড়িতে যেতে চাইছেন।

কাফির টেবিলে বসে কথায় কথায় বাবুজি জানালেন—বিড়লাজীর বাড়ির নাম পারিজাত।

আমরা রেস্তোরাঁর বাগানে বসে কাফি খাচ্ছি। নীল আকাশের নিচে হ্রদের তীরে পর্যটকদের জলকেলি দেখতে দেখতে কাফির কাপ ঠোঁটে ঠেকাতে ভারী ভাল লাগছে।

কাফি খেয়ে বাইরে আসি। ব্যানার্জীবাবু গাড়িতে ওঠেন—আধুনিকতম মডেলের মার্সেডিজ। তা তো হবেই। বিড়লাজীর গাড়ি।

ব্যানার্জীবাবু চলে যাবার পরে আমরা সেই সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় উঠে আসি। কলকাতায় বড় বড় স্টপেজে যেমন শেড থাকে, এখানেও তেমনি টিন আর লোহার খুঁটি দিয়ে তৈরি শেড রয়েছে। কেবল তফাৎ এই যে এটি কলকাতার মতো নোংরা নয় আর এখানে একটি Fahrkartenautomat যন্ত্র বসানো রয়েছে এবং কেউ সেটি খুলে নিয়ে যায় নি।

পাশে রাস্তার ধারে নীলরঙা লোহার খুঁটির সঙ্গে পতাকার আকারে নীল ও লাল সাইনবোর্ড—Zugerland Haltestelle, Guggital অর্থাৎ এটি জুগের্‌-ল্যাণ্ডের গুগিতাল বাসস্টপ।

বাবুজি জিজ্ঞেস করেন—এখানে আসার সময় তো তুমি স্টেশনে টিকেট করেছিলে?

সত্যি কথাটা বলতে লজ্জা লাগছে, তাই কোনমতে মাথা নাড়ি। আর তাতেই বিপদ হয়। বাবুজি বিশ সেণ্টাইমের চারটি মুদ্রা আমার হাতে দিয়ে বলেন—

টিকেট কর তো, দেখি পারো কিনা ?

খুবই মুশকিলে পড়ে যাই। শেষ পর্যন্ত হয়তো ফেল করে যাবো, তবু পরীক্ষাটা দেওয়া যাক। বাবুজিকে জিজ্ঞেস করি—আমরা যেন কোন্ স্টপে যাবো ?

—শোনেগ (Schoneg)।

আমি যন্ত্রটার সামনে এসে দাঁড়াই। বাসের সহৃদয়া বৃদ্ধাদের স্মরণ করে প্রথম সুইচ্‌টা 'পুশ্‌' করি। বাবা-বিশ্বনাথের কৃপায় ভেতরে আলো জ্বলে ওঠে। তার মানে যন্ত্রটা চালু হয়ে গেছে। এবারে খুঁজতে থাকি শোনেগ। হ্যাঁ, পেয়ে গেছি—একটা সুইচের ওপরে লেখা রয়েছে—Schoneg.

যা থাকে বরাতে, আবার 'পুশ' করি। সঙ্গে সঙ্গে ওপরে লেখা ভেসে ওঠে 0·40 তার মানে এখান থেকে শোনেগের একখানি টিকেটের দাম চল্লিশ সেণ্টাইম।

আর কি এবারে পয়সা ফেলে দিলেই টিকেট বেরিয়ে আসবে। আমি তাই করতে যাই।

বাবুজি বাধা দেন। বলেন—অটোম্যাটকে বলো তোমার ক'খানি টিকেট চাই !

কেমন করে বলব, বুঝতে পারছি না। চুপ করে থাকি। একটু বাদে বাবুজি বলেন—পারলে না তো! এই দেখো এখানে ১, ২, ৩ সংখ্যা তিনটি লেখা রয়েছে। এগুলির সাহায্যে অটোম্যাটকে টিকেটের সংখ্যা বলে দিতে হবে। তিনখানির বেশি টিকেট চাইলে একাধিকবার টিপতে হবে। যেমন চারখানি দরকার হলে দুবার দুই, কিম্বা পাঁচখানির দরকার হলে একবার দুই ও একবার তিন টিপতে হবে।

অতএব দু নম্বর টিপে পয়সা ফেলে দিয়ে দুখানি টিকেট পেয়ে যাই।

বাবুজি বলেন—দাঁড়াও, টাইম-টেব্‌লটা দেখে নেওয়া যাক।

টাইম-টেব্‌ল! লোক্যাল বাসের টাইম-টেবল ?

আছে। অটোম্যাটের পাশের কাচের ফ্রেমের ভেতরে প্ল্যাস্টিকের ওপর ছাপা টাইম টেবল লাগানো রয়েছে। অর্থাৎ সারাদিনে কোন্ কোন্ বাস কখন এই স্টপে আসবে। লোক্যাল বাসের টাইম-টেব্‌ল! ব্যাপারটা ভাবতেও ভাল লাগছে।

টাইম টেব্‌ল দেখে বাবুজি বলেন—না, তেমন দেরি করতে হবে না, মিনিট পাঁচেকের মধ্যে বাস এসে যাবে।

তাই এলো। একেবারে কাঁটায় কাঁটায় নির্দিষ্ট সময়ে এসে বাস দাঁড়ালো। সেই এগারো নম্বর বাস, যে বাসে আমি সকালে স্টেশন থেকে এখানে এসেছি।

বাসে তেমনি মাত্র কয়েকজন যাত্রী। তার মানে সারাদিনই এখানে এমনি খালি বাস চলাচল করে।

তখন ট্রেনেও দেখেছি একই অবস্থা। এত সুন্দর পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রেল ও

বাস। এমন ঘড়ির কাটা ধরে যাতায়াত করছে, অথচ যাত্রী নেই। ভাড়াও কিন্তু বেশি নয়। এক সুইস ফ্রাংক্-কে এক টাকা বলে ধরে নিলে চল্লিশ পয়সা করে লাগছে। আমাদের কলকাতায় তো একই ভাড়া। কিন্তু কলকাতার বাসের কথা এখানে বসে ভাবলে যে গায়ে জ্বর এসে যাবে।

সুতরাং সেকথা থাক। তার চেয়ে অন্য কথা ভাবা যাক। বর্তমানে এক সুইস ফ্রাংক আমাদের প্রায় পাঁচ টাকার সমান। কিন্তু আমাদের যেখানে জনপ্রতি বাৎসরিক জাতীয় আয় ১৩৫ ডলার, সেখানে এঁদের ৬৩৫০ ডলার অর্থাৎ এঁদের আয় আমাদের সাতচল্লিশ গুণ। অতএব এক সুইস ফ্রাংককে এক টাকা ধরলে খুবই কম ধরা হয়।

কথাটা বললাম বাবুজীকে। তিনিও আমার সঙ্গে একমত হলেন। আমি বলি—এত কম ভাড়ায় এঁদের পোষায় কেমন করে!

—পোষায় না, লোকসান হয়। ভরতুকি দিতে হয়। য়ুরোপ-আমেরিকার কোন দেশেই লোক্যাল পাব্লিক ট্রান্সপোর্টকে লাভের ব্যবসা বলে বিবেচনা করা হয় না। দেশের কলকারখানা অফিস-আদালতে যাতায়াত করবার জন্য লোক্যাল ট্রান্সপোর্ট। দেশের মানুষ যদি সময়ে যাতায়াত না করতে পারেন কিম্বা কষ্ট করে আসা-যাওয়া করেন, তাহলে দেশের শিল্প-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্থ হবে, অফিস কাছারীতে কাজ কম হবে। তাই সরকার থেকে ভরতুকি দিয়ে ট্রেন-বাস চালানো হচ্ছে। আমাদের দেশেও তো তাই করা হচ্ছে। পার্থক্য সেখানে ঠিকমত গাড়ি চলে না, এখানে চলে।

॥ ছয় ॥

মাঝখানে একটি মাত্র স্টপ। নাম—বেলেভিউওয়েগ (Pellevueweg)। মিনিট দশেকের মধ্যেই আমরা এগারো নম্বর বাসরুটের প্রান্তসীমা শোনেগ পেঁছে গেলাম। জায়গাটা পাহাড়ের পাদদেশ, কয়েকখানি বাড়ি আর কিছু গাছপালা নিয়ে ভারী সুন্দর। জুগ স্টেশন থেকে এই পর্যন্ত বাস আসে। তিনখানি বাস দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমরা বাস থেকে নেমে বাঁধানো চড়াই পথ ধরে একটা ছাউনিতে আসি—চারিদিক খোলা বেশ উঁচু টিনের ছাউনি। প্রথমাংশ উঁচু প্ল্যাটফর্মের মতো। দ্বিতীয়াংশে দু'জোড়া ছোট ছোট রেল লাইন। একজোড়া লাইন পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠে গিয়েছে। তারই ওপরে প্ল্যাটফর্মের পাশে লাল রঙের একটা বিচিত্র ধরনের রেলগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িটাকে অবশ্য ট্রেন না বলে ট্রাম বলাই উচিত হবে। তবে কলকাতার ট্রাম নয়, যাঁরা হাওড়া-শিবপুরের ট্রাম দেখেছেন তাঁরা অনেকটা অনুমান করতে পারবেন। তেমনি দুদিকে ড্রাইভার'স কেবিন। তবে তার চেয়ে অনেক ঝক্‌ঝকে ও চক্‌চকে।

ড্রাইভার কেবিনের দরজায় লেখা ZBB 2। সামনে ও দুপাশে কাচের জানলা। সামনে দুটি এবং পাশে পর পর ছটি জানলা। প্রতি জানলার সোজাসুজি ভেতরে একসারি সিট, চারজন করে বসতে পারে।

বাবুজী বলেন—ZBB কথাটার পুরো হলো Zuger Pergbahn und Bus. অর্থাৎ জুগেরবার্গ পথ এবং বাস। bahn মানে পথ। আর এই গাড়িটাকে বলে স্টান্ডসাইলবান (Stardseilbahn)। আমরা এই গাড়িতে চড়ে ৯৩০ মিটার উঁচু জুগেরবার্গ বেড়াতে যাবো, এঁরা বলেন সুগেরবার্গ। জার্মান ভাষায় 'Z'-এব উচ্চারণ '১'-এর মতো।

প্ল্যাটফর্মের একপ্রান্তে একটু উঁচুতে ছোট একটা কাচের ঘর। একজন দীর্ঘ-দেহী যুবক অফিস ইউনিফর্ম পরে টিকেট দিচ্ছেন। আমরা উঠে আসি সেখানে। বাবুজী টিকেট কাটেন।

টিকেটঘরের পাশ দিয়ে গাড়িতে যাবার সিঁড়ি। আমরা গাড়িতে এসে বসি। কয়েকজন যাত্রী বসে রয়েছেন। বলা বাহুল্য তাঁরা সবাই শ্বেতাঙ্গ নারী-পুরুষ।

আরও কয়েকজন যাত্রী উঠলেন। তবে গাড়ি বোঝাই হল না। তার আগেই একটা ইলেকট্রিক বেল বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে স্টেশন মাস্টার-কাম-বুকিং ক্লার্ক টাকা-পয়সা ও টিকেট ইত্যাদি একটা ব্রীফ্‌কেসে ভরতে লেগে গেলেন। তারপরে বেরিয়ে এলেন কাচের ঘর থেকে। ঘর বন্ধ করে গাড়িতে উঠে এলেন, ড্রাইভারের জায়গায় এসে দাঁড়ালেন। সে কি! ইনিই কি গাড়ি চালাবেন নাকি?

আমার আশংকা সত্য হল। বুকিং ক্লার্ক গাড়ি চালাতে শুরু করলেন। সত্যই দেখবার মতো—একই লোক স্টেশন দেখছেন, টিকেট কাটছেন আবার গাড়ি চালাচ্ছেন।

বাবুজী বুঝতে পারেন, আমি অবাক হয়েছি। বললেন—এঁদের দেশে জনসংখ্যা কম, তাই মানুষের দাম বেশি। এঁরা শ্রমের অপচয় করতে পারেন না। পাশ্চাত্যের সব দেশে প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষ সবাই সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত ভূতের মতো খাটেন আর শনি ও রবিবার পাগলের মতো স্ফূর্তি করেন। ফলে তাঁদের জীবনধারণের মান এমন উন্নত। দেশের মানুষ কাজ না করলে দেশ কখনও উন্নত হয় না। দেশ উন্নত না হলে দেশের মানুষের জীবনে উন্নতি আসতে পারে না।

একবার থামেন বাবুজী। তারপরে আবার বলেন—এযাত্রায় তুমি য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে যাবে। তুমি তো জানো, তুলনায় ইতালী ও গ্রীস দরিদ্র। অথচ সেখানে গিয়েও তুমি দেখবে, সবাই শ্রমের মর্যাদা দিচ্ছেন। সব কাজই কাজ, কোন কাজ ছোট নয়। তুমি বুকিং ক্লার্ককে গাড়ি চালাতে দেখে অবাক হয়েছ, কিন্তু একটু উদার ভাবে ভাবলেই বুঝতে পারবে, এর মধ্যে অবাক হবার কিছু নেই। গাড়ি যখন চলে না, তখন ড্রাইভারের কোন কাজ থাকে না, আবার গাড়ি যখন চলে তখন বুকিং ক্লার্ক বেকার। অতএব বুকিং ক্লার্কের ড্রাইভার হতে বাধা কোথায়? তবে তাঁকে দুটো কাজই শিখতে হয়েছে এবং সে কখনও বসে থাকে না।

আমি মাথা নেড়ে বলি—ঠিকই। কিন্তু আমাদের দেশে এমন ব্যবস্থা ভাবা যায় না।

বাবুজীও মাথা নাড়েন। বলেন—হ্যাঁ। কারণ আমরা শ্রমবিমুখ। আমরা কোন কাজকেই নিজের কাজ ভাবি না। এবং কাজ না করেই পয়সা পেতে চাই।

পাহাড়ের গা বেয়ে চড়াই রেলপথ ধরে গাড়িটা ওপরে উঠছে। বেশ জোরে চলেছে। তুলনায় শব্দ কম হচ্ছে। কিন্তু সেই সামান্য শব্দই পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিহত হয়ে সারা অঞ্চলটাকে শব্দময় করে তুলেছে। তবে গাড়ির দরজা-জানলা বন্ধ থাকার জন্য কান ঝালাপালা হচ্ছে না।

পাহাড়ের গায়ে গাছপালা প্রচুর। আমার পরিচিত গাছের মধ্যে ভুজগাছ জাতীয় গাছ দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি এ্যালপাইন ঘাস। হিমালয়ে অবশ্য এ উচ্চতায় এসব গাছপালা দেখা যায় না। কারণ সেখানে এ উচ্চতায় তুষারপাত হয় না। আর এখানে শুনেছি সারা শীতকালেই বরফ থাকে, বহুলোক 'স্কি' করতে আসেন অথচ এখানকার কিই বা উচ্চতা, বড় জোর হাজার দুয়েক ফুট। আমরা জুগেরবার্গ যাচ্ছি, সেখানকার উচ্চতায় মাত্র ৯৩০ মিটার অর্থাৎ ৩০৫২ ফুট।

আমি এ পাহাড়টার নাম জানি না। বাবুজী এর আগে বেশ কয়েকবার জুগেরবার্গ গিয়েছেন। কিন্তু তিনিও নামটা মনে করতে পারছেন না। তবে নাম যা-ই হয়ে থাক, একেও আল্‌পস পর্বতমালার অংশ বলে ধরে নিতে বাধা

নেই কোন। জানি আমাদের হিমালয়ের কাছে আল্পস কিছুই নয়। তবু আল্পস দেখার স্বপ্ন আমার বহুদিনের। সেই স্বপ্ন সত্য হল আজ।

পাহাড়ের গা বেয়ে আমরা যতো ওপরে উঠছি, চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য ততো রমণীয় হয়ে উঠছে। মনে পড়ছে হিমাচল প্রদেশের যোগীন্দর নগরে সেই হল্‌ওয়েজ রোপওয়ে-র ট্রলিতে চড়ে পাহাড়ে ওঠার কথা। সেখানে পাহাড়ের দৃশ্য এর থেকে ব্যাপক ও বিশাল। কারণ সে যে সীমাহীন হিমালয়।* কিন্তু পাহাড় গাছপালা উপত্যকা আর হ্রদ সব মিলিয়ে এ দৃশ্য কিছু কম রমণীয় নয়।

তাছাড়া সেখানে এমন সুন্দর শীত নিয়ন্ত্রিত ঝক্‌ঝকে গাড়ি নয়, চারিদিক খোলা একটা মাল বইবার ট্রলি। ওঁরা ট্রলিটাকে লাইনের ওপর দিয়ে টেনে পাহাড়ে তোলেন। আর এখানে বৈদ্যুতিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে গাড়িটা নিজেই ওপরে উঠছে।

বাবুজী বলেন—আমাদের কলকাতায় মেট্রো রেল হচ্ছে কিন্তু এত সমৃদ্ধ দেশ হওয়া সত্বেও সুইস সরকার মেট্রো রেল তৈরি করেন নি। এদেশে সবই 'সারফেস ট্রেন'।

—এঁরা কেন মেট্রো রেল তৈরি করেন নি ?

—কারণ প্রথমতঃ পাহাড়ী দেশ। এমন পাথুরে দেশে মেট্রো রেল তৈরি করা খুবই কষ্টকর। দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজন নেই। এঁদের ট্রেন বাস জাহাজ ও বিমান পরিবহনের ব্যবস্থা এত ভাল যে মেট্রো রেলের প্রয়োজন পড়ে নি। তুমি তো বিমানবন্দর থেকে জুগ আসার সময়েই দেখলে কি রকম 'swift and quiet trains !' এতটুকু দেশে ৫৬০০ কিলোমিটারের মতো রেলপথ রয়েছে। এজন্য এঁদের ৬৭২টি টানেল (Tunnel) কাটতে হয়েছে, পাঁচ হাজারের মতো পুল তৈরি করতে হয়েছে।

—সুইজারল্যান্ডে তো দু রকম ট্রেন ? বাবুজী থামতেই আমি প্রশ্ন করি।

বাবুজী মাথা নাড়েন, বলেন—হ্যাঁ, Surface train and Mountain train. এ ছাড়াও রয়েছে Cab তথা Cablecar অর্থাৎ যাকে তোমরা Rope-way বল। তাছাড়া বহু জায়গায় তুমি এই ধরনের গাড়ি পাবে।

—এই গাড়িটাকে আপনি মাউন্টেন ট্রেন বলছেন না ?

—না। আগামী কাল তোমাকে মাউন্টেন ট্রেন ও পরে একদিন ক্যাব্-এ চড়াবো। দেখবে আলপ্‌স-এর দুর্গম অঞ্চলে যাতায়াতের জন্য এঁরা কি চমৎকার পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন।

আমাদের আলোচনা থেমে যায়। উল্টোদিক থেকে এই গাড়ির মতো আরেকটা গাড়ি আসছে। আসছে এই একই লাইনে। কারণ এপথে একটাই লাইন। দুটো গাড়ি ঝড়ের বেগে একই লাইন ধরে একে অপরের দিকে এগিয়ে.

* লেখকের 'মানালীর মালঞ্চে' অথবা 'হিমালয়'-২য় পর্ব দ্রষ্টব্য।

চলেছে। 'এ্যাকসিডেণ্ট' হয়ে যাবে না তো ?

না। সামনে খানিকটা জায়গায় ডাব্‌ল-লাইন দেখতে পাচ্ছি। তার মানে ও গাড়িটা ওখানে নেমে থামবে, আমরাও ওখানে উঠে থামব। তারপরে 'ক্রসিং' হবে।

না, কেউ থামলাম না কিন্তু 'ক্রসিং' হল। ঠিক একই সময়ে দুটি গাড়ি ডাব্‌ল লাইনে পেঁছিল এবং একে অপরকে পাশ কাটিয়ে আবার 'সিঙ্গল' লাইনে ফিরে এলো। গাড়ির গতিবেগ কিছুমাত্র কম কিম্বা বেশি করতে হল না।

বাবুজী বোধ করি আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারেন। বলেন—এখানে সবই 'Computerised', এক সেকেণ্ড কিংবা এক ইঞ্চি এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই।

কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা জুগেরবার্গ এসে পেঁছিলাম। এখানেও তেমনি একটা প্ল্যাটফর্মের ধারে এসে গাড়ি থামল। এখানেও কাচের একটা গুমটি তথা বুকিং অফিস রয়েছে। তবে কোন ছাউনি নেই।

ড্রাইভার-কাম্‌-বুকিং ক্লার্ক গাড়ি থামালেন। ড্রাইভার কেবিনের বাইরে এসে কেবিন বন্ধ করলেন। তারপরে গাড়ির দরজা খুলে সবার আগে সিঁড়ি বেয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠে গেলেন।

আমরাও উঠে এলাম প্ল্যাটফর্মে। ড্রাইভার বুকিং অফিস খুলে ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালেন।

বাবুজী বলেন—এখানে সারাদিন লোকজন আসেন। কিছুক্ষণ বাদে এই ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে নিচে চলে যাবেন, তখন আবার নিচের গাড়িটা এখানে আসবে।

আমাদের কাছে ব্যাপারটা একটু বিস্ময়কর বৈকি! আমাদের দেশের নিয়মে এই ভদ্রলোক নিঃসন্দেহে তিনজন মানুষের কাজ করছেন—ড্রাইভার স্টার্টার ও বুকিং ক্লার্ক। শুনেছি পশ্চিমবঙ্গ স্টেট বাসে বাসপ্রতি প্রায় বিশজন করে কর্মী। অথচ প্রায় অর্ধেক বাস অচল হয়ে থাকে। যেগুলি সচল সেগুলিও অতিশয় নোংরা এবং জরাজীর্ণ। আর এঁদের একটি গাড়ির জন্য বোধ করি মাত্র দেড়জন মানুষ বরাদ্দ অথচ গাড়িগুলো কি রকম পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, প্রায় নতুনের মতো। আর তাই মাত্র পঁয়ষট্টি লক্ষ মানুষের একটুকরো বন্ধ্যা ভূখণ্ড বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যশালী দেশ।

প্ল্যাটফর্মে উঠে আসি। কাচের ছোট বুকিং অফিসটিকে বাঁয়ে রেখে আমরা এগিয়ে চলি। একফালি প্রায় সমতল প্রান্তর। বুঝতে পারছি এটি একটি পাহাড়ের শীর্ষদেশ, সমতল করা হয়েছে। সমতলের একপাশে একটা হোটেল-কাম্‌-রেস্তোরাঁ, আরেকপাশে একটা বড় বাড়ি—বাবুজী বললেন কন্‌ভেণ্ট কলেজ। দুয়ের মাঝে সবুজ 'পার্ক'। না, শুধু সবুজ নয়, অসংখ্য নানা রঙের ফুল ফুটে আছে। কাজেই একে পার্ক না বলে বাগান বলাই ভাল। না, তাও ঠিক

বলা যায় না, কারণ কলেজ-সংলগ্ন অংশে একটা খেলার মাঠ রয়েছে এবং ছেলে-মেয়েরা সেখানে খেলছে।

তবে এঃ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই যে এটা উপত্যকা নয়, একটা পাহাড়ের উপরিভাগকে সমতল করে এই রমণীয় ট্যুরিস্ট্ স্পট্-এ রূপান্তরিত করা হয়েছে। কাজেই এটিকে বোধ করি প্রকৃতির অবদান না বলে মানুষের সৃষ্টি বলাই বেশি উচিত হবে।

সে সৃষ্টির পেছনে অবশ্য একটি প্রাকৃতিক কারণ রয়েছে। এই পাহাড়টা আশেপাশের পাহাড়গুলির থেকে উঁচু, তাই এর অবস্থানটি অপূর্ব। এখান থেকে চারিদিকের দৃশ্য অপরূপ। অতএব পাহাড়ের উপরিভাগ সমতল করে এখানে রেল লাইন নিয়ে আসা হয়েছে।

আমরা পার্ক তথা বাগানে আসি। এখানে বহু মানুষের বসার ব্যবস্থা রয়েছে। আমরাও একখানি কাঠের বেঞ্চিতে বসে পড়ি। বসে বসে চারিদিকের দৃশ্য দেখি। মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ। বহুদূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে তুষারমৌলি আলপ্‌স। গত অক্টোবরের পরে আর হিমালয়ে যাওয়া হয় নি। তুষারাবৃত শিখরগুলিকে দেখতে বড় ভাল লাগছে। বার বার হিমালয়ের কথা মনে পড়ছে।

আকাশ থেকে মাটিতে ফিরে আসি। দেখতে পাই জুগ জনপদকে—সোজা দক্ষিণ-পূবে। অর্থাৎ আমরা জুগ থেকে উত্তর-পশ্চিমে চলে এসেছি।

সবচেয়ে সুন্দর লাগছে হ্রদটিকে—জুগের হ্রদ জুগের সী (Zuger See)। পশ্চিমদিক জুড়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে সবুজের মাঝে একখানি নীলাম্বরী।

বাবুজী বলেন—এখান থেকে হ্রদটাকে যেমন সুন্দর দেখাচ্ছে, ঐ হ্রদ থেকে এই জুগেরবার্গকেও তেমনি সুন্দর দেখায়। আমরা একদিন হ্রদে স্টীমারভ্রমণ করব, সেদিন হ্রদের বুকে বসে জুগেরবার্গ দেখতে পাবে। মনে হবে তুমি সিনেমাস্কোপ দেখছ।

একটু হেসে বলি—আজও তো তাই দেখছি।

—তা তো বটেই। বাবুজী বলেন।

আমি তাই দেখতে থাকি, রঙীন সিনেমাস্কোপ—আমার চারিদিকে। জুগের সী-র উত্তর-পূর্ব প্রান্তে সবুজ পাহাড়ের ঢালে ও হ্রদের তীরভূমিতে শহর জুগ, বাকি তীরভূমির প্রায় সবটা জুড়েই শুধু সবুজ আর সবুজ—সবুজ বনভূমি, সবুজ পাহাড় আর সবুজ উপত্যকা। বাড়ি-ঘর আছে এখানে-ওখানে, কিন্তু তা খুবই কম। তবে রয়েছে পথ। হ্রদের চারিদিকে রেল লাইন আর সুপ্রশস্ত মসৃণ মোটরপথ। পথ সমৃদ্ধির পথিকৃৎ।

পাহাড় বন ও হ্রদ ছাড়িয়ে সারা দক্ষিণদিক জুড়ে তুষারাবৃত পর্বতমালা। আবার হিমালয়ের কথা মনে পড়ছে আমার, মনে পড়ছে কৌসানী থেকে দেখতে

পাওয়া তুষারমৌলি হিমালয়ের কথা। অত উঁচু কিম্বা অত বড় নয়। আর তা হবেই বা কেমন করে। হিমালয় যে একমেবাদ্বিতীয়ম্। তা হলেও ভাল লাগছে আমার। আমি অপলক নয়নে তুষারাবৃত আল্পসের দিকে তাকিয়ে থাকি।

—আগামী কাল আমরা ওখানে যাবো।

বাবুজীর কথায় চমকে উঠি। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করি—ওখানে?

—হ্যাঁ। তিনি বলেন—আগামী কাল আমরা রিগি যাবো, রিগি কুল্ম (Rigi Kulm)। তুমি সেখানে যেমন বরফ দেখতে পাবে, তেমনি সেখান থেকে আলপ্সকে আরও বেশি উপভোগ করতে পারবে। সেই সঙ্গে দেখতে পাবে নিজেদের বুদ্ধি ও শ্রম দিয়ে এঁরা প্রকৃতির অবদানকে কেমন করে আরও সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়েছেন আর তারই ফলে তাঁদের দেশ হয়ে উঠেছে সমৃদ্ধ।

—তা তো এখানে এসেও দেখতে পেলাম।

—ওখানে গিয়ে তুমি আরও ভাল বুঝতে পারবে। একবার থামেন বাবুজী। তারপরে বলেন—এখন বরফ না থাকলেও, শীতকালে কিন্তু এখানেও বরফ পড়ে, সবটাই বরফে ঢেকে যায়। তখনও এখানে পর্যটকদের প্রচুর ভিড় হয়। তাঁরা 'স্কি' (Ski) করতে আসেন।

কথাটা মনে পড়ে আমার। জিজ্ঞেস করি—আচ্ছা বাবুজী, শুনেছি পর্যটন ব্যবসায়ে সুইজারল্যাণ্ডের অসামান্য সাফল্যের মূলে নাকি স্কি?

—তা বলতে পারো বৈকি। আর তাই বারো মাস এখানে 'ট্যুরিস্ট্ সিজন'। তবে এই জনপ্রিয়তার মূলে কারা জানো কি?

—কারা?

—বৃটিশরা। বাস্তবিকপক্ষে বিশ্বে পর্যটন ব্যবসার তাঁরাই আবিষ্কারক। ১৮৯৪ সালে স্যার আর্থার কোনান ডয়েল (Arthur Conan Doyle) তাঁর সুইজারল্যাণ্ডে 'স্কি' অভিযানের কাহিনী প্রকাশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার এ্যাড্ভেঞ্চার-প্রিয় বৃটিশ তরুণ-তরুণী ছুটে এলো সুইজারল্যাণ্ডে, আল্পস-এর ঢালে আর বরফে ঢাকা উপত্যকায়। তাঁদের দেখাদেখি য়ুরোপের অন্যান্য দেশের এবং আমেরিকার তরুণ-তরুণীরাও আসতে আরম্ভ করল। আর তারই ফলে 'Alps turned into export revenue!'

একবার থামলেন বাবুজী, তারপরে আবার বললেন—তবে সুইসরা ক্রমবর্ধমান পর্যটক আগমনের সঙ্গে সমতা রেখে নিজেদের দেশকে সমানে গড়ে তুলেছে। এঁদের মতো এত ভাল হোটেল পরিচালক পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া মুশ্‌কিল। সুইজারল্যাণ্ডের মতো এত ভাল পরিবহণ ব্যাঙ্ক ও ইনসিওরেন্স ব্যবস্থা পৃথিবীর খুব কম দেশেই আছে।

—যাক্গে, যে কথা বলছিলাম, এখন সুইজারল্যাণ্ডে প্রায় দেড়হাজার স্কি-লিফ্ট, কেবলওয়ে কিম্বা মাউণ্টেন রেল রয়েছে। এজন্য বিমান এবং হেলিকপ্টারের ব্যবস্থাও থাকে। তাঁরা গাড়িতে করে সর্বোচ্চ বিন্দুতে চলে যান,

সেখান থেকে পাহাড়ের ঢালে বরফের ওপর দিয়ে গড়িয়ে নিচে নামেন।

—তার মানে আমরা যে গাড়িটায় চড়ে এখানে এলাম, সেটা শীতকালেও চলাচল করে!

—নিশ্চয়ই।

—বরফ পড়ে লাইনটা ডুবে যায় না?

—যায়। কিন্তু লাইন বরফমুক্ত করার যান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে।

একবার থামেন বাবুজী। তারপরে বলেন—আর গল্প নয়, এবারে চলো এক কাপ কফি খেয়ে গাড়ি ধরা যাক। সকালে জুরিখ যাবার জন্য বিড়লাজীর সঙ্গে লাঞ্চ করতে পারি নি। এবেলা ওনার সঙ্গে ডিনার করতেই হবে। উনি ঠিক সাড়ে সাতটায় ডিনারে বসেন।

একই গাড়িতে চড়ে একই পথে আমরা জুগেরবার্গ থেকে শোনেক ফিরে এলাম। আসার পথে একটা কথা ভেবে বার বার অবাক হলাম—যে ঝোপঝাড় আর গাছপালা দিয়ে ছাওয়া পাথুরে পথ পেরিয়ে আমরা নেমে এলাম, সে পথটি শীতকালে বরফে ঢাকা পড়ে যায় আর সারা পৃথিবীর হাজার হাজার তরুণ-তরুণী সেই বরফের আকর্ষণে এখানে ছুটে আসে। মনে পড়ছে আমার বার্লিন-বাসী বন্ধু গৌরাঙ্গ বসুরায়ের বড় মেয়ে সুনারার কথা। সুনারা প্রায় প্রতি বছর শীতকালে স্কি করবার জন্য জুরিখ আসে। একবার তো পা ভেঙে মাসখানেক শুয়েছিল।

যাকগে সুনারার কথা, নিজেদের কথায় আসা যাক। শোনেগ থেকে বাসে করে ফিরে এলাম। বাবুজী বাসস্টপ থেকে সোজা বিড়লাজীর বাড়িতে চলে গেলেন। যাবার সময় বললেন—য়ুরোপে এসেছো, এখানে সবাই সকাল সকাল ডিনার করে, তুমিও আটটা নাগাদ ডিনার সেরে আমার ঘরে চলে এসো। কিছুক্ষণ গল্প করা যাবে।

সম্মতি জানিয়ে হোটেলে এলাম। রিসেপশানের সেই মেয়েটি মধুর হেসে জিজ্ঞেস করে—কোথায় গিয়েছিলেন, সুগেরবার্গ?

আমি মাথা নাড়ি।

সে আবার বলে—কেমন লাগল?

—ভাল, খুব ভাল।

চাবিটা হাতে দিয়ে সে আবার জিজ্ঞেস করে—আপনার কি প্যান্ট-সার্ট কাচার দরকার আছে? থাকলে কাল সকাল নটার আগে এখানে দিয়ে দেবেন, বিকেলে ঘরে পেয়ে যাবেন। চিঠিপত্র লেখার দরকার হলে কাগজ ও খাম নিয়ে যান। লিখে কাল সকালে এখানে দিয়ে দেবেন। আমরা টিকেট লাগিয়ে পাঠিয়ে দেব।

—কাল সকালে তো আপনিই কাউন্টারে থাকবেন?

—না। মেয়েটি বলে—আমার ডে-ডিউটি, আমি আসব নটার পরে। যে

থাকবে তারই কাছে রুম নম্বর বলে জিনিসগুলো দিয়ে দেবেন।

—তার নাম কি ?

—উর্সুলা (Ursula)

—আপনার ?

—মনিকা (Monika)

—আরে এ যে দেখছি ভারতীয় নাম।

সে হেসে বলে—হ্যাঁ। মিস্টার খৈতানও একই কথা বলেন।

—আরেকটা কথা, আমি বলি—আপনাদের এখানে কি মুচি আছে ? আমার জুতোটা পালিশ করা দরকার।

—আছে। তবে এখানে নেই, সেণ্ট্রুম-এ আছে। (সেণ্ট্রুম মানে সেণ্টার বা কেন্দ্রস্থল। য়ুরোপের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক শহর অথবা গ্রামে একটা করে সেণ্টার থাকে। সেখানেই সব বড় দোকান বাজার ইত্যাদি।) কিন্তু অনেক চার্জ নিয়ে নেবে।

—কত ?

—কম করেও তিন-চার ফ্রাঁ।

তার মানে আমাদের হিসেবে পনেরো থেকে বিশ টাকা। বাপরে বাপ, একজোড়া জুতোয় কালি দিতে বিশ টাকা ! কি বলব, বুঝতে পারছি না।

মণিকা আবার বলে—কিন্তু জুতো পালিশ করবার জন্য আপনার সেণ্ট্রুম-এ যাবার দরকার কি ? আমার সঙ্গে চলুন, আমি এখুনি আপনার জুতো পালিশ করিয়ে দিচ্ছি।

—কোথায় ? এখানে ?

—হ্যাঁ। আপনি একটু অপেক্ষা করুন।

কাগজপত্র গুছিয়ে, ড্রয়ার বন্ধ করে মনিকা বেরিয়ে আসে রিসেপশান কাউণ্টার থেকে। সে চলতে শুরু করে, আমি তাকে অনুসরণ করি। আমরা লাউঞ্জ ছাড়িয়ে আসি। প্যাসেজের শেষপ্রান্তে পৌঁছই। এখানে মেঝেতে কি একটা যন্ত্র রয়েছে দেখছি। অনেকটা আমাদের শান দেবার মেসিনের মতো। তবে পাথর নয়, তার পরিবর্তে দুখানি গোল ব্রাশ বসানো রয়েছে।

মনিকা বলে—আমি সুইচ অন্ করলেই দেখবেন, ঐ ব্রাশ দুটি ঘুরতে শুরু করেছে। ওর ওপরে জুতোটা পাতলেই জুতো পালিশ হয়ে যাবে।

মনিকা সুইচ অন্ করে দেয়। আমি জুতো পালিশ করতে করতে জিজ্ঞেস করি—এই যন্ত্রটার নাম কি ?

একটু হেসে মনিকা বলে—'সুপুট্সমাসিন'। আপনি বোধ হয় নামটা উচ্চারণ করতে পারবেন না। তার চেয়ে বানানটা শুনুন, Schuhputzmaschine।

ঠিকই বলেছে মনিকা। তার চাইতে যন্ত্রটাকে 'সু পালিশিং মেশিন' বলাই ভাল।

দু পাটি জুতো পালিশ করতে বড় জোর মিনিট দুয়েক লাগল। তারপরে মনিকার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লিফটের দিকে এগিয়ে চলি। 'আগামী কাল আবার দেখা হবে' বলে সে কাউণ্টারে চলে যায়।

আমি কিন্তু মনে মনে ওর কথাই ভাবতে থাকি। কতই বা বয়স? বেশি হলে বছর পঁচিশ। বিয়ে হয়েছে কিনা দেখে বোঝার উপায় নেই। সংসারে ওর কে আছে তাও জানি না। এদেশে আঠার বছর বয়স হবার পরে মেয়েদের সাধারণতঃ 'বয়ফ্রেণ্ড' কিম্বা 'হাজব্যাণ্ড' ছাড়া আর কেউ থাকে না। ওর নিশ্চয়ই তেমন কেউ আছে। কারণ সে দেখতে সুন্দরী এবং ভাল চাকরি করে।

কিন্তু আমি এসব কথা ভাবছি না। আমি ভাবছি, সকালে যখন প্রথম হোটেলে এসেছি, তখন তো সে আমার সঙ্গে এমন মধুর ব্যবহার করে নি! তাছাড়া তখন বলেছে চব্বিশ ঘণ্টা পরে আমাকে হোটেল ছেড়ে দিতে হবে, আর এখন বলে গেল—আগামীকাল আবার দেখা হবে।

কারণ কি? তাহলে কি ইতিমধ্যে বাবুজী কোন ব্যবস্থা করেছেন? হবে হয়তো।

লিফ্‌ট থেকে নেমে ঘরে আসি। ব্যালকনীতে এসে দাঁড়াই। সকালেই দেখেছি এদিকে বাগান নেই, শুধুই একফালি সবুজ মাঠ। বেশ বড় বড় ঘাস আর কয়েকটা বড় বড় গাছ—বোধ করি ইউকেলিপটাস। তারপরে হ্রদ—জুগের সী।

একখানি চেয়ার নিয়ে এসে ব্যালকনীতে বসি। হ্রদের দিকে তাকিয়ে থাকি। হ্রদের বুকে সোনালী রোদের ঝিলিমিলি। অসংখ্য পালতোলা ও দাঁড়-বাওয়া নৌকো, মোটর বোট, মোটর ইয়ট ইত্যাদি ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউ দাঁড় বাইছে, কেউ বা পাল তুলে চুপচাপ বসে আছে। স্পীড বোট-গুলো ঝড়ের বেগে চারিদিকে ছুটোছুটি করছে। কয়েকজন যুবক-যুবতী 'ওয়াটার-স্কি' করছে।

আর দেখতে পাচ্ছি প্রচুর পাখি এবং একখানি স্টীমার। হ্রদের বুকে এত মানুষ কিন্তু পাখিরা নির্ভয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

স্টীমারটা কোথায় চলেছে? কেমন করে বলব? যেখানেই যাক, আমি তাকিয়ে থাকি। দোতলা বেশ বড় স্টীমার। ছোটবেলার কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে আমাদের 'গারো' 'বেলুচি' 'ফ্লেমিংগো' প্রভৃতির কথা। ঐসব স্টীমারে চড়ে আমরা বরিশাল থেকে ঢাকা যেতাম, খুলনা আসতাম। কোথায় কীর্তনখোলা আর কোথায় এই জুগের সী! জুগে এসে আমার বরিশালের কথা মনে পড়ে গেল। ভেবেছিলাম এসব স্মৃতি চিরকালের মতো মরে গিয়েছে। ভুল। শৈশবের সুখস্মৃতি অমর অজর অক্ষয় ও অব্যয়।

তবে বড়ই বেদনাদায়ক। অতএব গারো বেলুচির কথা থাক। তার চেয়ে 'ZUG' লেখা এই স্টীমারটাকেই দেখা যাক। আকারে কিছু ছোট হলেও ভারী সুন্দর। তিনতলা স্টীমার। তিনতলায় শুধুই পায়লট কেবিন। আগাগোড়া

সাদা, কেবল প্রতি তলায় একটি করে লাল বর্ডার। আর প্রায় সবটাই কাচ দিয়ে ঘেরা। ভেতরে বসে থাকা যাত্রীদের পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

হ্রদের ওপারে কোথাও সবুজ তীরভূমি, কোথাও ঘন বন। বনের ফাঁকে ফাঁকে বাড়িঘর। তবে ওপারে বাড়িঘর কম। বাড়িঘর এপারেই বেশি। এপারে সারি সারি বাড়িঘর আর সবুজ পাহাড়। পাহাড়ের গা থেকে বাড়িঘরগুলো নেমে এসেছে হ্রদের তীর পর্যন্ত।

হ্রদের তীরে তীরে রেলপথ আর মোটরপথ। মাঝে মাঝে ট্রেন ও প্রায় সর্বদা মোটর যাতায়াত করছে। তাহলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিন্দুমাত্র বিনষ্ট হচ্ছে না। বরং বলতে পারছি যন্ত্র-সভ্যতা আর প্রশান্ত-প্রকৃতি মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। আমি দেখি আর দেখি। সময় বয়ে চলে।

ফোনের শব্দে ভাবনা থেমে যায়। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াই, ঘরে আসি। ফোন ধরি। বাবুজী বলেন—কি করছ? কখন আসবে? খাওয়া হয়ে গেছে?'

—আজ্ঞে না।

—সে কি! ক'টা বাজে খেয়াল আছে? সাড়ে ন'টায় রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে যাবে।

বাবুজী কি বলছেন বুঝতে পারছি না। বাইরে যে এখনও রোদ রয়েছে। তাড়াতাড়ি ঘড়ি দেখি। অবাক কাণ্ড, এ যে ন'টা বাজে! ঘড়িটার নিশ্চয়ই গোলমাল হয়েছে। কিন্তু বাবুজী ওকথা বলছেন কেন?

তাই জিজ্ঞেস করি—এখন ক'টা বাজে বাবুজী?

তিনি একটু হাসেন, বলেন—তোমার ঘড়ি ঠিক আছে। এখন ন'টা-ই বাজে।

—কিন্তু বাইরে যে রোদ রয়েছে!

—থাকবেই। তিনি আবার হাসেন। বলেন—এখন গ্রীষ্মকাল। এখানে সাড়ে ন'টার পরে সন্ধ্যা হবে। তুমি চট করে খেয়ে নিয়ে আমার ঘরে চলে এসো। তিনি ফোন ছেড়ে দেন।

আমি ফোন রেখে দিই। হ্রদের দিকে তাকিয়ে দিনের আলোর হেঁয়ালি আরেকবার দেখে নিই। তারপরে বেরিয়ে আসি ঘর থেকে। ভাগ্যিস বাবুজী ফোন করেছিলেন। নইলে যে সন্ধ্যার আশায় বসে থাকতে গিয়ে আজ রাতে আমাকে অভুক্ত থাকতে হত।

॥ সাত ॥

ঘুম ভেঙে যায়। ঘড়ি দেখি। ছ'টা বেজে দশ। সুইজারল্যাণ্ডে আজ আমার প্রথম সকাল। ব্যাপারটা স্বপ্নের মতো হলেও বাস্তব সত্য। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যশালী ও সুন্দর দেশে ঘুম ভেঙেছে আমার। তার চাইতেও বড় কথা বাবুজী রয়েছেন আমার সঙ্গে। আমি সত্যই সৌভাগ্যবান।

গতকাল বিকেলে বাবুজী বিড়লাজীকে বলে এসেছেন, আজ দুপুরেও তিনি তাঁর সঙ্গে লাঞ্চ্ করছেন না, আমাকে নিয়ে বেড়াতে বের হচ্ছেন। আমরা আজ রিগি কুলম্ (Rigi Kulm) দেখতে যাবো। যাবার পথে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুন্দর শহর লুসার্ন দেখব।

মুখ-হাত ধুয়ে আরাম করে স্নান করি। তারপরে প্যাণ্ট-সার্ট ও পুলওভার পরে একেবারে তৈরি হয়ে নিয়ে নিচে নেমে আসি। ডাইনিং হলে এসে ঢুকি।

হ্যাঁ, যা ভেবেছি ঠিক তাই—বাবুজী এসে বসে রয়েছেন। সাতটায় আসবার কথা ছিল। আমার কয়েক মিনিট দেরি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তিনি যথাসময়ে এসে গিয়েছেন। আমি তাই দেরি হবার জন্য দুঃখপ্রকাশ করি।

তিনি মৃদু হেসে বলেন—তাতে কি হয়েছে? আমাদের তো আজ আর অফিসে যেতে হবে না। এবারে ব'লো, কি খাবে?

—ও'রা যা দেবেন।

—এরা তোমাকে ফ্রুট-জুস, রুটি মাখন জেলী, আলুভাজা অথবা ডিমভাজা এবং কফি কিম্বা চা দেবে। এর জন্য তোমাকে কোন দাম দিতে হবে না। কারণ য়ুরোপের অধিকাংশ হোটেলেই, 'Bed and Breakfast system।' অর্থাৎ তুমি বিছানা ও ব্রেকফাস্ট পাবে। লাঞ্চ্ এবং ডিনার তোমাকে কিনে খেতে হবে। শুধু তাই নয়, এ'দের দেওয়া ব্রেকফাস্ট-এর পরে তুমি যদি কোন বিশেষ খাদ্য খেতে চাও, তাও তোমাকে কিনতে হবে।

—তার কোন দরকার আছে কি? আমি জিজ্ঞেস করি।

বাবুজী উত্তর দেন—আছে। আমরা আজ সারাদিনের জন্য বের হচ্ছি, পথে আর লাঞ্চ্ খাবো না, টুকিটাকি খেয়েই চালিয়ে নিতে হবে। তাই এসো, আমরা ওদের ব্রেকফাস্ট-এর সঙ্গে একটু 'কর্ন-ফ্লেক্স' নিই।

উত্তম প্রস্তাব। আমাদের দুধ-চিঁড়ের মতো কর্ন-ফ্লেক্স-ও অনেকক্ষণ পেটে থাকে।

আজও হাসতে হাসতে সিল্‌ভিয়া এসে হাজির হয়। সামনে এসে বলে—গুড মর্ণিং।

আমরাও সুপ্রভাত জানাই। অর্ডার নিয়ে সিল্‌ভিয়া চলে যায়। বাবুজী

বলেন—বড় ভাল মেয়ে। ইংরেজী জানা খদ্দের পেলেই ছুটে আসে।

আমি মাথা নেড়ে বলি—জানি। কালই ওর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। যেমন মধুর ব্যবহার তেমনি কাজের ক্ষিপ্রতা। শুধু ওর নয়, এখানকার সবারই। আর কি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক। আমার তো কাল এদের দেখে রূপকথার পরীদের কথা মনে পড়ে গিয়েছে।

বাবুজী মাথা নেড়ে বলেন—ঠিকই বলেছো! তাছাড়া 'সার্ভিস', তুলনা নেই। একদিন আমি 'স্যালাড' নিতে চাইলাম কিন্তু 'মেনুকার্ড' দেখে বুঝতে পারছিলাম না কোন্‌টি আনতে বলব? সিল্‌ভিয়া আমাকে কিচেনে নিয়ে গিয়ে সব স্যালাড দেখিয়ে জেনে নিল কোনটি আমার পছন্দ। আরেকদিন 'পেস্ট্রী' খাবার ইচ্ছে হল। সেদিনও একই সমস্যা দেখা দিল। তখন সিল্‌ভিয়া একটা ট্রলিতে করে সব পেস্ট্রী নিয়ে এসে হাজির করল। আমি আমার পছন্দমত একটা বেছে নিলাম।

সিল্‌ভিয়া খাবার নিয়ে আসে। বাবুজী হাসতে হাসতে বলেন—আমরা তোমার প্রশংসা করছিলাম।

—ধন্যবাদ। হেসে সিল্‌ভিয়া আমাদের পরিবেশন শেষ করে। তারপরে অন্য টেবিলে চলে যায়, ওর এখন প্রশংসা শোনার সময় নেই।

আমরা নিঃশব্দে খাবার খেতে থাকি। খেতে খেতে ভাবি, মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা হ'লো সুইজারল্যাণ্ডে এসেছি। কিন্তু এরই মধ্যে পর্যটন ব্যবসায়ে এদের অসামান্য সাফল্যের কারণটি জেনে গিয়েছি। মধুর ব্যবহারই এই সাফল্যের প্রথম সোপান।

খাওয়া-শেষে দুজনে বেরিয়ে আসি হোটেল থেকে। বাসস্টপে এসে দাঁড়াই। বাবুজী টিকেট করেন। একটু বাদে বাস আসে। বাসে চড়ে আমরা জুগ রেলস্টেশনে আসি।

টিকেট কাউণ্টারে এসে বাবুজী রিগি কুলম-এর দুখানি 'রিটার্ন' টিকেট চাইলেন। বুকিং ক্লার্ক কি যেন জিজ্ঞেস করলেন। আমরা ওঁর প্রশ্ন বুঝতে পারি না।

লোকটি হাত নেড়ে আমাদের একটু অপেক্ষা করতে বলে পাশের ঘরে চলে গেলেন। আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম।

একটু বাদে হাতে একখানি রঙীন 'লীফ্‌লেট' নিয়ে ভদ্রলোক ফিরে এলেন—ওপরে বড় বড় করে লেখা—RIGI। ভেতরে সামান্য লেখা আর বাকি সবটা জুড়েই ছবি। খান-বিশেক রঙীন ফটো ও একখানি মানচিত্র। মানচিত্রটি মেলে ধরে তিনি পকেট থেকে কলম বার করে দাগ দিতে দিতে বললেন—এই দেখুন জুগ, আপনারা এখানে রয়েছেন। আর এই হোল রিগি, আপনারা এখানে যাবেন। এখান থেকে রেলে লুসার্ন যাবেন, সেখান থেকে স্টীমারে ফিজনাউ (Vitznau) তারপরে মাউণ্টেন রেলে রিগি। আপনারা এই পথে গিয়ে এই পথেই ফিরে

আসতে পারেন। আবার উল্টোদিক দিয়ে অর্থাৎ পাহাড়টাকে ঘুরে এই আরথ্‌ গোল্‌ডাও (Arth-Goldau) নেমে সেখান থেকে জুগ হ্রদের তীর ধরে ফিরে আসতে পারেন। নতুন পথে ফিরলে আপনাদের দু' ফ্রাঁ করে বেশি ভাড়া লাগবে।

ভদ্রলোক মানচিত্রখানি বাবুজীর হাতে দেন। বাবুজী আমার দিকে তাকান। বলেন—'সার্কুলার ট্রিপ্‌' করাই ভাল, কি বল ?

—হ্যাঁ। নতুন পথ দেখা যাবে। আমি উত্তর দিই।

বাবুজী ভদ্রলোককে সার্কুলার টিকেট দিতে বলেন। তিনি আবার মনে করিয়ে দেন—এই টিকেটে আপনাদের দু' ফ্রাঁ করে বেশি লাগছে কিন্তু।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানান বাবুজী। ভদ্রলোক সানন্দে টিকেট দেন। আমরা টিকেট নিয়ে তাড়াতাড়ি কাউণ্টার ছেড়ে দিই। ইতিমধ্যে আমাদের পেছনে লাইন বেশ লম্বা হয়ে গেছে। যাবেই তো। ভদ্রলোক প্রায় মিনিট দশেক আমাদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু লাইনের কেউ কোন বিরক্তি প্রকাশ করেন নি।

টিকেট নিয়ে প্ল্যাটফর্মে এলাম। একটু বাদেই ট্রেন্‌ এলো। তেমনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে ট্রেন। আমরা ট্রেনে উঠি। গতকালের মতো অত ফাঁকা না হলেও প্রচুর জায়গা রয়েছে। আমরা বসে পড়ি।

কয়েক মিনিট বাদে অর্থাৎ সকাল আটটা বেয়াল্লিশ মিনিটে ট্রেন ছাড়ল। আগেই বলেছি—আমরা এখন লুসার্ন চলেছি। ইংরেজরা লেখেন, 'Lucerne', আর সুইসরা 'Luzern'। উচ্চারণ কিন্তু একই। কারণ আগেই বলেছি জার্মান ভাষায় 'z'-এর উচ্চারণ 'স'-এর মতো।

আমরা উত্তর-পশ্চিমে চলেছি। জুরিখের উত্তরে জুগ, জুগের উত্তর-পশ্চিমে লুসার্ন। জুরিখ থেকে যেমন জাতীয় সড়ক জুগ হয়ে লুসার্ন গিয়েছে, তেমনি রেল-লাইনও জুগ হয়ে লুসার্ন পেঁীচেছে। আমরা তাই চলেছি। জুরিখ এবং জুগের মতো লুসার্নও হ্রদের তীরে। হ্রদের নাম ফিয়ারওয়াল্‌ড-স্টাটার সী (Vierwald-Statter See), আমি বলছি 'সী', কিন্তু 'See' শব্দটার সুইস তথা জার্মাণ উচ্চারণ 'জে' (Zay)। ওদের যেমন 'Z'-এর উচ্চারণ 'স', তেমনি 'S'-এর উচ্চারণ 'জ' বা 'Z'-এর মতো।

লুসার্ন হ্রদটি সুইজারল্যাণ্ডের একটি সবচেয়ে সুন্দর হ্রদ। হ্রদের পূর্বতীরে লুসার্ন—সুন্দরী লুসার্ন।

আমাদের ট্রেন এখন জুগ হ্রদের দক্ষিণতীর দিয়ে চলেছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা জুগ শহর ছাড়িয়ে এলাম। শুরু হল ক্ষেত-খামার। পাহাড়ের উপত্যকায় ছবির মতো সুন্দর সবুজ শষ্যক্ষেত্র।

একটু বাদে একটি স্টেশন, নাম শাম্‌ (Cham)। এ জনপদটিও জুগ হ্রদের তীরে। এতক্ষণ আমরা পুবে এসেছি। এবারে গাড়ি দক্ষিণ-পশ্চিমে চলতে শুরু করেছে। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জুগের সী অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা রটক্রইট্‌স (Rotkreuz) নামে আরেকটা ছোট জনপদে এলাম। মিনিট-

খানেক গাড়ি থামল। চার নম্বর জাতীয় সড়কও আমাদের সঙ্গে লুসার্ন চলেছে।

রটক্রইট্‌স থেকে গাড়ি ছাড়ার একটু পরেই একটা উপত্যকায় উপনীত হলাম। বাবুজী বলেন—এই উপত্যকাটির নাম রয়েস (Reuss)। লুসার্ন হ্রদ থেকে উৎপন্ন হয়ে রয়েস নদী এদিকে এসেছে। নদীর সঙ্গে দেখা হবে আরও পরে, একেবারে লুসার্ন শহরে। তারই তীরে বিশ্ববিখ্যাত লুসার্ন শহর।

উপত্যকার ওপর দিয়ে ট্রেন উত্তর-পূর্বে এগিয়ে চলেছে। বেশ উর্বর ও সমতল উপত্যকা। জুগ-লুসার্ন অঞ্চলটি মধ্য-সুইজারল্যাণ্ডের অন্তর্গত। আবার লুসার্ন হল মধ্য-সুইজারল্যাণ্ডের মধ্যাঞ্চল।

উপত্যকার দুপাশেই পাহাড় ও বন দেখতে পাচ্ছি, তবে অনেক দূরে প্রায় দিগন্তের কাছে। গাড়ির গতিবেগ কত তা জানা নেই আমার। কেবল বলতে পারি গাড়ি বেশ জোরে চলেছে। কাচের ভেতর দিয়ে দুপাশে ক্ষেত বন আর পাহাড়কে রঙীন চলচ্চিত্র বলে মনে হচ্ছে।

আবার একটা স্টেশন। নাম—গিসিকোঁ-রুৎ (Gi·ik~n-Root)। আর এখানেই দেখা হল রয়েস নদীর সঙ্গে।

এবারে গাড়ি ছাড়বার একটু পরেই শুরু হয়ে গেল ঘন বসতি। বুঝতে পারছি কোন বড় শহর আসছে।

বাবুজী বলেন—লুসার্ন এসে গেল। তুমি তো জানো, লুসার্নকে বলা হয়, 'O ıe of the w rld's most magical spot , the jewel of Switzer land'।

আমি মাথা নাড়ি। বাবুজী বলে চলেন—শত শত বছর ধরে প্রকৃতি-প্রেমিকরা লুসানের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে চলেছেন। শহরের সমৃদ্ধতম অংশটি কিন্তু এই রয়েস নদীর দুই তীরে।

বাইরে তাকাই। হ্যাঁ, নদীর ওপর দিয়ে গাড়ি চলেছে। অর্থাৎ আমরা রয়েসের উত্তর তীর থেকে দক্ষিণ তীরে চলেছি। নদীকে দেখি, ছোট নদী কিন্তু বেশ নাব্য ও খরস্রোতা।

বাবুজী বলছেন—লুসার্ন প্রাচীন জনপদ, হাজারখানেক বছর তো হয়েছেই। কিন্তু তখন লুসার্ন ছিল জেলেদের একটি ছোট গ্রাম। গ্রামের উপকণ্ঠে পাহাড়ের ওপর ছিল একটি মঠ, a Benedictine monastery, owned by the powerful Alsatian Abbey of Murbach।

মঠের সন্ন্যাসীরা ছিলেন গ্রামের শাসক। তাঁদের চেষ্টায় গ্রামটি ধীরে ধীরে উন্নীত হয়ে একটি শহরে রূপান্তরিত হয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই শহরের ওপর দিয়ে য়ুরোপের আন্তর্জাতিক পথ Gotthard north-south route নির্মিত হয়। ফলে শহরটি খুব তাড়াতাড়ি উন্নত হতে থাকে। কিন্তু ১২৯১ খৃষ্টাব্দে হাবসুবুর্গ-রা (Habsburgs) মুরবাখদের কাছ থেকে মঠটি দখল করে নেয়। ফলে শহরবাসীরা তাঁদের

স্বাধীনতা সম্পর্কে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। তাঁরা সুইস কন্‌ফেডারেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ১৩৩২ সালে শহরবাসীরা কনফেডারেশোনে যোগদান করেন। বলা বাহুল্য হাব্‌সবুর্গ-রা এই সংযুক্তি মেনে নিলেন না। শেষ পর্যন্ত কনফেডারেশানকে তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয়। ১৩৮৬ সালে সেমপাখ্‌-এর (Sempach) যুদ্ধে লুসার্ন হাব্‌স্‌বুর্গদের অধিকার-মুক্ত হয়।

এই স্বাধীনতা লুসার্ণবাসীদের জীবনে সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য কন্‌ফেডারেশনের মাঝে মাঝেই ভারাটে সৈন্যের দরকার পড়ত। লুসার্ন সেই সৈন্য সরবরাহ শুরু করল। আর এই ব্যবসা করে লুসার্নের একদল বণিক প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে থাকলেন। ফলে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে লুসার্নে একটা ধনিকশ্রেণী আত্মপ্রকাশ করল।

থামলেন বাবুজী। শহরের ভেতর দিয়ে ট্রেন এগিয়ে চলেছে। ছবির মতো সুন্দর পাহাড়ী শহর, সমৃদ্ধ শহর। আমি দুচোখ ভরে দেখি।

—তুমি তো জানো……

বাবুজীর কথায় তাঁর দিকে তাকাই। তিনি বলেন—তুমি তো জানো, আজ আমরা পাহাড়কে এত পছন্দ করলেও মধ্যযুগে মানুষের মনে পাহাড় সম্পর্কে একটা প্রচণ্ড ভীতি ছিল। সেকালের মানুষদের বিশ্বাস ছিল পাহাড় মানেই রূপকথার ডাইনী আর ড্রাগনদের বাসভূমি। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে এই বিশ্বাসের অবসান হয়। মানুষ পাহাড়ের স্বর্গীয় সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে শুরু করেন, তাঁরা পাহাড়প্রিয় হয়ে ওঠেন। লুসার্নের কাছাকাছি সুন্দর পাহাড় থাকায় লুসার্নও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

পর্যটকরা যখন লুসার্নের সৌন্দর্যে বিমোহিত হচ্ছেন, তখন 'থ্রি মাস্কেটিয়ারস্‌'-খ্যাত বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক আলেকজান্দার দুমা (Alexander Dumas) লুসার্নের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখলেন, 'a pearl in the world's most beautiful oyster'।

এই বর্ণনায় উৎসাহিত হয়ে স্বয়ং রাণী ভিক্টোরিয়া লুসার্ন ভ্রমণে আসেন। তিনি ঘোড়ায় চড়ে পাশের পিলাটাস (Pilatus) পাহাড়ে আরোহণ করেন। ফলে উনবিংশ শতাব্দীতেই লুসার্ন বিশ্বের একটি সবচেয়ে জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়।

প্রখ্যাত গীতিকার ও সুরকার রিচার্ড ভাগ্‌নার (Richard Wagner) প্রায় ছ' বছর লুসার্নে বাস করেছেন। তিনি এখানকার সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে বলতেন—'The sweet warmth of Lucerne's quay is such that it even makes me forget my music !'

বলা বাহুল্য তিনি সত্যি সত্যি গান ও সুর হারিয়ে ফেলেন নি, বরং এখানে বসেই তাঁর 'Die Meistersinger', 'Sieg fried' এবং 'Gotterdammerung' প্রভৃতি বিখ্যাত গান রচনা করে সুর সংযোজন করেছেন।

অবশেষে লুসার্ণ সেণ্ট্রাল স্টেশনে এসে ট্রেন থামল। এখন সকাল সাড়ে ন'টা। তার মানে জুগ থেকে এই পথটুকু আসতে আমাদের আটচল্লিশ মিনিট সময় লাগল। বোধ করি দূরত্ব ৪০/৪২ কিলোমিটার হবে।

স্টেশনটি খুব বড় নয়, কিন্তু যেমন সুন্দর তেমনি অবস্থান। নদীর জন্মস্থানের অনতিদূরে হ্রদের তীরে রেলস্টেশন। বাইরে এসেই হ্রদকে দেখতে পেলাম। দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি। সামনে সুপ্রশস্ত হ্রদের নিশ্চল জলরাশি সচল ও সংকীর্ণ রয়েস নদীতে রূপান্তরিত। আমাদের বাঁয়ে নদী আর ডাইনে হ্রদ। নদীর ওপারে জনপদ আর হ্রদের ওপারে তুষারাবৃত আলপ্স। জনপদ মানে আধুনিক ডিজাইনের বাড়ি হোটেল আর মসৃণ পথ। নদীর ওপরে পুল। একটি নয়, পর পর কয়েকটি পুল। সঙ্গমের পুলটিকেই সবচেয়ে আধুনিক ও বড় বলে মনে হচ্ছে। বাবুজী বলেন—হ্যাঁ, এটাই বড়। নাম, Seebrucke. এই ব্যস্ত আন্তর্জাতিক শহরের অধিকাংশ গাড়ি এই পুলের ওপর দিয়েই যাতায়াত করে।

বাবুজীর কথা শুনে অবাক হই। কারণ নদীটি সংকীর্ণ হলেও এখানে সে বেশ প্রশস্ত। প্রকৃতপক্ষে নদীর সবচেয়ে চওড়া জায়গায় সবচেয়ে বড় পুলটি তৈরি করা হয়েছে। সে কথাই জিজ্ঞেস করি বাবুজীকে।

বাবুজী বলেন—হ্যাঁ, তুমি ঠিকই লক্ষ্য করেছো, নদীর ওপরে আরও একটি পুরোনো ও চারটি নতুন পুল রয়েছে। সেগুলি অনেক ছোট, কারণ নদী ওখানে চওড়ায় কম। তবু এটাই প্রধান পুল। এরই ওপর দিয়ে অটোবান (Autobahn) বা European Super National Highway এসেছে। এর কারণ বোধ করি, সুইজারল্যাণ্ডের বেসাতি তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। পর্যটকরা যাতে লুসার্ণ পৌঁছেই এই পুলের ওপর থেকে লুসার্ণ হ্রদ আর শহরকে দেখে মোহিত হয়ে যান, তাই নদীর প্রশস্ততম অংশে পুলটি তৈরি করেছেন। জুরিখেও তাই দেখবে।

বাবুজীর মন্তব্যটিকে যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হচ্ছে। তিনি আবার বলেন—আরেকটা জিনিস বোধ হয় খেয়াল করেছো?

আমি তাঁর দিকে তাকাই। তিনি বলেন—আমরা উত্তর থেকে এসেছি কিন্তু এটা লুসার্ণ শহরের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত। অর্থাৎ ট্রেনটি নদী পেরিয়ে প্রায় সারা শহরকে প্রদক্ষিণ করে আমাদের সোজাসুজি লুসার্ণের এই সবচেয়ে সুন্দর জায়গাটিতে নিয়ে এসেছে। আর এখানেই এঁরা রেলস্টেশন করেছেন।

একবার থেমে বাবুজী আবার পুলের প্রসঙ্গে ফিরে আসেন। বলেন—তোমাকে আগেই বলেছি, এই Seebrucke ছাড়াও শহরের উত্তরাংশ থেকে এই দক্ষিণাংশে আসবার জন্য নদীর ওপরে আরও পাঁচটি পুল রয়েছে। তার মধ্যে একটা পুলের কথা তোমাকে বলা দরকার, ঐ দ্বিতীয় পুলটি। ওটির নাম Kapellbrucke.

—ওটা কি একটা পুল? ওদিকে তাকাতেই প্রশ্নটা আমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে।

—হ্যাঁ, পুল। কাঠের পুল। এটা য়ুরোপের একটি প্রাচীনতম পুল, ১৩৩০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ নির্মিত, ভেতরটা দেখবার মতো। চালের ফ্রেমের সঙ্গে অনেক-গুলি ত্রিভুজাকৃতি রঙ্গীন চিত্র বা Triangular roof Paintings রয়েছে।

আমি দেখি, নদীর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত সরু কাঠের ঘর, মনে হয় জলে ভাসছে। ওপরে টালির চাল। ভেতরে বোধ করি জনচারেক লোক পাশাপাশি হাঁটতে পারে।

একবার ভেতরটা দেখতে পারলে হ'ত। কিন্তু, এখন সময় নেই। আরেকদিন যদি লুসার্ণ আসতে পারি, তখন দেখা যাবে। এখন দূর থেকেই যতটা সম্ভব দেখে নেওয়া যাক, আমি দেখি।

আগেই দেখেছি, নদীটি তেমন চওড়া নয়। কেমন করেই বা হবে? দু' তীরই যে পাথর দিয়ে বাঁধানো। দু' তীরেই মসৃণ পথ আর ছবির মতো সুন্দর বাড়ি-ঘর। এখান থেকে দাঁড়িয়েই আমি নদীর ওপরে ছ'খানি পুল দেখতে পাচ্ছি। ভাবতে লজ্জা লাগছে, কলকাতায় আমরা এখনও দ্বিতীয় হাওড়া পুলটি তৈরি করে উঠতে পারলাম না!

—লুসার্ণের প্রধান আকর্ষণ এই নদী, হ্রদ, পাশের পিলাটাস পাহাড় এবং ওপারের তুষারাবৃত শৃঙ্গমালা। তাই ওরা তোমাকে রেলে চাপিয়ে একেবারে এমন জায়গায় নিয়ে এসে ফেলেছেন, যেখান থেকে তুমি লুসার্ণের স্বর্গীয় সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারো এবং অনায়াসে যেখানে খুশি চলে যেতে পারো।

—আমরা তো স্টীমারে করে ওপারে যাবো? আমি প্রশ্ন করি।

—হ্যাঁ। মাথা নেড়ে বাবুজী বলেন—তোমাকে আগেই বলেছি, লুসার্ণ বিশ্বের সবচেয়ে রমণীয় নগরীগুলির অন্যতমা। অবস্থানই একে এমন সুন্দর করে তুলেছে এবং এই হ্রদই লুসার্ণের প্রধান আকর্ষণ। Vierwald শব্দটার মানে করলে দাঁড়ায় চার পৃথিবী। এখানে পৃথিবী বলতে Canton বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ Lake of the four forest Cantons. হ্রদের চারিদিকে চার Canton-এর বনাবৃত পাহাড়, আর একটু দূরের উত্তরাঞ্চল জুড়ে দেখো, কি সুন্দর তুষারাবৃত শৃঙ্গমালা! তোমার নিশ্চয়ই কৌসানীর কথা মনে পড়ছে!

—তা পড়ছে। কিন্তু কৌসানীতে যেমন ভুল হয়, হাত বাড়ালেই বুঝিবা হিমবন্ত হিমালয়কে ছোঁয়া যাবে, তেমনটি মনে হচ্ছে না।

—তা তো বটেই। আলপস্ যতো সুন্দরই হোক, হিমালয়ের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। হিমালয় যে অতুলনীয়। হিমালয় ক্ল্যাসিক আর আলপস্ রোম্যাণ্টিক।

বাবুজী আবার বলেন—লুসার্ণের আরেকটি মজা আছে।

—কী?

—এই কাঠের পুল, নগরীর প্রাচীন প্রাচীর, গীর্জা আর কিছু বাড়ি দেখলে তোমার মনে হবে লুসার্ণ এখনও বুঝি বা মধ্যযুগে রয়ে গিয়েছে। কিন্তু শহরের

পথে সামান্য কিছুক্ষণ পায়চারি করলেই তুমি বুঝতে পারবে, লুসার্ণ অতীতে বাস করছে না, সে অতিমাত্রায় আধুনিক। দোকানপাট বাড়িঘর হোটেল রেস্তোরাঁ যেখানেই যাও, তুমি আধুনিকতম যন্ত্র-সভ্যতার স্পর্শলাভ করবে।

—আচ্ছা, এই শহরের স্থায়ী জনসংখ্যা কত? বাবুজী থামতেই প্রশ্ন করি।

একটু হেসে তিনি উত্তর দেন—মাত্র সত্তর হাজার।

হাসি পায়, কলকাতার উপকণ্ঠে একটি উদ্বাস্তু উপনিবেশের জনসংখ্যা।

বাবুজী আবার বলেন—লুসার্ণের সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক আকর্ষণ International Music Festival. প্রতি বছর অগাস্টের মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বারের মাঝামাঝি পর্যন্ত মহাসমারোহে এখানে ঐ উৎসব পালিত হয়। লুসার্ণের প্রধান দর্শনীয় হল সিভিক থিয়েটার এবং কয়েকটি মিউজিয়াম—আর্ট্স মিউজিয়াম, হিস্টরিক্যাল মিউজিয়াম, ট্রান্সপোর্ট এ্যাণ্ড কমিউনিকেশান মিউজিয়াম ইত্যাদি। এখানকার সবচেয়ে বড় খেলার আসর—International Horse Show এবং International Rowing regattas on the Rot See.

—Lucerne wall এবং Lion of Lucerne কি?

—দুটিই বিশ্ববিখ্যাত। লুসার্ণ প্রাচীরের নাম মুসেগ্‌মাওয়ার (Mussegg-mauer)। ছ'টি Tower সহ এই ৩০০০ ফুট প্রাচীরটি ৬০০ বছর আগে নির্মিত, কিন্তু এত স্বযত্নে সংরক্ষিত যে দেখলে মনে হয় হালে তৈরি। আর লায়ন অব্ লুসার্ণের নাম লোয়েনডেংকমাল (Lowendenkmal)। থ্রোভাল্ডসেন (Throvaldsen) নামে একজন ডেনিশ ভাস্কর ১৮২১ সালে একটা পাহাড়ের গায়ে বর্শার ঘায়ে আহত এই সিংহমূর্তিটি খোদাই করেছেন। ফরাসী বিপ্লবে নিহত সুইস সৈন্যদের স্মৃতিতে উৎসর্গিত এই মূর্তি। দেখলে আহত সিংহটির জন্য জল আসবে তোমার চোখে। তাই মার্ক টোয়াইন বলেছেন, 'The most mournful and moving piece of stone in the world'

কথা বলতে বলতে আমরা স্টীমার ঘাটে এসে গিয়েছি। টিকেট করার ঝামেলা নেই। এক টিকেটেই সারাদিনের ভ্রমণ সেরে নেওয়া যাবে। স্টীমারও দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভারী সুন্দর দোতলা স্টীমার। আমরা স্টীমারে এসে উঠি।

॥ আট ॥

ভারী সুন্দর দোতলা স্টীমার। আকারেও ছোট নয়, বরং বড়ই বলা যেতে পারে। এবং বলা বাহুল্য এটি মোটর ভেসেল (Vessel), অর্থাৎ কয়লার নয়, তেলের জাহাজ।

নিচের তলায় ইঞ্জিন, রেস্তোরাঁ আর দ্বিতীয় শ্রেণীর বসবার জায়গা। কিন্তু এখানে পর্যটকরা ভিড় করেন নি। সবাই দোতলায় উঠে গিয়েছেন। আমরাও তাই আসি।

একটি ছোট 'বার' (Bar) ছাড়া দোতলার সবটা জুড়েই 'ডেক্'। তিন সারিতে বসবার জায়গা—সুদৃশ্যে চয়ার অথবা বেঞ্চি পাতা। বেঞ্চিতে হেলান দেবার ব্যবস্থা আছে। সামনের দিকে চেয়ার—প্রথম শ্রেণী, পেছনে বেঞ্চি—দ্বিতীয় শ্রেণী। ভাল জায়গা দেখে আমরাও বসে পড়ি।

কয়েক মিনিট বাদেই স্টীমার ছাড়ে। ঘড়ি দেখি পোনে দশটা। লুসার্ণের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দুদিকে তাকাই। হ্রদের দু' তীরেই পাহাড় আর বন। কালো পাথুরে পাহাড় আর সবুজ বন—বড় বড় গাছ। কোথাও কোথাও পাহাড়ের গায়ে কিম্বা হ্রদের তীরে বনের ধারে দু-একখানি বাড়ি। আর পেছনে লুসার্ণ ও পিলাটাসের রমণীয় দৃশ্য। রঙ্গীন ছবির মতো সুন্দর। সারা দেশটাকেই এরা পর্যটকদের জন্য সাজিয়ে রেখেছেন। আমি দেখি আর দেখি।

দেখতে দেখতে কেমন একটু আনমনা হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ বাবুজীর কথায় বাস্তবে ফিরে আসি। বাবুজী বলেন—পেছনে তাকিয়ে দেখো, পিলাটাসকে কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি পেছন ফিরি। তিনি ঠিকই বলেছেন, লুসার্ণের দক্ষিণ-পশ্চিমে সবচেয়ে উঁচু পাহাড়, যেন লুসার্ণের মুকুট। পাহাড়টার ওপরে একটি গোলাকার ঘর রয়েছে দেখছি। শুনেছি ঐ পাহাড়কে 'Cradle of mountain Climbing' বলা হয়। কারণ এই পাহাড় থেকেই সুইজারল্যান্ডে পর্বতারোহণ আরম্ভ হয়েছে। কিছুকাল আগেও পর্যটকরা অনেকেই পায়ে হেঁটে পিলাটাস শিখরে উঠতেন। হাঁটা পথটি এখনও আছে, তবে আজকাল বড় কেউ একটা এখানে পর্বতারোহণ করেন না। কারণ এইসব পাহাড়ে পর্বতারোহণ এখন ছেলেমানুষী বলে বিবেচিত।

বাবুজী বলেন—লুসার্ণ থেকে পিলাটাস যাওয়া-আসা এক রোমাঞ্চকর ভ্রমণ। যাতায়াতের পথে চারিদিকের 'প্যানোরামা' বা বিস্তৃত দৃশ্য অবিস্মরণীয়। লুসার্ণ ১৪৪০ ফুট বা ৪৩৬ মিটার উঁচু আর পিলাটাস শিখর ৭০০০ ফুট মানে ২১৩২ মিটার।

পিলাটাসকে বলা হয় 'রক্ পিরামিড'। পিলাটাস যেমন লুসার্ণকে সৌন্দর্য দান করেছে, তেমনি পিলাটাস শিখর থেকে লুসার্ণ ও তার হ্রদের দৃশ্য অপরূপ।

আমি মাথা নাড়ি। তারপরে জিজ্ঞেস করি—আচ্ছা, পিলাটাস শিখরে ওঠার পথটা কোন্ দিক থেকে?

বাবুজী উত্তর দেন—একটি নয়, তিনটি পথ। তারপরে ইসারা করে বলেন—শিখরটি তো দেখতেই পাচ্ছ শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে।

আমি আবার মাথা নাড়ি। বাবুজী বলতে থাকেন—একটি সংক্ষিপ্ত হাঁটা পথ, একটি রেল ও মোটরপথ, আরেকটা 'কেব্‌ল্‌কার' বা রোপওয়ে। লুসার্ণ শহরের পশ্চিমপ্রান্তে ক্রিন্‌স (Kriens) নামে একটা জায়গা আছে। সেখানেই কেব্‌ল্‌কার স্টেশন। তুমি সেণ্ট্রাল রেলস্টেশন থেকে ক্রিন্‌স-এ যাবার বাস পাবে। মিনিট পনেরো সময় লাগবে। সেখানে গিয়ে তোমাকে চার-সিটের কেব্‌ল্‌কার-এ চড়তে হবে। প্রথমে কিছুক্ষণ উর্বর উপত্যকার ওপর দিয়ে ভেসে যাবে। তারপরে নিচে তাকিয়ে দেখবে পাহাড় আর সবুজ বন। একটু বাদে তুমি পেঁছবে ১০৩১ মিটার উঁচু ক্রিন্‌সেরেগ (Krienseregg)। তারপরে আরও খানিকটা উঠে ১৪১৫ মিটার উঁচু ফ্রাক্‌মুনটেগ (Frakmuntegg)। সেখানে তোমাকে কেব্‌ল্‌কার পালটাতে হবে। তুমি 'ফোর-সিটার' ছেড়ে বড় গাড়িতে উঠবে। অন্তত দশ-বারোজন যাত্রীর সঙ্গে তোমাকে সে গাড়িতে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কাচের ভেতর দিয়ে দেখতে পাবে গাড়িটা তোমাদের বরফে ঢাকা পাহাড়ের ওপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। যন্ত্রবিজ্ঞানে এঁদের দুঃসাহসিক সাফল্য বা 'daring feat of Engineering' দেখে তুমি চমৎকৃত হবে।

রেলে চেপে ২১৩২ মিটার অর্থাৎ ৭000 ফুট উঁচু পিলাটাস শিখরে উঠতে চাইলে লুসার্ণ সেণ্ট্রাল স্টেশনেই গাড়ি পেয়ে যাবে। তুমি সেই অভিনব রেলগাড়িতে চড়ে বসবে। চার বগির ট্রেন, ছোট লাইন, ছোট গাড়ি, আকারে আমাদের শিলিগুড়ি-দার্জিলিং রেলপথের গাড়ির মতো। কিন্তু ভারী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং বেশ জোরে চলে। ঝকঝকে নতুন গাড়ি, ইলেকট্রিক ট্রেন। কিছুক্ষণ পরে তুমি সেই গাড়ি দেখতে পাবে। ঐ একই রকম ট্রেনে চড়ে আমরা রিগি-কুলমে উঠব এবং নেমে যাবো।

যাক গে, যেকথা বলছিলাম। পিলাটাসের গাড়িটা প্রায় সমতল পথে তোমাকে নিয়ে লুসার্ণ শহর ছাড়িয়ে দক্ষিণগামী হবে। লুসার্ণ হ্রদের তীর দিয়ে পথ চলে হের্‌গিসভিল (Hergiswil) নামে একটা জায়গায় পেঁছে সুড়ঙ্গের ভেতরে ঢুকবে। বেশ কয়েক মিনিট ধরে সুড়ঙ্গপথ পেরিয়ে একটা পাথুরে পাহাড়ের অপর পাশে পেঁছবে। দেখবে তুমি আবার লুসার্ণ হ্রদের তীরে। তারপরে খানিকটা পথ হ্রদের তীরে তীরে চলে তুমি পেঁছবে এ্যাল-প্যানাস্টাড (Alpanachstad) স্টেশনে, অর্থাৎ পিলাটাস পাহাড়ের পাদদেশে। সেখান থেকে তোমার গাড়ি পাহাড়ে উঠতে শুরু করবে। চড়াই পথ, একেবারে

খাড়া চড়াই—কোথাও কোথাও আটচল্লিশ ডিগ্রি খাড়া। এটা পৃথিবীর সবচেয়ে খাড়া রেলপথ, Steepest Cog-wheel Railway

পিলাটাস শিখরে উঠে তুমি লুসার্ণ শহর ও হ্রদ এবং চারিদিকের যে অপরূপ দৃশ্য দেখবে, তার তুলনা মেলা ভার। স্বয়ং মহারাণী ভিক্টোরিয়া পর্যন্ত এই লোভ সামলাতে পারেন নি। সম্ভবতঃ ১৮৬৮ সালে তিনি ঘোড়ায় চড়ে পিলাটাস শিখরে আরোহণ করেছিলেন। তার প্রায় এক যুগ আগেই পর্যটকদের জন্য শিখরে সরাইখানা স্থাপিত হয়েছিল।

শিখর থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্য অবিস্মরণীয়। সেখানে আছে একটি চারতলা আধুনিক হোটেল, গোলাকার রেস্তোরাঁ ও প্রচুর বেড়াবার জায়গা। ওখান থেকে তুমি যেমন সুইজারল্যাণ্ডের সবুজ সমতল ও তুষারমৌলি আল্‌পস দেখতে পাবে, তেমনি দেখতে পাবে জার্মাণীর ব্ল্যাক-ফরেস্ট অর্থাৎ ব্যাভেরিয়া অঞ্চল।

ইতিমধ্যে আমাদের স্টীমার অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছে। লুসার্ণ শহর আর স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে না। হ্রদের দু'পাশের পাহাড়ে পাহাড়ে বাড়িঘর কমে এসেছে। কাছের পাহাড়গুলি এখন বনময় আর দূরের পাহাড়গুলি বরফে ঢাকা। শান্ত সুনীল জলরাশির বুক চিরে স্টীমার চলেছে এগিয়ে। ভাবতে ভাল লাগছে সুইজারল্যাণ্ডের সবচেয়ে সুন্দর হ্রদে জলবিহার করছি আমি। আর বাবুজী বসে রয়েছেন আমার পাশে।

বলা বাহুল্য আমাদের সহযাত্রীরা অধিকাংশই শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গিনী। কেবল কয়েকজন জাপানী রয়েছেন। তাঁদের গায়ের রং সাদা না হলেও কালো নয়। অতএব কালা আদমী বলতে আমরা দুজন। অবশ্য ভারতীয় হিসেবে বাবুজী বেশ ফর্সা। কিন্তু এখানে তাঁকেও কালোর দলে নাম লেখাতে হবে।

যাক্ গে, যে কথা ভাবছিলাম, আমার শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গিনী সহযাত্রীদের কথা। তাঁদের অধিকাংশই আমেরিকান। সুতরাং ইংরেজী শব্দ খুবই কানে আসছে। তাহলেও তাঁদের দিকে তাকাতে পারছি না। কারণ তাঁদের, বিশেষ করে মেয়েদের পোশাক এতই সংক্ষিপ্ত যে তাদের দিকে তাকালে চোখে রীতিমত ঝাঁকুনি বোধ করতে হয়। তাছাড়া তাঁরা প্রায় সকলেই জোড়ায় জোড়ায় স্টীমারে উঠেছেন। এবং কয়েকজোড়া যুবক-যুবতী মাঝে মাঝেই এমন প্রলম্বিত-চুম্বনে আবদ্ধ হচ্ছেন যে বাবুজীর পাশে বসে তাঁদের দিকে তাকানো সম্ভব নয়। সুতরাং আমি দু'পাশের পাহাড় দেখে সময় কাটাচ্ছি।

ওঁদের দিকে না তাকালেও ওঁদের কথাই ভাবতে হচ্ছে আমাকে। নর ও নারীর আকর্ষণ সহজাত। শিক্ষা অবস্থা ধর্ম কোন কিছুরই মুখাপেক্ষী নয় এই আকর্ষণ। এ ব্যাপারে নাইরোবি কিম্বা নিউইয়র্ক অথবা কলকাতা কিম্বা কোপেনহ্যাগেনের কোন পার্থক্য নেই। দুটি যুবক আর যুবতী একে অপরকে আদর করবে, এতে মনে করার কি আছে? কিন্তু তার একটা স্থান ও কাল থাকা

উচিত। এই ভরদুপুরে শত শত সহযাত্রীর মাঝে স্টীমারের ডেকে বসে দুজনে অনির্দিষ্ট কাল ধরে বার বার প্রলম্বিত চুম্বনে লিপ্ত হবে, এ কেমন কথা ?

এতে আমার কোন ক্ষতি হচ্ছে, একথা বলছি না। তবে দেখতে খারাপ লাগছে। কারণ আমরা মানুষ, জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী। তাই অন্যান্য প্রাণীরা যা করতে পারে, আমরা তা পারি না। তাছাড়া আমি আজ তাঁদের দেশে এসেছি, যাঁদের কাছ থেকে আমরা আধুনিক শিক্ষার পাঠ নিয়েছি। অথচ পথে বের হলেই আমাকে এই প্রাগৈতিহাসিক ব্যাপারগুলো দেখতে হচ্ছে।

বেলা দশটা চল্লিশ মিনিট নাগাদ আমাদের স্টীমার বিজনাউ ঘাটে নোঙর করল। অর্থাৎ সুইজারল্যাণ্ডের সবচেয়ে সুন্দর হ্রদের বুকে প্রায় ঘণ্টাখানেক জলবিহার করা গেল। লুসার্ণ থেকে রওনা হয়ে আমরা প্রায় সোজাসুজি উত্তরে এসেছি। এসেছি হ্রদের পশ্চিম তীর ধরে। আসার পথে স্টীমার কোথাও থামে নি। কিন্তু পথে আরেকটা ঘাট ছিল। নাম ওয়েগিস্ (weggis)। সেখান থেকেও রিগি যাবার পথ রয়েছে। রেলপথ নয়, রোপওয়ে। কেব্‌ল্‌কার অবশ্য একেবারে শিখর পর্যন্ত যায় না, একটু আগে কিটবাড (kiltbad) নামে একটা জায়গায় পৌঁছয়। সেখান থেকে প্রায় সমতল পথে হেঁটে যাওয়া যায় রিগি-কুলম।

আমরা স্টীমার ও রেলে চড়ে রিগি চলেছি। ইচ্ছে করলে কিন্তু লুসার্ণ থেকে একেবারে পায়ে হেঁটেও রিগিকুলমে আরোহণ করা যায়। ঘণ্টাতিনেক চড়াই ভাঙতে হয়। রিগিকুলমের উচ্চতা ৫৯০০ ফুট।

নেমে আসি স্টীমার থেকে। ঘাট পেরিয়েই রেল-প্ল্যাটফর্ম—মাউণ্টেন ট্রেন। গতকাল জুগেরবার্গ যে গাড়িতে গিয়েছি, সে গাড়ি নয়, তখন স্টীমারে বাবুজী যে রেলগাড়ির কথা বলেছেন, সেই গাড়ি। নীলরঙের ট্রেন, দুটি বগি নিয়ে গাড়ি। দুটোই সেকেণ্ড ক্লাস। এখানকার বড় ট্রেনের মতই কাচের দরজা-জানলা। ইলেকট্রিকে চলে কিন্তু ওপরে তার নেই। বাবুজী তখন ঠিকই বলেছেন, অভিনব রেলগাড়ি। আকারে শিলিগুড়ি-দার্জিলিং রেলগাড়ির মতো হলেও তেমন হতশ্রী চেহারা নয়।

কেনই বা হবে ? এঁরা যে ব্যবসা করতে বসেছেন। লাভের ব্যবসা। পর্যটকদের আকর্ষণ করবার জন্য এঁদের গাড়ি চালাতে হচ্ছে। আমরা দার্জিলিং-এর পথে লাভ করার চেষ্টা করছি না, লোকসানকেই ভবিতব্য বলে মেনে নিয়েছি। অথচ শিলিগুড়ি-দার্জিলিঙ রেলপথের মতো বিচিত্র ও সুন্দর রেলপথ পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। আমার বিশ্বাস ঐ রেলপথটির উন্নতি বিধান করে এই রকম গাড়ি চালাতে পারলে, সেই রেলের আকর্ষণেই লক্ষ লক্ষ বিদেশী পর্যটক দার্জিলিঙ ছুটে যাবেন। কিন্তু তেমন দিন কি সত্যই আসবে ?

যাক্ গে দেশের কথা। বিদেশে বেড়াতে এসে বার বার দেশের দুরবস্থার

কথা ভেবে দুঃখ পাওয়া ঠিক নয়। কিন্তু কি করব? মন যে কিছুতেই মানতে চায় না। কেবলি প্রশ্নটা মনে আসে—সব থেকেও আমাদের কিছুই নেই কেন? এঁরা যদি পারেন, তাহলে আমরা পারব না কেন?

বেলা দশটা পঞ্চাশে ট্রেন ছাড়ল। স্টীমার ঘাটের পাশেই রেল প্ল্যাটফর্ম। স্টীমার থেকে নেমে গাড়িতে ওঠার জন্য দশ মিনিট সময় যথেষ্ট। তাছাড়া গাড়িতে বসার জায়গা পাবার জন্য কেউ চেঁচামেচি ও ধাক্কাধাক্কি করে নি। একের পেছনে অপরে এসে গাড়িতে উঠেছেন। সুতরাং সময় বেশি লাগে নি। এবং বলা বাহুল্য আমরা সবাই বসার জায়গা পেয়েছি।

কয়েক মিনিট বাদেই গাড়ি পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করল। দার্জিলিঙের মতো আঁকাবাঁকা ছন্দময় পথ নয়, আমরা প্রায় সোজাপথে পাহাড়ে উঠছি। মাঝে মাঝে টানেল পার হচ্ছি। সোজাপথে গাড়ি নিয়ে যাবার জন্য মাঝে মাঝেই খাদের ওপর পুল বানিয়ে তার ওপর দিয়ে রেললাইন নিয়ে গিয়েছে। পথ সংক্ষেপ করার জন্য জীবনপণ করে কি প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছে। এ রেলপথটিও আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার একটি সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

—এই রেলপথের নাম Rack-and-pinion Railway……

বাবুজীর কথা কানে আসে। তাড়াতাড়ি তাঁর দিকে তাকাই। তিনি বলেন —রিগিকুলমে এরকম দুটি রেলপথ আছে। একটি এই লুসার্ণ হ্রদের উত্তর তীরে ছোট জনপদ বিজনাউ থেকে, আরেকটি জুগ হ্রদের দক্ষিণ তীর আরথ্-গোলডাও অর্থাৎ এই পাহাড়টার উল্টোদিক থেকে।

আমি মাথা নাড়ি। বাবুজী বলতে থাকেন—উনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে একটা প্রবল প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে এই লাইন দুটি তৈরি হয়েছে।

—প্রতিযোগিতা?

—হ্যাঁ, দুটি কম্প্যানির মধ্যে প্রতিযোগিতা। কোন্ কম্প্যাণি আগে রেললাইন তৈরি করে পর্যটন ব্যবসার সিংহভাগ অধিকার করবে!

—তা কারা প্রথম হলেন?

—এই বিজ্নাউ লাইন। এটিই আগে তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু পরবর্তী কালে দেখা গেল আরথ্‌গোলডাও থেকেই যাত্রীদের ভিড় বেশি হচ্ছে, কারণ আরথ্‌গোলডাও সেন্ট গোটহার্ড (St Gotthard) রেলপথের মেন-লাইনে অবস্থিত।

—তাহলে এ রেলপথের শতবার্ষিকী উৎসব হয়ে গিয়েছে?

—নিশ্চয়ই।

ভাবতে অবাক লাগছে শতাধিক বছর আগে যখন প্রযুক্তিবিদ্যা তার কৈশোর-কাল অতিক্রম করে নি, তখন এই রেল-লাইন তৈরি হয়েছে। এবং শতবর্ষ পরেও সেই রেললাইনের কিছুমাত্র বার্ধক্য আসে নি।

সত্যই সুন্দর, শুধু রেল কিম্বা রেলপথ নয়, সুন্দর এই পাহাড়টি। ছোট

পাহাড় কিন্তু ভারী নরম আর মিষ্টি। রেলপথের পাশে পাশে সবুজ উপত্যকা, রঙীন ফুল আর বড় বড় গাছ। গাছের সারি সবচেয়ে ভাল লাগছে আমার।

আরেকটা দৃশ্য দেখেও ভারী মজা লাগছে। উপত্যকায় গরু চরছে। প্যাণ্ট-কোট-টাই পরে ছেলেমেয়েরা গরু চরাচ্ছে। তাদের কেউ কেউ আবার পিয়ানো-একর্ডিয়ান বাজাচ্ছে। আমাদের রাখাল ও তার বাঁশের বাঁশির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

গাড়ি অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে। সবুজ কমে নি, তবে এখন মাঝে মাঝে পাথরের ভাঁজে এখানে-ওখানে বরফ দেখতে পাচ্ছি। গ্রীষ্মকালেও বরফ, হ্যাঁ, সেই মুক্তোর মতো শুভ্র শীতল বরফ। রক্তের মতো বরফেরও কোন জাত নেই, ধর্ম নেই, দেশ নেই। গায়ের রং যাই হোক্ না কেন, সব মানুষের রক্ত যেমন সমান লাল, তেমনি হিমালয় অথবা আলপ্স যেখানেই হোক, সব বরফ সমান সাদা। এবং হিমালয়ে গিয়ে বরফ দেখে আমি যেমন আনন্দ পাই, এখানে এসে বরফ দেখতে পেয়ে সেই একই আনন্দ লাভ করছি।

একটা স্টেশনে গাড়ি থামল। সে কি! রিগি এসে গেল নাকি? ঐ যে লেখা রয়েছে—R I G I

তাহলে তো নামতে হয়। উঠে দাঁড়াই।

একটু হেসে বাবুজী বলেন—এটা রিগি, শুধুই রিগি, আমরা নামব রিগি-কুলম বা রিগি-শিখর স্টেশনে। সেখানে পেঁছিতে আরও কয়েক মিনিট লাগবে। ব'সো।

রেলে চড়ে শিখরারোহণ করছি। এবং সে শিখর যে আর দূরে নয়, তাও বেশ বুঝতে পারছি। কারণ বরফ বেড়েছে। আগে ছিল এখানে-ওখানে অল্প-স্বল্প, এখন রেলপথের দু'পাশে, প্রায় সর্বত্র। তবে গাছপালা কমে নি, 'ফার' বা দেবদারু জাতীয় গাছই বেশি। এঁরা বলেন, Spruce forest—হ্যাঁ, ফরেস্টই বটে।

শুধু এখানে নয়, গাছের সারি বহুদূর বিস্তৃত, প্রায় ঐ তুষারধবল পর্বত-শ্রেণী তথা সেণ্ট্রাল আল্পস পর্যন্ত প্রসারিত।

বেলা সাড়ে এগারোটার সময় আমাদের গাড়ি রিগিকুলম স্টেশনে এসে থামল। নেমে আসি প্ল্যাটফর্মে। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে আমার গায়ে আছাড় খেয়ে পড়ে। এখানে দেখছি বেশ ঠাণ্ডা। গাড়িতে বসে বুঝতে পারি না। এদেশে যে গাড়ি ও বাড়ি দুই-ই গরম করে রাখা হয়।

ভাবতে অবাক লাগে। উচ্চতা তো মোটে ৫৯০০ ফুট, তার ওপরে মে মাসের শেষ। অথচ এখানে নিয়মিত বরফ পড়ছে। আর তাই এমন হিমেল হাওয়া। হিমালয়ে এ উচ্চতায় এখন গরম পড়ে গেছে।

শিখর বলতে আমরা যেমনটি বুঝি, রিগি মোটেই তেমন নয়, বরং একে মালভূমি বলা যেতে পারে। প্রায় সমতল সবুজ ও সুপ্রশস্ত প্রান্তর। কোথাও

ঢালু হয়ে গিয়েছে, কোথাও বা ওপরে উঠে গেছে। তারই ওপরে পথ ময়দান বাড়িঘর আর গাছপালা। সবুজ ময়দান, দোতলা বাড়ি আর বড় বড় গাছ। ময়দানের মাঝে একটা পতাকাদণ্ড, তাতে সুইস জাতীয় পতাকা হাওয়ায় উড়ছে। আর বহু মানুষ ময়দানে শুয়ে-বসে আছেন, কিম্বা পায়চারি করছেন।

সবুজের শোভা সবচেয়ে ভাল লাগছে আমার। কারণ সবুজ সঙ্গীহীন নয়, তার সঙ্গে সাদা রয়েছে। এখানে-ওখানে প্রচুর বরফ পড়ে আছে।

রেল প্ল্যাটফর্মের পাশে একটা প্রকাণ্ড চারতলা বাড়ি—হোটেল কুলম, ওপরে তেমনি টালির চাল। ছাদ করার উপায় নেই। এখানে বারো মাস বরফ পড়ে।

বড় বাড়িটার একটা দরজার সামনে সহযাত্রীরা লাইন দিয়েছেন। আমরাও এসে লাইনে দাঁড়াই। একটু বাদে লিফ্ট এসে দাঁড়ায়। প্রকাণ্ড লিফ্ট। আমাদের জায়গা হয়ে যায়।

লিফ্ট থেকে বেরিয়ে দেখি একটা রেস্তোরাঁ-কাম-ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্সে উপস্থিত হয়েছি। বসবার জন্য প্রচুর চেয়ার-টেব্‌ল ও সোফা। একেবারে আধুনিক ডিজাইনের গৃহসজ্জা। কাঠের মেঝে, কাঠের সিলিং। প্রতি টেবিলে রঙ্গীন ফুল। প্রচুর ফুল ও পাতার টব রয়েছে চারিদিকে। কাচের জানলায় রঙ্গীন ছবি। বাইরে ঠাণ্ডা হলেও এখানে ঠাণ্ডা নেই। থাকবে কেমন করে, গোটা বাড়িটাই যে 'সেণ্ট্রালী হিটেড্'।

আমরা এসে একখানি সোফায় বসি। বসে বসে আবার চারিদিকে দেখি। বাড়িটার গোটা একতলা জুড়ে এই রেস্তোরাঁ-কাম-ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরস। রেস্তোঁরার কাউণ্টারে লম্বা লাইন পড়েছে। নিজেদের গিয়ে খাবার নিয়ে আসতে হয়। কাপ-প্লেট কিম্বা চামচ ধোবার হাঙ্গামা নেই। কারণ প্ল্যাস্টিকের প্যাকেটে খাবার আর প্ল্যাস্টিকের কাপে কিম্বা গ্লাসে পানীয় নিয়ে আসছেন সবাই। খাবার পরে নিজেরাই খাবারের প্যাকিং ও বাসনপত্র টেবিলের নিচে রাখা 'বিন্'-এ ফেলে দিচ্ছেন।

রেস্তোরাঁ ছাড়া রয়েছে কয়েকটি দোকান। একটা জুয়েলারী ও কয়েকটা স্টেশনারী শপ। গয়না থেকে গরম পোশাক, ঘড়ি থেকে ফিল্ম অনেক কিছুই পাওয়া যাচ্ছে। পাওয়া যাচ্ছে ডাকটিকেট, পিক্চার পোস্টকার্ড, চকোলেট ও সিগারেট। তবে এগুলো কেনার জন্য কোন দোকানে যেতে হচ্ছে না। দেওয়ালের সঙ্গে ঝোলানো রয়েছে কয়েকটা চৌকো বাক্স। বাক্সগুলো স্টীলের হলেও সামনের দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে কাচ। কাচের ভেতরে দেখা যাচ্ছে নানা জিনিস—বিভিন্ন ব্র্যাণ্ডের সিগারেট ও চকোলেট ইত্যাদি। বাক্সগুলোর ওপরে পয়সা দেবার ফুটো আর নিচে মাল বেরিয়ে আসবার মুখ। বাক্সের গায়ে জিনিসের দাম লেখা একখানি কাগজ ও কয়েকটা 'পুশ বটন'। কোন জিনিসের দাম ফেলে সেই পুশ বট্‌ন-টা টিপলেই নির্দিষ্ট জিনিসটি বেরিয়ে আসছে। দরাদরি নেই, সেল্সম্যান নেই—ক্যাশমেমো নেই, অথচ কেনা-বেচা হয়ে যাচ্ছে। ব্যবস্থাটি যে কেবল

এখানেই রয়েছে তা নয়, য়ুরোপের সর্বত্র শুনেছি এরকম বাক্সের দোকান রয়েছে।

বাবুজী জিজ্ঞেস করেন—কিছু খাবে ?

—না। একটু আগে তো স্টীমারে বসে পেস্ট্রী আর ফ্রুট জুস খেলাম।

—তাহলে দুটো কফি নিয়ে এসো।

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে আবার চারিদিকে তাকাই। সত্যি পর্যটন ব্যবসার উন্নতি বিধানের জন্য কি আশ্চর্য সুন্দর ব্যবস্থা এঁরা গড়ে তুলেছেন! যেমন পরিবহণ, তেমনি দর্শনীয় স্থানগুলির উন্নয়ন। নেই দালাল কিম্বা হকারদের অত্যাচার। কারও কোথাও বিভ্রান্ত হয়ে ঠকবার কোন সম্ভাবনা নেই। অথচ পকেটে ডলার থাকলে খরচ না করে উপায় নেই।

বাবুজী বলেন—এখানে পিকচার পোস্টকার্ড ডাকটিকেট সবই পাওয়া যাচ্ছে। ছেলেকে একটা চিঠি লিখে দিও। এখান থেকে চিঠি ডাকে দেবার একটা আলাদা মূল্য আছে।

—নিশ্চয়ই। আমি মাথা নেড়ে বলি—কিন্তু আগে চলুন, দেখে আসা যাক। তারপরে চিঠি লেখা যাবে।

বাবুজী উঠে দাঁড়ান, আমিও চেয়ার ছাড়ি। বাবুজী পকেট থেকে কালো চশমা বের করে চোখে পরেন। আমাকে বলেন—তুমি চশমার 'এটাচি' আনো নি ?

—না তো! লাগবে নাকি ?

—লাগবে না! চারিদিকে বরফ পড়ে আছে। এখানে শুধু চশমা পরে ঘোরাঘুরি করা ঠিক নয়।

একবার থামেন বাবুজী। তারপরে আবার বলেন—এখানে বোধ হয় 'এ্যাটাচি' অথবা কালো চশমা পাওয়া যাবে। পেলে একটা কিনে নিয়ে এসো।

য়ুরোপে কিন্তু কেনাকাটা করাটা কোনমতেই সহজ কাজ নয়। কারণ এখানে সেল্‌সম্যান থাকে না। জিনিসপত্র সাজানো রয়েছে। প্রয়োজনীয় জিনিসটি নিয়ে ক্যাশ কাউন্টারে দাম দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে আসুন। জানা না থাকলে ঠিক জিনিসটি খুঁজে পাওয়া রীতিমত কঠিন কাজ। কারণ ক্যাশিয়ার এত ব্যস্ত যে তাঁর আপনার কথায় কান দেবার সময় নেই এবং দোকানে অন্য কোন কর্মচারীর দেখা পাওয়া ভাগ্যের কথা।

আমার ভাগ্য অপ্রসন্ন। অতএব চশমা কিম্বা এ্যাটাচি না পেয়ে ফিরে এলাম বাবুজীর কাছে। বাবুজী বললেন—তাই তো, মুশকিলে পড়া গেল।

তিনি একটুকাল চুপ করে কি যেন ভাবলেন। তারপরে বললেন—তুমি এক কাজ করো, আমার চশমাটা নাও।

—সে কি! আপনি খালি চোখে যাবেন ?

—না। আমি তো আজকাল প্রায় প্রতি বছরই সুইজারল্যাণ্ডে আসছি। রিগিতেও বার দুয়েক এসেছি। তাই আমি আর কি দেখব ? আমি বরং এখানে বসছি, তুমি আমার চশমা পরে ভাল করে দেখে এসো সব।

প্রতিবাদ করে কোন লাভ নেই। কারণ কিছুতেই তিনি আমাকে শুধু চশমা পরে বরফে যেতে দেবেন না। তাই কালো চশমাটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে বলি—বেশ, আমি বেরিয়ে আসছি। ফিরে এসে দুজনে বাইরে বেরিয়ে ছবি নেব।

বাবুজী সম্মত হন। তিনি বসে থাকেন, আমি বেরিয়ে আসি রেস্তোরাঁ থেকে। না, শুধু রেস্তোরাঁ নয়, আগেই বলেছি, এটা আসলে একটা হোটেল, স্টার হোটেল। কেবল এই একটা তলায় রেস্তোরাঁ-কাম-ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরস। হোটেলে টেনিস লন এবং সুইমিং পুল পর্যন্ত রয়েছে। অবস্থাপন্ন পর্যটকরা অনেকেই এখানে এসে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যান। আর শীতকালে যাঁরা 'স্কি' করতে আসেন, তাদের তো থাকতেই হয়। কারণ রিগির সংক্ষিপ্ত পরিচয় হল—'The world-famous island in the sun in the heart of Switzerland.'

রেস্তোরাঁর বাইরে এসেই কথাটার সত্যতা বুঝতে পারি। মাত্র আধঘণ্টা আগে যখন গাড়ি থেকে নেমেছি, তখন আকাশ ছিল মেঘলা, কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল। বাতাস এখনও বইছে, তবে তাতে হিমেল হাওয়ার হুল নেই। কারণ ইতিমধ্যে আকাশ মেঘমুক্ত হয়েছে। রিগি এখন সত্যই সোনালী রোদের দ্বীপ।

হোটেলের পাশে অনেকটা জায়গা জুড়ে বরফ। তারপরে তুষারমুক্ত সবুজ ময়দান। আস্তে আস্তে ঢালু হয়ে খানিকটা দূরে খাদের গায়ে গিয়ে শেষ হয়েছে। সেখানে কাঠের খুঁটি আর তারকাঁটার বেড়া।

ময়দানের মাঝখান দিয়ে একটা বাঁধানো পথ। কিন্তু আমি সে পথে না গিয়ে ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করি।

এখানে ওখানে যেমন তুষার পড়ে আছে, তেমনি ফুটে আছে নানা রঙের ফুল। দুই-ই তাকিয়ে দেখবার মতো। আমি দেখি আর দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি।

বহু পর্যটক ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কেউ ছুটোছুটি করছেন, কেউ বসে আছেন, কেউবা শুয়ে রয়েছেন। আমি হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলি।

আগেই বলেছি, ময়দানের মাঝখানে একটা পতাকাদণ্ডে সুইস জাতীয় পতাকা উড়ছে। পতাকার মাঝখানে রেডক্রসের অনুরূপ একটি ক্রস। শুধু সুইসবাসীদের প্রতীক নয়, নিরপেক্ষতার অঙ্গীকার। সুইজারল্যাণ্ড নিরপেক্ষ দেশ। পররাজ্য লোভ, শোষণের স্পৃহা ও ইজমের প্রভাবমুক্ত দেশ সুইজারল্যাণ্ড। চিরশান্তির দেশ সুইজারল্যাণ্ড।

হোটেলের পাশে যেখানে অনেকখানি জুড়ে নরম তুষারের আস্তরণ, সেখানে কয়েকটি কিশোর-কিশোরী গড়াগড়ি দিচ্ছে। ছোট দুটি-ছেলেমেয়ে বরফের বল বানিয়ে দুজনে দুজনের গায়ে ছুঁড়ে মারছে আর হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। ওদের হাসির শব্দ নিস্তব্ধ প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

বাবুজী গতকাল জুগেরবার্গ বসে ঠিকই বলেছিলেন। আমি আজ মাউণ্টেন ট্রেনে চড়েছি আর আল্পস পর্বতমালার অন্তরলোকে উপস্থিত হয়েছি।

হাঁটতে হাঁটতে সেই বেড়ার ধারে এসে পোঁছুই। বেড়া দেবার কারণটা আরও স্পষ্ট করে বুঝতে পারি। বেড়ার পরে প্রান্তরটা সহসা খুব নিচু হয়ে খাদের সঙ্গে মিশেছে। খাদের পরে একটা নিচু পাহাড়, তারপরে হ্রদ—নীল জল। হ্রদের ওপারে আবার আল্‌পস—তুষারমৌলি আল্‌পস। রোদে ঝিলিমিলি করছে। আমি অপলক নয়নে সোনালী আল্‌পসের দিকে তাকিয়ে থাকি। শুনেছি এখান থেকে মধ্য-আল্‌পসের প্রায় সব কটি তুষারাবৃত শৃঙ্গ দেখা যায়। দেখা যায় ইয়ুঙ্গফ্রাও (Jungfrau) মানে যুবতী নারী। কোন্‌টি কে জানে?

ইয়ুঙ্গফ্রাও নয়, আমি ভাবছি আল্‌পসের কথা, যে আল্‌পস থেকে একদা পর্বতারোহণ শুরু হয়েছিল, আমি আজ সেই আল্‌পস পর্বতমালায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। ঘটনাটি মনে পড়ছে আমার। সে প্রায় 'পাঁচশ' বছর আগের কথা। ফরাসী সম্রাট সপ্তম চার্লস-এর মনে প্রথম পর্বতারোহণের ধারণাটি জন্মলাভ করে। এবং তাঁরই উৎসাহে আন্‌তোনিন দ্য ভিল (Antonine de Ville) নামে রাজসভার একজন বিশিষ্ট অমাত্য মাউণ্ট এগিয়ুঈ (Aiguille) শিখরে আরোহণ করেন।

তারপরে প্রায় পৌনে তিনশ' বছর আর কেউ পর্বতারোহণ নিয়ে মাথা ঘামান নি। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে জেনিভার জনৈক সুইস ধনী ১৫,৭৮১ ফুট উঁচু আলপ্‌স পর্বতমালার মঁ ব্লাঁ (Mount Blanc) (সাদা পাহাড়) আরোহণের জন্য একটি পুরস্কার ঘোষণা করেন। ছাব্বিশ বছর বাদে ১৭৮৬ সালে জাক বালমা (Jaue Balmat) নামে জনৈক ফরাসী পর্বতারোহী দুর্গম মঁ ব্লাঁ শিখরে আরোহণ করে পুরস্কারটি লাভ করেন। আর তার পর থেকেই আলপ্‌সকে অবলম্বন করে পর্বতারোহণ আরম্ভ হয়ে যায়। বিশ্ব পর্বতারোহণের সেই সূতিকাগার আলপ্‌স পর্বতমালার অপরূপ রূপ দর্শন করছি আমি।

আবার দূর থেকে কাছে দৃষ্টি ফেরাই। নানা দেশের নানা বয়সের শত শত পর্যটক। কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কেউ বসে রয়েছেন, কেউবা শুয়ে পড়েছেন। কয়েক জোড়া যুবক-যুবতীর ঘনিষ্ঠতা আমাদের চোখে আপত্তিকর হলেও তারাই সব নয়। মা মেয়েকে কোলে নিয়ে খাওয়াচ্ছেন, বাপ ছেলের সঙ্গে ছুটোছুটি করে খেলা করছেন, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পাশাপাশি বসে হয়তো বা স্মৃতি রোমন্থন করছেন।

তাই হবে। কারণ অনন্ত প্রকৃতি যে সর্বদা মানুষকে বিস্মৃতপ্রায় অতীতকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তাকে আত্মজিজ্ঞাসু করে তোলে। মানুষ তখন বর্তমানকে দূরে সরিয়ে রেখে নিজের জীবনের হিসেব কবতে লেগে যায়। জীবনে কি পেলাম আর কি হারালাম, তার 'ব্যালান্স শীট' তৈরি করতে চায়। প্রকৃতি তখন মানুষের কানে কানে বলে—তুমি যা হারিয়েছো, তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি পেয়েছো। অতএব্ তুমি আনন্দিত হয়ে ওঠো।

এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাও বোধ করি প্রকৃতির সেই পরামর্শ মেনে নিয়েছেন। ও'রা বুঝতে পেরেছেন—

'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে ॥
তবু প্রাণ নিত্যধারা, হাসে সূর্য চন্দ্র তারা,
বসন্ত নিকুঞ্জেও আসে বিচিত্র রাগে ॥
তরঙ্গ মিলায়ে যায় তরঙ্গ উঠে,
কুসুম ঝরিয়া পড়ে কুসুম ফুটে।
নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্যলেশ—
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে ॥'

তাই ও'রা এমন হাসিখুশি, এমন আনন্দময়।

আমারও যে তাই হওয়া উচিত। বরিশাল শহরের কালীবাড়ি রোড থেকে জীবনের যাত্রা শুরু করে আমি আজ সুইজারল্যাণ্ডের রিগিতে পৌঁচেছি। অথচ ভারতবিভাগে যারা প্রত্যক্ষভাবে বলিপ্রদত্ত আমি তাদেরই একজন। উনিশ বছর বয়সে এক কাপড়ে কলকাতায় পালিয়ে এসে ডুক-সরকারের চাকরি আর প্রাইভেট ট্যুশনীর ভেলায় চড়ে জীবন-নদী পার হবার চেষ্টা শুরু করেছিলাম।

আর আজ? আজ যখন নিজের কথা ভাবতে বসি, তখন মনে হয় জীবনে কি না পেয়েছি আমি? পেয়েছি অসংখ্য মানুষের অকুণ্ঠ ভালোবাসা। দেখেছি আসমুদ্র-হিমাচল। বিশ্বের সুন্দরতম পর্বতশৃঙ্গ হিমালয়ের সিনিয়লচু দেখে আজ আলপ্‌স পর্বতমালায় এসেছি। আর কি চাই?

না, আর কিছুই চাই না আমার। তাই বার বার বাবা বিশ্বনাথের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে বলি—আমার প্রতি তোমার অসীম করুণা। তোমার আশীর্বাদে আমার আর কোন কামনা নেই। শুধু প্রার্থনা করি, আমি যেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তোমার এই অকৃপণ করুণার কথা সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করতে পারি।

—Are you Indian?

নারীকণ্ঠের প্রশ্নে ভাবনা থেমে যায়। তাড়াতাড়ি পেছন ফিরি। প্রশ্নকর্ত্রীকে দেখেই তাঁর প্রশ্নের কারণ বুঝতে পারি। তিনিও ভারতীয়া, তাঁর পরনে শাড়ী, গায়ে আলোয়ান। বয়স চারের ঘরে। দেখতে সুশ্রী। গায়ের রংটা কালো না হলেও ভারতীয় বুঝতে অসুবিধে হবার কোন কারণ নেই। তাঁর সঙ্গে জনৈক প্যাণ্ট-কোট-টাই পরা ভদ্রলোক। বলা বাহুল্য তাঁর বয়স ভদ্রমহিলার চেয়ে কিছু বেশি।

উত্তর দিতে দেরি হওয়ায় ও'রা বোধ করি একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছেন। দুজনেই অসহায় ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। তাড়াতাড়ি জবাব দিই —হ্যাঁ। আপনারাও নিশ্চয়ই ভারতীয়!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভারতীয় বৈকি। আমরাও ভারতীয়। ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বরে শুধু আনন্দের উচ্ছলতা নয়, সেই সঙ্গে আবিষ্কারের অহংকার।

একটু থেমে তিনি হিন্দীতে তাঁর স্বামীকে বলেন—দেখলে তো, আমি ঠিক ধরেছি।

পাছে আমার হিন্দী শুনে ও'রা হেসে ফেলেন, তাই ইংরেজীতেই নিজের পরিচয় দিই, ও'দের পরিচয় জিজ্ঞেস করি।

ভদ্রলোকের নাম কৌশিক ত্রিপাঠী। তিনি ইঞ্জিনীয়ার। নাইজিরিয়ায় একটা টেক্সলন কম্প্যানির টেক্‌নিক্যাল ম্যানেজার। লাগোস-এ থাকেন। বাৎসরিক ছুটি কাটাতে য়ুরোপে বেড়াতে এসেছেন। ফ্রাঙ্কফুর্ট, প্যারী, লণ্ডন বেড়িয়ে গতকাল জুরিখ এসেছেন। দিনচারেক থাকবেন। তারপরে লাগোস ফিরে যাবেন।

আমার পরিচয় পেয়ে খুশি হলেন ও'রা। মিঃ ত্রিপাঠী বললেন, তিনি বেশ কয়েকবার কলকাতায় গিয়েছেন। ও'রা দুজনেই ভারত সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করেন। অনেকদিন দেশে যেতে না পারার জন্য দুঃখপ্রকাশ করলেন।

এই হয়। দরিদ্র দেশ, অধঃপতিত দেশ। তবু তার জন্য প্রাণ কাঁদে। দেশের কোন বিকল্প নেই।

কথায় কথায় মিসেস বলেন—আপনি ভারতীয়, আপনার সঙ্গে আলাপ করা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু সেই কারণেই শুধু আলাপ করি নি। আমাদের একটা স্বার্থও আছে।

একটু অবাক হই। আমার কাছে এ'দের কি স্বার্থ থাকতে পারে? তাই শ্রীমতীর মুখের দিকে তাকাই।

তিনি একবার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলেন—আর বলবেন না, পরশু লণ্ডনের হিথ্‌রো এয়ারপোর্টে আমাদের ক্যামেরাটা চুরি গেছে। এমন সুন্দর জায়গায় এলাম, একটা ছবি থাকবে না। আপনি যদি আমাদের দুজনের একখানা ছবি তুলে দেন!

—নিশ্চয়ই। বলুন, কোথায় বসে তুলবেন? আমি কাঁধ থেকে ক্যামেরা হাতে নিই।

চারিদিকে একবার তাকিয়ে মিসেস বলেন—না, এখানে নয়। আমরা ঐ Sunrise Point-এ দাঁড়িয়ে ছবি তুলব।

তিনি খানিকটা দূরে উ'চু টিলাটা দেখিয়ে দেন। কয়েক ধাপ সি'ড়ি বেয়ে ওখানে উঠতে হয়।

একটু হেসে বলি—ওটা শুধু Sunrise Point নয়, Sunset Point-ও বটে। আপনারা বোধ হয় জানেন যে বিশ্ববিখ্যাত আমেরিকান সাহিত্যিক মার্ক টোয়াইন (Mark Twain) (১৮৩৫-১৯১০ খৃঃ) সূর্যোদয় দেখার জন্য এখানে এসেছিলেন। তখনও এখানে রেলপথ হয় নি। তাই তাকে পায়ে হে'টে

আসতে হয়েছিল। তিনি এখানে পৌঁছে এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে পরদিন সকালে তাঁর ঘুম ভাঙল না। ঘুম ভাঙল দুপুর গড়িয়ে বিকেলে, ঠিক সূর্যাস্তের আগে। তিনি সূর্যোদয় না দেখতে পেলেও সূর্যাস্ত দেখতে পেয়েছিলেন।

গল্প শুনে ওঁরা দুজনে হেসে উঠলেন। হাঁটতে হাঁটতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দর্শনের স্থানে এলাম। ছোট্ট টিলা, চারিদিকে রেলিং দিয়ে ঘেরা। ময়দান থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে আমরা উঠে এলাম ওপরে। এখান থেকে আরেক-সারি সিঁড়ি নেমে গিয়েছে নিচে, একেবারে ময়দানের সবচেয়ে নিচু অংশে, সেই বাঁধানো পথে।

দুখানি ছবি নিলাম ওঁদের। মিস্টার ত্রিপাঠী নিজের একখানি ভিসিটিং কার্ড আমাকে দিয়ে বললেন—ডেভেলপ করার পরে ছবি দুখানি যদি পাঠিয়ে দেন, বড়ই বাধিত হব।

সম্মতি জানিয়ে কার্ডখানি পকেটে রাখি।

মিসেস বলেন—আরেকটা কথা, আগামীকাল আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

—ভাবছি জুরিখ যাবো।

—খুব ভাল। নিশ্চয়ই বেড়াতে?

—তা তো বটেই।

—তাহলে সকাল ন'টায় সিটি ট্যুরিস্ট অফিসে চলে আসুন। একটা 'বাসট্রিপ' নিয়ে একসঙ্গে বেড়ানো যাবে।

—সকাল ন'টা! আমি একটু চিন্তায় পড়ে যাই।

মিসেস প্রশ্ন করেন—অসুবিধে হবে কি?

—আমি তো জুগ থেকে যাবো। আমাকে অন্তত ঘণ্টাখানেক আগে বেরুতে হবে। আচ্ছা, চেষ্টা করব ন'টায় পৌঁছতে। কিন্তু সিটি ট্যুরিস্ট অফিসটা কোথায়?

—একেবারে সেণ্ট্রাল রেলওয়ে স্টেশনের গায়ে। আপনি তো জুগ থেকে ট্রেনে জুরিখ যাবেন? মিঃ ত্রিপাঠী জিজ্ঞেস করেন।

উত্তর দিই—হ্যাঁ। ঠিক আছে।

ওঁরা বিদায় নিলেন। মনটা ভারী হয়ে ওঠে। কতক্ষণেরই বা পরিচয়, তবু যেন বড় আপন। বিদেশে দেশের মানুষকে যে তাই মনে হয়।

আমি আবার একা। হাঁটতে হাঁটতে সেই বেড়ার ধারে এসে দাঁড়াই। সামনে তাকাই, পাহাড়গুলো কয়েকটি ধাপে ঢালু হয়ে গিয়ে নিচে হ্রদের সঙ্গে মিশেছে। তারপরে হ্রদের ওপারে আবার ধাপেধাপে উঁচু হয়ে দূরের তুষারমৌলি আলপ্সের সঙ্গে মিলেছে। এই সবুজ সমতল, ঐ নীল হ্রদ আর সাদা শৃঙ্গমালা সব মিলে যেন একখানি রঙীন ছবি। পাহাড়ের গায়ে গাছপালা আর প্রান্তরের রঙীন ফুল এই দিগন্তবিস্তৃত দৃশ্যপটের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছে। আমি শুধু দেখি আর ভাবি—সুইজারল্যাণ্ড তুমি সত্যই সুন্দর!

ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠি—সেকি! দুটো বাজে। তার মানে বাবুজী প্রায় দুঘণ্টা ধরে একা বসে আছেন। ছিঃ ছিঃ, বড়ই অন্যায় হয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি ফিরে আসি রেস্তোরাঁয়। না, বসে নেই। কতগুলো পিকচার পোস্টকার্ড কিনে তাতে চিঠি লিখছেন। আমাকে দেখে লেখা বন্ধ করে বলেন —কি, কেমন দেখলে বল?

—সুন্দর, ভারী সুন্দর। সত্যি প্রকৃতি সুইজারল্যাণ্ডকে স্বর্গীয় সৌন্দর্য দান করেছেন।

—তার চাইতেও বড় কথা, এঁরা শ্রম যত্ন ও বুদ্ধি দিয়ে আধুনিক যন্ত্র-বিজ্ঞানের সাহায্যে সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে আরও রমণীয় এবং বরণীয় করে তুলেছেন।

মাথা নেড়ে বাবুজীর কথা মেনে নিই। তারপরে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করি—আপনি কিছু খেয়েছেন?

—না। তুমি নেই খাবো কেমন করে? তবে একা একা চুপচাপ বসে সবার খাওয়া দেখছিলাম তো, খিদে পেয়ে গেছল। তাই তো চিঠি লিখতে শুরু করে দিলাম।

সত্যি লজ্জার কথা। আমি দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, আর তিনি এই রেস্তোরাঁয় বসে মানুষের খাওয়া দেখছিলেন। চশমার এ্যাটাচি ফেলে এসে স্নেহ-প্রবণ মানুষটিকে কি কষ্টটাই না দিলাম।

ভেজিটেব্‌ল স্যান্‌ড্‌উইচ, ফ্রুটস পেস্ট্রী, স্যালাড্‌ ও কফি খেয়ে বেরিয়ে এলাম রেস্তোরাঁ থেকে। বাইরে বেরিয়ে বরফ ও ঘাসের ওপরে বাবুজীর কয়েক-খানি ছবি নিলাম।

তারপরে চিঠি ডাকে দিয়ে বিদায় নিলাম রমণীয় রিগির কাছ থেকে। আমরা আরথ্‌গোলডাও-এর ট্রেনে উঠলাম। একটু বাদেই ট্রেন ছাড়ল। উল্টোদিকে চলেছি। বিজনাউ উত্তর-পূবে লুসার্ন হ্রদের তীরে আর আরথ্‌গোলডাও দক্ষিণ-পশ্চিমে জুগ হ্রদের কাছে। একই পাহাড়, পথের প্রাকৃতিক দৃশ্য একই রকম। সেই বনভূমি আর সবুজ উপত্যকা। এদিকেও মাঝে মাঝে বরফ পড়ে আছে।

মাত্র বিশ মিনিটে আমরা আরথ্‌গোলডাও নেমে এলাম। রিগি পর্বত-মালার পাদদেশে ছোট শহর আরথ্‌গোলডাও। শহর ছোট হলেও বেশ বড় জংশন। এখান থেকে পথ গিয়েছে জুরিখ ও মুন্‌সেন (মিউনিক)। শুধু রেলপথ নয়, মোটরপথও বটে।

আমাদেরও ট্রেন বদল করতে হল। ছোট ট্রেন থেকে নেমে বড় ট্রেনে উঠলাম। মিনিট পাঁচেক পরেই ট্রেন ছাড়ল। জুগ পৌঁছতে পোনে একঘণ্টা সময় লাগল। তার মানে জুগ থেকে আরথ্‌গোলডাও এবং লুসার্ণের দূরত্ব প্রায় সমান। আর এ পথটিও ভারী সুন্দর—জুগ হ্রদের তীরে তীরে মোটরপথের পাশে পাশে।

বাবুজী আজও বাসস্ট্যাণ্ড থেকে পারিজাতে চলে গেলেন। আমি ফিরে

এলাম হোটেল গুগিতালে।

আজও মনিকা রয়েছে রিসেপশানে। মুচকি হেসে নমস্কার জানায়। বলে, লাঞ্চের সময় দেখতে পাই নি। আজ কোন্ দিকে গিয়েছিলে?

—লুসান ও রিগিকুলম্।

—কেমন লাগল?

—চমৎকার।

—সত্যি?

—নিশ্চয়ই।

—আমাদের দেশটা খুব সুন্দর, তাই না?

—শুধু তোমাদের দেশ নয়, তোমরাও সুন্দর। আর তাই সারা পৃথিবী তোমাদের দেশকে এত ভালোবাসে।

মনিকা খুশি হয়, হবারই কথা। কিন্তু সেকথা প্রকাশ করবার সুযোগ পায় না। অন্য বোর্ডার এসে যান। সে তাড়াতাড়ি চাবিটা হাতে দিয়ে বলে—ধোবা প্যাণ্ট-সার্ট ধুয়ে দিয়ে গেছে, ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছি।

চাবি হাতে নিয়ে বলি—ধন্যবাদ।

মধুর হেসে সেও আমাকে ধন্যবাদ জানায়।

জুতো পালিশ করে লিফ্‌টের দিকে এগিয়ে চলি। চলতে চলতে কালকের কথাটাই মনে পড়ে আমার। গতকাল মনিকা আমাকে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার জন্য ৩০৭ নম্বর ঘরখানি দিয়েছিল। আজ ত্রিশ ঘণ্টা পরেও সে সহাস্যে সেই ঘরের চাবি এগিয়ে দিল আমার হাতে। ব্যাপারটা বাবুজীকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

ঘরে এসে হাত-মুখ ধুয়ে আজও ব্যালকনিতে এসে বসি। কিন্তু আজ আর বৈকালী রোদ বোকা বানাতে পারে না আমাকে। ঘড়ি ধরে ঠিক আটটার সময় নেমে আসি নিচে। মনিকার হাতে চাবি দিয়ে ডাইনিং হলে এসে ঢুকি। এক কোণে একটা খালি টেবিলে এসে বসি।

আমি দেখতে না পেলেও সে ঠিক দেখেছে আমাকে। হাসতে হাসতে সিল্‌ভিয়া এসে হাজির হয়। মধুর স্বরে বলে—গুড ইভ্‌নিং।

আমিও সহাস্যে প্রতি-অভিবাদন করি।

সিলভিয়া বলে—সারাদিন তো খাওয়া হয় নি। কি খাবে, রাইস? তোমাদের ক্যালকুট্টার মানুষদের তো আবার রাইস না হলে চলে না।

সুইজারল্যাণ্ডের মেয়ে আমাকে ভাত খাওয়াতে চাইছে এর চেয়ে বড় সুসংবাদ আর কি হতে পারে? অতএব সানন্দে বলি—ভাত পেলে তো ভালই হয়।

—সঙ্গে কি দেব? এগ্‌কারী পটেটো ফ্রাই আর স্যালাড? তুমি তো জানো এগ্ য়ুরোপে ভেজিটারিয়ান খাবার।

ডিমের ঝোল ও ভাত। ব্যাপারটা ভাবতেও আনন্দ হচ্ছে। তাই তাড়াতাড়ি বলি—ডিম যে তোমাদের নিরামিষ খাবার, তা জানা ছিল না। জেনে ভালই

হল। তুমি তাই নিয়ে এসো।

খাবার এনে টেবিলে সাজাতে সাজাতে সিল্‌ভিয়া বলে—কাল আমার ছুটি, কাল আমি থাকব না।

নিজের অলক্ষেই চমকে উঠি। কিন্তু কেন? সে তো এই হোটেলের একজন সামান্য পরিবেশিকা মাত্র। সে না থাকলেও আমার খাবার জুটবে। আর কেউ পরিবেশন করবে। তাহলে আমি এমন চমকে উঠলাম কেন?

কি জানি? হোটেলের পরিবেশিকা হলেও বোধ হয় আমি ওর মধ্যে এমন একটা যত্ন ও স্নেহের পরশ পেয়েছি, যা বিদেশে আশা করতে পারি নি। তাই ওকে দেখলে আমি বড় নিশ্চিন্ত বোধ করি।

—আমি না থাকলেও তোমার কোন অসুবিধে হবে না। ইংরেজী জানা অন্য কোন মেয়ে পরিবেশন করবে তোমাকে।

সিল্‌ভিয়া কি বুঝতে পেরেছে আমার মনের অবস্থা, তাই সে আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। তাড়াতাড়ি বলি—না, না, অসুবিধের কি আছে? অসুবিধে হবে কেন?

আমি খেতে শুরু করি। সিল্‌ভিয়া চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে একটুকাল। তার পরে কোমল কণ্ঠে বলে—আমি তাহলে আসি এখন, ওদিকে খদ্দের বসে আছে।

—বেশ, এসো।

—পরশু সকালে দেখা হবে।

—হ্যাঁ।

—গুড নাইট।

—গুড নাইট।

সে চলে যায়। আমি খাওয়ায় মনোনিবেশ করতে চাই। কিন্তু ঠিক পেরে উঠি না। ওর কথাই ভেবে চলি। মাত্র দেড়দিনের পরিচয়। আমার মতো এমন কত বোর্ডার তো প্রায় প্রতিদিন আসছে আর চলে যাচ্ছে। আমিও চলে যাবো ক'দিন পরে। আর দেখা হবে না জীবনে। তাহলে আমার জন্য কেন ওর এত ভাবনা। তবুও বা আমাদের দেশ হলে কথা ছিল। এদেশে মেয়েরা শুধু ছেলেদের মতো পোশাক পরে না, তাদের মনও নাকি ছেলেদের মতো। শুনেছি এদেশের মেয়েরা আমাদের মেয়েদের মতো কোমলা ও অবলা নয়। তারা কথায় কথায় স্বামীকে পরিত্যাগ করে। তাহলে সিল্‌ভিয়া কেন এমন স্নেহশীলা?

কারণ সিল্‌ভিয়া নারী। আচার-আচরণে য়ুরোপের মেয়েরা যতই বাস্তববাদী ও স্বাধীনচেতা হয়ে থাক, তারা নারীত্বকে বর্জন করতে পারে নি, মেয়েদের সহজাত মায়া-মমতা বিসর্জন দিতে পারে নি। বোধ করি কোনদিন পারবে না। তাই আমার দেশের মেয়েদের সঙ্গে তাদের নেই সত্যিকারের কোন প্রকৃতিগত পার্থক্য। সুইজারল্যাণ্ডে এসেও আমি নারীহৃদয়ের সেই পরমসুন্দর পরিচয় পেলাম। মনটা আমার আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

॥ নয় ॥

রাত পোহালো, সুইজারল্যাণ্ডে আমার দ্বিতীয় রাত। আজ সকালের একটা বিশেষ রূপ আছে আমার চোখে। গত দুদিন যখনই হোটেল থেকে পথে বের হয়েছি, বাবুজী আমার সঙ্গে ছিলেন। আর আজ আমি একা পথে বের হব—জুগের পথে, জুরিখের পথে। আজ আমি জুরিখ দেখতে যাচ্ছি।

বাবুজী আজ আর যাবেন না আমার সঙ্গে। গত দুদিন খুবই ঘোরাঘুরি করেছেন। ঊনআশি বছরের মানুষটিকে প্রতিদিন কষ্ট দেওয়া উচিত হবে না। তিনি বরং আজ একটু বিশ্রাম নিন। অতএব আজ আমি একা। অবশ্য জুরিখ পেঁছিবার পরে হয়তো একা থাকব না, মিস্টার ও মিসেস ত্রিপাঠী সঙ্গী হবেন। তাঁরা বাবুজীর মতো সঙ্গী নন, তাহলেও সঙ্গী তো বটেই।

সে কি! এ যে দেখছি সাড়ে ছ'টা বাজে। মিসেস ত্রিপাঠী আমাকে সকাল ন'টা নাগাদ সিটি ট্যুরিস্ট অফিসে পেঁছিতে বলেছেন। তাছাড়া বাবুজীও ডাইনিং হলে চলে আসবেন। সুতরাং আর কুড়েমী করা উচিত হবে না।

বাথরুম সেরে পোশাক পরে নিই। তারপরে পাসপোর্ট ট্র্যাভেলার্স-চেক, গাইড বুক ও ক্যামেরা গুছিয়ে নিয়ে বাবুজীকে ফোন করি—আমি ব্রেকফাস্ট করতে নামছি।

—আমিও 'রেডী'। তোমার ফোনের অপেক্ষায় ছিলাম।

ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে আসি হোটেল থেকে। বাবুজীও আমার সঙ্গে আসেন। তিনি পারিজাতে যাবেন। বিড়লাজী প্রত্যহ প্রাতঃভ্রমণ সেরে এসে একঘণ্টা গীতাপাঠ করেন। বাবুজী সেই পাঠ শুনতে যাচ্ছেন।

বাসস্ট্যাণ্ডে এসে তিনি আবার বলেন—এদেশে চলাফেরা করা খুবই সহজ। কেবল নিয়ম-কানুনগুলো জেনে নিয়ে চারিদিকে একটু দেখেশুনে চলতে হয়। দেখবে সবকিছু লেখা রয়েছে। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। তাছাড়া কলকাতার তুলনায় জুরিখ ছোট শহর। জনসংখ্যা মাত্র ৩,৭৯,০০০। আরেকটা কথা…।

—বলুন।

—সন্ধ্যে হবার আগেই ফিরে এসো কিন্তু।

না এলে স্নেহপ্রবণ মানুষটি দুশ্চিন্তায় পড়বেন এবং হোটেলে খাবার পাওয়া যাবে না। বলি—নিশ্চয়ই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বাবুজী, পারিজাত থেকে ডিনার করে হোটেলে ফিরে এসে আপনি দেখতে পাবেন আমাকে।

—থ্যাঙ্ক্ ইউ।

আমি টিকেট কেটে নিই। আজ আর ভুল হ'ল না দেখে বাবুজী খুশি

হলেন। একটু বাদে বাস আসে। আমি বাসে উঠি। বাবুজী হাত নেড়ে বিদায় জানান। বাস চলতে শুরু করে।

পরশু স্টেশন থেকে হোটেলে আসার পরে আরও চারবার এই এগারো নম্বর বাসে উঠেছি। প্রতিবারেই বাবুজী পাশে বসেছেন। ভাগ্যিস সেদিন জুরিখের হোটেলে থাকতে রাজী হইনি। জুরিখে থাকলে যে আমি তাঁকে এমন করে কাছে পেতাম না।

—লিবফ্রাউয়েনহফ। পায়লট বলে ওঠেন।

স্টপেজে বাস থামে। দরজা খুলে যায়। কয়েকজন নারী-পুরুষ বাসে ওঠেন। দরজা বন্ধ হয়। বাস চলতে শুরু করে।

—Hallo , where are you going ?

কোমল নারীকণ্ঠ। কোন মহিলা কাউকে জিজ্ঞেস করছেন। করুন গে, ইংরেজী বললেও আমাকে নয় নিশ্চয়। এখানে কোন্ কোকিলকণ্ঠী কথা কইবেন আমার সঙ্গে? আগের মতই বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকি। উঁচু-নিচু আঁকা-বাঁকা মসৃণ পথে বাস ছুটে চলেছে।

—Hallo···

আবার সেই কণ্ঠ। একেবারে আমার কানের কাছে এবং কেউ আমার কাঁধে একখানি নরম হাত রেখেছে।

তাড়াতাড়ি পেছন ফিরি। সে কি! এ যে দেখছি সিল্‌ভিয়া। বলে উঠি—তুমি!

—তাই তো তখন থেকে তোমাকে ডাকছি।

—বুঝতে পারি নি।

সে আমার পাশে বসে পড়ে। ছোট কিট্‌ব্যাগটা কোলের ওপর রেখে জিজ্ঞেস করে—এত সকালে কোথায় চলেছো?

—জুরিখ।

—ভালই হল একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

—তুমিও জুরিখ যাচ্ছ?

—সে মাথা নাড়ে। আমি ভাবি—সংসারে কে কবে কার সঙ্গী হবে, কেউ জানে না। একটু আগেও ভাবছিলাম, আমি একা।

—তুমি ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়েছো তো?

সিল্‌ভিয়া জিজ্ঞেস করে। মাথা নেড়ে বলি—হ্যাঁ।

—কে খাবার দিয়েছে? গ্যাবি (Gabi) নিশ্চয়ই?

—তা তো বলতে পারব না। তোমার মতো বয়স, তবে একটু খাটো। ইংরেজী জানে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, গ্যাবি। আমি যে বলে এসেছি ওকে।

ভাবি—সংসারে কে কোথায় কার জন্য চিন্তা করছে, তাও আমরা জানতে

পারি না। মুখে বলি—ছুটির দিনে এত সকালে তুমি জুরিখ যাচ্ছ কেন ?

সে যেন কি একটু ভাবে। তারপরে বলে—একজনের সঙ্গে দেখা করতে।

কে সে ? প্রশ্নটা মনে আসে। কিন্তু করতে পারি না। কোন যুবতীকে এ প্রশ্ন করা উচিত নয়।

সিল্‌ভিয়া নিজের সম্পর্কে আর কিছু বলে না। আমাকে জিজ্ঞেস করে—তুমি কি বেড়াতে চলেছো, না কোন কাজ আছে ?

—আমি তোমাদের দেশে বেড়াতে এসেছি। বেড়ানোই আমার কাজ।

—তা তো বটেই। কিন্তু কোথায় যাবে ঠিক করেছো ?

—কিছুই ঠিক করি নি। সিটি ট্যুরিস্ট অফিসে দুজন লোক আসবেন, তাঁরা আমার সঙ্গে যাবেন।

—তাঁরা কাঁরা ? ইণ্ডিয়ান ?

—হ্যাঁ।

—ছেলে না মেয়ে ?

—স্বামী-স্ত্রী। উত্তর দিই। ভাবি, একটু আগে আমি তাকে প্রশ্ন করতে পারি নি, সে বিনা দ্বিধায় সেই একই প্রশ্ন করে ফেলল আমাকে। কি করব ? সিল্‌ভিয়া যে সুইস হলেও মেয়ে। মানসিকতার দিক থেকে দেশে দেশে মেয়েদের মাঝে একটা আশ্চর্য মিল আছে।

কথা ও ভাবনায় সময় বয়ে গিয়েছে। জুগ স্টেশনে এসে বাস থেমেছে, দুজনে নেমে আসি বাস থেকে। টিকেট কাউণ্টারে এসে লাইনে দাঁড়াই। গতকালের সেই ভদ্রলোকই রয়েছেন।

সিলভিয়া আমার পেছনে দাঁড়ায়। বলি—তোমার আবার লাইন দেবার কি দরকার ? আমি তোমার টিকেট নিয়ে নিচ্ছি।

সে আমার কথা শোনে। সঙ্গে সঙ্গে লাইন থেকে বেরিয়ে এসে আমার পাশে দাঁড়ায়। তারপরে কিট্‌ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে তার জিন্‌স-প্যাণ্টের হিপ্‌ পকেট থেকে 'পার্স' বের করে, আটটি ফ্রাঙ্ক্‌ আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে।

জিজ্ঞেস করি—কি ?

—আমার টিকেটের দাম।

জুরিখ থেকে জুগ মাত্র ২৭ কিলোমিটার। কিন্তু ভাড়া আট ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ চার ডলার মানে চল্লিশ টাকা। আমার পক্ষে খুবই বেশি। পাঁচশ' বিশ ডলার সম্বল করে য়ুরোপ ভ্রমণে এসেছি। লণ্ডন প্যারী স্ত্রাসবুর্গ বন ও বার্লিনের বন্ধু ও বান্ধবীরা ভরসা দিয়েছে বলেই আসতে সাহস পেয়েছি। সুতরাং চার ডলার আমার কাছে অনেক টাকা। তাহলেও সিল্‌ভিয়াকে বলি—থাক্‌ না, তোমার ভাড়াটা না হয় আজ আমিই দিয়ে দিচ্ছি।

—না, না, তুমি কেন দেবে ? তুমি ট্যুরিস্ট্‌।

—তাহলেও তুমি আমার সঙ্গে জুরিখ যাচ্ছ। It will be a pleasure

for me

—Oh no! Please for Heaven's sake kindly accept this money. We always pay our own fare.

পরশুদিন স্টেশন থেকে হোটেলে যাবার সময় বাসের সেই ঘটনাটি মনে পড়ে গেল। সেই যুবক-যুবতী, প্রেমিক-প্রেমিকা হওয়া সত্ত্বেও নিজ নিজ টিকেটের দাম দিল। আমি যে অর্থনৈতিক স্বাধীন দেশে এসেছি। এদেশে সাবালক হয়ে যাবার পরে ছেলে-মেয়ে পর্যন্ত মা-বাপের কাছ থেকে টাকা নেয় না। এখানে আর্থিক সম্পর্ক সর্বদা 'হিজ হিজ হুজ হুজ'।

অতএব আর আপত্তি করি না। ওর কাছ থেকে ফ্রাংক ক'টি হাতে নিই। সিল্‌ভিয়া সহাস্যে বলে ওঠে—থ্যাংক ইউ।

টিকেট কেটে ভেতরে আসি। একটু বাদে ট্রেন আসে। তেমনি ফাঁকা গাড়ি। আমরা উঠে ভাল জায়গা বেছে পাশাপাশি দুজনে বসি। সিল্‌ভিয়া তার জ্যাকেট খুলে ফেলে। এদেশের তাই নিয়ম—বাইরে ঠাণ্ডা, গাড়িতে গরম। গাড়িতে উঠে সবাই কোট-ওভারকোট ইত্যাদি খুলে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে দেন। হাতের জিনিসপত্র টেবিলে কিম্বা বাঙ্কে রেখে পত্র-পত্রিকা খুলে বসেন। সিল্‌ভিয়া জ্যাকেট খুলে কিট্‌ব্যাগ টেবিলে রেখে দিল, কিন্তু কোন পত্র-পত্রিকা খুলে বসল না। ভালই হল, নইলে আমাকে মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকতে হত।

ট্রেন চলতে শুরু করে। আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকি। কিন্তু মনে মনে ভেবে চলি—কি বিচিত্র এই জগৎ! পরশু যখন এই ট্রেনে করে জুরিখ থেকে জুগ এসেছিলাম, তখন তো ভাবতেও পারি নি, আবার জুরিখ যাবার সময় আমার পাশে থাকবে সিল্‌ভিয়ার মতো একটি সুন্দরী সুইস যুবতী।

—কি ভাবছ এমন একমনে?

সিল্‌ভিয়ার প্রশ্নে সিল্‌ভিয়ার ভাবনা থেমে যায়। ওর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলি—ভাবছিলাম তোমার কথা।

—রিয়েলী! কি ভাবছিলে বলো না, প্লীজ! ওর স্বরে মেয়েদের সহজাত আবদার।

—ভাবছি পরশু যখন এই ট্রেনে করে জুগে এসেছিলাম, তখন তো ভাবতেও পারি নি যে আজ তুমি আমার সঙ্গে থাকবে।

—ওঃ, এই কথা! সিল্‌ভিয়ার কণ্ঠে যেন হতাশার সুর।

কেন? সে কি ভেবেছিল, আমি অন্য কিছু ভাবছিলাম। কি ভেবেছে সে?

না। সেকথা জিজ্ঞেস করা যায় না। তাই অন্য কথা বলি—ব্যাপারটা বিস্ময়কর নয় কি?

—তা খানিকটা। কিন্তু তুমি তো জানো সেই কথাটা।

—কি কথা?

—Sometimes truth becomes stranger than fiction.

—হ্যাঁ, জানি। তবু যখন কল্পনা বাস্তবের চেয়ে বেশি সত্য হয়, তখন বিস্মিত হতে হয় বৈকি! আমিও তাই হয়েছি।

সিল্‌ভিয়া আর কিছু বলছে না, সে চুপ করে আছে। কি ভাবছে সে? আমার কথা না অন্য কিছু? কে জানে?

নীরবতাকে কিন্তু অস্বস্তিকর মনে হচ্ছে। তাই তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করি। বলি—তুমি তো জানো, আমি তোমাদের দেশে বেড়াতে এসেছি। ক'দিনই বা থাকব তোমাদের মাঝে!

সিল্‌ভিয়া আমার দিকে তাকায়। আমি আবার বলি—তাই বলছিলাম, তুমি যদি তোমাদের দেশের কিছু কথা ব'লো।

—কি বলব? সিল্‌ভিয়া সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে।

মুশকিলে পড়ে যাই। চট করে কিছু মাথায় আসে না। একটু ভেবে নিয়ে বলি—আমরা এখন রেলে বসে আছি। তুমি আমাকে সুইস রেলওয়ের কথা বলো।

আপত্তি না করে সিল্‌ভিয়া বলতে শুরু করে—আমরা সুইসরা, প্রথম যুগে রেলকে স্বাগত জানাই নি।

—কেন?

—কারণ আমাদের ধারণা ছিল এই পাথুরে দেশে রেল চালালে আমাদের ভুপ্রকৃতির পরিবর্তন হবে, রেল আমাদের সমৃদ্ধির পরিপন্থী হয়ে উঠবে। তাই ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের আগে আমাদের দেশে রেল লাইন পাতা হয় নি। ঐ বছর পরীক্ষামূলকভাবে আরগাও-এর বাডেন থেকে জুরিখ পর্যন্ত একটি রেললাইন পাতা হল। লাইনটি দেখে বৃটিশ ইঞ্জিনীয়ার রবার্ট স্টীফেনসন এক রিপোর্টে ফেডারেল সরকারকে জানালেন, আমাদের দেশের মাটি রেল চলাচলের উপযোগী। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল সরকার দেশের সর্বত্র রেল চালাবার অনুমতি দান করলেন।

তারপরে পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সুইজারল্যাণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবসা-ভিত্তিক রেল চালিয়েছেন। অবশেষে ফেডারেল সরকার নিজেরাই এ ব্যাপারে উদ্যোগী হলেন। ১৮৯৯ সালে প্রথম সরকারী রেল চলাচল শুরু হল।

তবে আমাদের দেশে রেললাইন পাততে যেমন টাকা খরচ হয়েছে, তেমনি করতে হয়েছে প্রচণ্ড পরিশ্রম। তৈরি করতে হয়েছে অসংখ্য পুল, কাটতে হয়েছে বহু টানেল। আমাদের সিম্পলন্ (Simplon) বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম রেল টানেল।

—কত লম্বা?

আমার প্রশ্নে সিল্‌ভিয়া থেমে যায়। একটু হেসে বলে—উনিশ কিলোমিটার। আবার থামে সে, তারপরে বলে—সুইস রেলওয়ে এখন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ

রেল পরিবহন। এই ছোট্ট দেশে পাঁচহাজার কিলোমিটারের ওপরে রেলপথ রয়েছে। তাছাড়া আমাদের রয়েছে, Rack and Pinion Railways অথবা Cogwheel Railways, Funicular Railways এবং Cable Railways. এই তিন রকম রেললাইন তৈরি করতে সুইজারল্যাণ্ড প্রায় পথিকৃৎ।

—আচ্ছা Funicular রেলওয়েটি কেমন ?

—Cogwheel রেলের মতই পাহাড়ে ওঠার গাড়ি। তবে Cogwheel নিজে চলে আর এটিকে তার দিয়ে ওপরে টেনে তোলা কিম্বা নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়। ১৯২৭ সালে আমাদের দেশে প্রথম এই রেল চলাচল শুরু করে।

থামল সিল্ভিয়া। আমি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করি। বলি—আচ্ছা, তোমাদের দেশে তো সমুদ্র-উপকূল নেই। কিন্তু শুনেছি তোমাদের জাহাজ শিল্প বেশ ভালো ?

—তা জানি না। তবে আমাদের প্রচুর স্টীমার ও বেশ কিছু 'মার্চেণ্ট নেভী' রয়েছে। সমুদ্র না থাকলেও আমাদের দেশে নদী আছে, বিশেষ করে রাইন নদী। রাইনকে এদেশের জাহাজ শিল্পের জননী বলতে পারো। রাইনের মাধ্যমেই আমাদের দেশের সঙ্গে জলপথে সমুদ্রের যোগাযোগ।

একবার থামে সে, বোধ করি দম নেয়। তারপরে আবার শুরু করে—এদেশের প্রায় প্রত্যেকটি হ্রদে যাত্রী পরিবহন ও প্রমোদভ্রমণের জন্য চমৎকার স্টীমার সার্ভিস রয়েছে। বিলাসবহুল স্টীমারে করে আমরা ট্যুরিস্টদের জার্মানী ও ফ্রান্সে নিয়ে যাই। তাছাড়া রয়েছে মার্চেণ্ট নেভী। তারা পৃথিবীর সব দেশে মাল পরিবহন করে।

—এবারে তোমাদের কল-কারখানার কথা বলো। সিল্ভিয়া থামতেই আমি ফরমাশ করি।

সে কিন্তু আপত্তি করে না। একটু ভেবে নিয়ে বলতে থাকে—দেশের আয়তনের তুলনায় কল-কারখানার সংখ্যা আমাদের বেশ বেশি। তাছাড়া নতুন নতুন কারখানা তৈরি হয়েই চলেছে। আমাদের শ্রমিকদের শতকরা চল্লিশ ভাগ এইসব কারখানায় কাজ করেন। তাদের এক-তৃতীয়াংশ ছোট ছোট কারখানায় কর্মরত। এদেশে ছোট কারখানার সংখ্যাই বেশি। ঐসব কারখানায় শ্রমিকদের সংখ্যা পঞ্চাশের মধ্যে। এবং তুমি তো জানো, আমাদের দেশে তৈরি জিনিস-পত্রের বিদেশের বাজারে খুবই চাহিদা।

আমি মাথা নেড়ে বলি—জানি বৈকি।

সে বলতে থাকে—তবে আমাদের শিল্পোৎপাদন বিদেশ থেকে রপ্তানী করা কাঁচামালের ওপরে নির্ভরশীল। কারণ এদেশে কাঁচামাল প্রায় নেই বললেই চলে।

—আচ্ছা তোমাদের দেশের প্রধান রপ্তানী কি ?

—পাঁচটি।

—কি কি ?

—টেক্সটাইলস, ধাতুনির্মিত জিনিসপত্র, ঘড়ি, ওষুধপত্র ও রাসায়নিক দ্রব্য এবং পর্যটন ব্যবসা।

—পর্যটন ব্যবসা!

—হ্যাঁ, আমরা পর্যটন ব্যবসাকে Export Revenue বলেই মনে করি।

—এবারে তোমাদের অর্থনীতি সম্পর্কে কিছু ব'লো।

সিলভিয়া হঠাৎ হো-হো করে হেসে ওঠে। আমি অবাক হই। ওর মুখের দিকে তাকাই। সে হাসি থামিয়ে বলে—তোমার প্রশ্নের ধরণ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি রিপোর্টার আর আমি একজন সুইজারল্যাণ্ড বিশারদ। তুমি রিপোর্টার কিনা জানি না, কিন্তু আমি বিশারদ নই। আর তা তুমিও জানো।

—কেমন করে?

—আমার চাকরি দেখে তোমার বুঝতে পারা উচিত, আমি বেশিদূর লেখা-পড়া করি নি। অবশ্য সত্য হল, সুযোগের অভাবে আমার লেখাপড়া হয় নি। কেমন করে হবে ব'লো। জ্ঞান হবার পর থেকেই দেখেছি, বাবা ও মা কথায় কথায় ঝগড়া করে, মাঝে মাঝেই তাদের মারামারি হয়। শেষ পর্যন্ত ওদের "ডিভোর্স" হয়ে গেল। আমি পড়লাম বাবার ভাগে আর আমার ছোটভাই রইল মায়ের কাছে। আমার বয়স তখন বছর বারো। স্কুলে পড়ি, কিন্তু পড়ার সময় পাই না। ঘরের সব কাজ করতে হয়। তার ওপরে প্রায় প্রতিরাতে বাবা মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরে এবং মাঝে মাঝেই নতুন নতুন গার্লফ্রেণ্ড সঙ্গে নিয়ে আসে। আমার রান্না করতে হয়। সামান্য ত্রুটি হলে বাবা চাবুক মারে আর তার গার্লফ্রেণ্ডরা আমার গায়ে মদ ঢেলে দেয়।

মুখ বুজে সব অত্যাচার সয়ে যাবার চেষ্টা করি। একদিন অসহ্য হয়ে ছুটে গেলাম মায়ের বাড়িতে। মা তখন কাজে বেরিয়েছে। দেখা হল ভাইয়ের সঙ্গে। ভাই আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করে দিল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, দিদি, তুই আমাকে নিয়ে চল।

ভাই জানালো, মা আবার বিয়ে করেছে। সে লোকটা নাকি বাবার চেয়েও বদরাগী। বাড়ি থাকলেই সে ভাইকে দিয়ে গাড়ি ধোয়ায়, বাগান পরিষ্কার করায়. বাসন মাজায়, কাপড় কাচায় আর গা টেপায়। ভাই স্কুলে যেতে চাইলে মারধোর করে।

আমি তখন ভাইকে অনেক বোঝালাম। বললাম, কয়েকটা বছর একটু কষ্ট করে সয়ে যা। নিজের পায়ে একটু দাঁড়াতে পারলেই আমি তোকে আমার কাছে নিয়ে যাবো।

চুপ করে সিলভিয়া। আমি অবাক হয়ে ভাবি, এই হাসি-খুশি স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী সুইস যুবতীর বুকের মধ্যে এত ব্যথা? মনটা ভারী হয়ে যায়। তবু জিজ্ঞেস করি—তারপরে কি হল?

সিলভিয়া একটু হাসে। সে হাসিতে আনন্দের চেয়ে বেদনাই বেশি জড়িয়ে

আছে। সে বলে—তারপরে আরও অনেক কথা। কিন্তু সব কথা তোমার শোনার দরকার নেই। শুধু জেনে রাখো, প্রায় ছ'বছর ধরে আমি আর আমার ভাই সেই নরকযন্ত্রণা ভোগ করেছি। তারপরে 'স্কুল-লিভিং' পরীক্ষা দিলাম। পাস-ও করে গেলাম। স্কুলে পড়ার সময়েই আমি শনি-রোববার এই হোটেলে কাজ করতাম। যা পেতাম তাতে আমার ও ভাইয়ের স্কুলের মাইনে, জামা-কাপড় ও টিফিন হয়ে যেতো। পাস করার পরে স্থায়ীভাবে এখানে যোগ দিলাম। একটা ফ্ল্যাট-ও যোগাড় হয়ে গেল। বাবার বাড়ি ছেড়ে নিজের বাসায় চলে এলাম। একদিন মায়ের কাছে গিয়ে ভাইকে চেয়ে আনলাম।

—মা-বাবা আপত্তি করেন নি?

—বাবা করে নি। মা একটু কান্নাকাটি করেছিল কিন্তু বাধা দেয় নি। কারণ মা বুঝতে পেরেছিল, ভাই আমার কাছে ভাল থাকবে, মানুষ হবে।

—হয়েছে?

—নিশ্চয়ই। একাউণ্টস নিয়ে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। একটা বড় ইনসিওরেন্স কম্প্যানীতে ভাল চাকরি করে। এখন জুরিখে থাকে। সময় পেলেই আমার কাছে চলে আসে। আমিও মাঝে মাঝে ওর কাছে গিয়ে থাকি।

—আজ কি ওর ওখানেই চলেছো?

—না। এখন যাবো না। সন্ধ্যার পরে একবার দেখা করে আসব। আজ সোমবার, ওর অফিস আছে।

—ভাই বিয়ে করেছে?

—না। তবে ওর গার্লফ্রেণ্ডটি বেশ ভাল। জানি না ওদের কি 'প্ল্যান'!

—তুমি বিয়ে করেছো?

—না।

—কেন?

সিলভিয়া আবার একটু হাসে। বলে—দেখো, বিয়ে সম্পর্কে আমাদের ধারণাটা ঠিক তোমাদের মতো নয়। আমাদের কাছে বিয়েটা একটা বিশ্রী বন্ধন। Eat merry and enjoy-এর জন্য আবার বিয়ে করা কেন? তাছাড়া আমরা য়ুরোপের মেয়েরা এখন সন্তানধারণ ও সন্তানপালনকে আদিমযুগের ব্যাপার বলে মনে করছি।

কি বলব? এতকাল জেনে এসেছি, বিবাহ জীবনের পবিত্রতম উৎসব, মাতৃত্ব নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। আর সিলভিয়া বলছে, জীবনে বিয়ের কোন প্রয়োজন নেই, সন্তানধারণ আদিমযুগীয় ব্যাপার। একবারও ভেবে দেখছে না, জীবনে সে যত যন্ত্রণাই ভোগ করে থাক, যন্ত্রণা জীবনের চেয়ে বড় নয় এবং সে-ও তার মায়েরই সন্তান।

আমি জানি আজকের আধুনিক সমাজ এই সত্যকে শ্রদ্ধা করে না। তাহলেও আমরা এই আধুনিকতাকে মেনে নিতে পারি না। আমাদের কাছে নারীর

শ্রেষ্ঠ পরিচয় সে স্নেহময়ী জননী।

—কথাগুলো তোমার বোধ হয় ভাল লাগল না। আমাকে নীরব থাকতে দেখে সিল্‌ভিয়া বলে ওঠে।

আমি তার দিকে তাকাই। ওর চোখে চোখ পড়ে আমার। সে চোখে একটা অসহায় দৃষ্টি। সিল্‌ভিয়া চোখ নামিয়ে নেয়, মাথা নত করে।

কেন? ও যা বলল, তা কি ওর মনের কথা নয়? নিজের জীবনের বেদনাময় অতীত আর ভোগসর্বস্ব বর্তমান ওর এই মানসিকতা সৃষ্টি করেছে। সুতরাং বলতে হয়—জীবনের পথে চলতে গেলে চড়াই-উৎরাই পেরোতেই হবে। তাই বলে পথের ভয়ে জীবনের দাবীকে অস্বীকার করছ কেন? বিবাহ মানবসভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। তাই অনুরোধ করি, ভাল সঙ্গী দেখে বিয়ে ক'রো। দুজনে দুজনকে বোঝার চেষ্টা ক'রো। একের জন্য অপরে একটু-আধটু ত্যাগস্বীকার করে নিও। দেখবে সংসার শান্তিময় হয়ে উঠেছে, জীবন হয়েছে মধুময়।

—তাই বলে আমি একটা লোকের জুলুম মেনে নেব?

—তা মানবে কেন? সে যদি সত্যই জুলুম করতে চায়, তাকে বোঝাবে সে অন্যায় করছে। ঝগড়া কিম্বা মারামারি করে নয়, প্রীতি ও শ্রদ্ধার মধুর ভাষায়। দেখবে তার জুলুম বন্ধ হয়ে গেছে। তাছাড়া তুমি যেমন চাও সে তোমার কথা শুনবে, তেমনি তোমাকেও যে তার কিছু কথা শুনতেই হবে।

—তা তো বটেই। সে মাথা নেড়ে একবার আমার দিকে তাকায়। তারপরে আবার মাথা নিচু করে বলে—ও কিন্তু আজকাল আমাকে কেবলি বলছে বিয়ের কথা।

—কে?

—আমার বয়ফ্রেণ্ড। আমি এখন যার কাছে যাচ্ছি।

—তুমি আজ তার কাছেই থাকবে?

—হ্যাঁ। তাই থাকি। একটা 'উইক-এণ্ড' আমি ওর কাছে এসে থাকি, পরের উইক-এণ্ড ও আমার ফ্ল্যাটে থেকে আসে। বছরে একমাস ছুটি আমরা একসঙ্গেই কাটাই।

অর্থাৎ এরা স্বামী-স্ত্রীর মতই বসবাস করছে। কেবল বিয়েটা করে নি। করে নি কারণ ভোগকেই জীবনের মোক্ষলাভ বলে ধরে নিয়েছে। ভোগে যখন অসুবিধে হচ্ছে না, তখন অযথা বিয়ের বন্ধন মেনে নেওয়া কেন? কিন্তু এতে যে মানুষের সমাজ-সভ্যতা ভেঙে পড়বে! তাই আবার জিজ্ঞেস করি—তোমাদের কতদিনের পরিচয়?

—বছর পাঁচেক হয়েছে।

—তাহলে নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে এখন একটা বেশ ভাল বোঝাপড়া গড়ে উঠেছে?

—তা উঠেছে।

এবং তেমরা দুজনে দুজনকে ভালোবাসো ?

একটু লজ্জা পেয়ে যায় সিল্‌ভিয়া। মুখে কিছু বলতে পারে না। শুধু মাথা নাড়ে।

আমি জিজ্ঞেস করি—তাহলে তুমি ওর প্রস্তাবে রাজী হচ্ছ না কেন ?

—কোন্‌ প্রস্তাব ? সিল্‌ভিয়া আমার দিকে তাকায়।

ওর চোখে চোখ রেখে জবাব দিই—বিয়ের প্রস্তাব !

সে আবার মাথা নত করে।

আমি বলি—আজ গিয়েই ওকে বলবে বিয়ের ব্যবস্থা করতে।

—আজই !

—হ্যাঁ। আজ বলতে বাধা কোথায় ?

—না, কোন বাধা নেই। তবে আজই !

—হ্যাঁ, আজই বলবে। আমাদের দেশে একটা কথা আছে, যা ভাল তা তাড়াতাড়ি হওয়াই ভাল।

—তুমি বলছ, বিয়ে করলে আমাদের দুজনেরই ভাল হবে ?

—নিশ্চয়ই।

—বেশ বলব। সিল্‌ভিয়া লক্ষ্মী মেয়ের মত মাথা নাড়ে।

॥ দশ ॥

জুরিখ সেন্ট্রাল স্টেশনে এসে আমাদের ট্রেন থামল। ঘড়ি দেখি, ন'টা বেজে পাঁচ। তার মানে এই ২৭ কিলোমিটার পথ আসতে আধঘণ্টা লেগেছে।

সিল্‌ভিয়ার সঙ্গে নেমে আসি গাড়ি থেকে। এটা সুইজারল্যাণ্ডের সবচেয়ে বড় রেলস্টেশন। অতএব ব্যস্ততা সর্বত্র। কিন্তু হট্টগোল কিম্বা ধাক্কাধাক্কি একেবারে নেই। আজ কাজের দিন, সুতরাং সবাই ছুটছেন। গাড়ি থেকে নেমে ছুটছেন, গাড়ি ধরার জন্য ছুটছেন। সময় সম্পর্কে সবাই সমান সচেতন। সময় অমূল্য, তাই ছুটছেন। কিন্তু কেউ কারও গায়ে পড়ছেন না। দৈবাৎ যদি কারও গায়ে সামান্য ছোঁয়া লাগছে, মৃদুকণ্ঠে দুজনেই দুঃখপ্রকাশ করছেন।

আমরা বেরিয়ে আসি প্ল্যাটফর্ম থেকে। সিল্‌ভিয়া জিজ্ঞেস করে—তুমি তো সিটি ট্যুরিস্ট্ অফিসে যাবে?

—হ্যাঁ।

—এসো আমার সঙ্গে।

—তুমি আবার সময় নষ্ট করছ কেন? আমি জিজ্ঞেস করে ঠিক চলে যেতে পারব। আমি আপত্তি করি। বয়ফ্রেণ্ড নিশ্চয়ই ওর পথ চেয়ে বসে আছে।

কিন্তু সিল্‌ভিয়া কোন গরজ দেখায় না। বলে—আমাকে বানহোপ স্ট্র্যাসী অর্থাৎ বড় রাস্তায় গিয়ে বাস ধরতে হবে, পথেই ট্যুরিস্ট অফিস। তুমি এসো আমার সঙ্গে। আমার সময় নষ্ট হবে না।

অতএব আর আপত্তি না করে ওর সঙ্গে চলতে থাকি। আমরা স্টেশন-চত্বর দিয়ে এগিয়ে চলেছি। তেলের মতো মসৃণ মেঝে, কোথাও একটা টিকেট পর্যন্ত পড়ে নেই, নেই কোন হকারের হাঁকডাক। দোকানপাটও প্রায় নেই বললেই চলে। কেবল গুটিকয়েক নিউস-স্ট্যাণ্ড বা পত্র-পত্রিকার দোকান দেখতে পাচ্ছি। কথাটা জিজ্ঞেস করি সিল্‌ভিয়াকে। সে হেসে উত্তর দেয়—দোকান আছে বৈকি! এতবড় স্টেশন দোকানপাট না থাকলে চলে? তবে যাত্রীদের যাতে চলাফেরায় অসুবিধে না হয়, তাই এখানে দোকান করতে দেওয়া হয় নি। দোকান, না দোকান নয় বাজার, বেশ ভাল একটা বাজার আছে এখানে, এই স্টেশনের তলায়। আধুনিকতম আণ্ডারগ্রাউণ্ড মার্কেট। ঐ যে এসক্যালেটার দেখছ! ওতে দাঁড়িয়ে নিচে নেমে গেলেই তুমি বাজারে পৌঁছে যাবে। দেখবে রেস্তোরাঁ থেকে জুয়েলারী সপ পর্যন্ত সবই রয়েছে। বাসট্রিপ থেকে ফিরে এসে দেখো। এখন চলো, তোমার বন্ধুরা বোধ হয় অপেক্ষা করছেন।

আমরা স্টেশনের সামনে অর্থাৎ বানহোপ স্ট্র্যাসীতে আসি। কিন্তু এ কি রাজপথ না রাজপ্রাসাদের অলিন্দ। পথ যে এত মসৃণ হতে পারে, তা এর আগে

জানা ছিল না আমার। প্রকাণ্ড একটা প্রশস্ত নয়, পাশে বোধ করি আমাদের চৌরঙ্গীর চেয়ে কিছু কমই হবে। বাস ট্রাম ও গাড়ি চলছে অবিরত। পুলিস নেই, রয়েছে ট্র্যাফিক লাইট। সবাই নিয়ম মেনে গাড়ির পেছনে গাড়ি চালাচ্ছেন। মানুষ ফুটপাথ দিয়ে হাঁটছে, জ্যামজটের কোন ব্যাপার নেই।

মনে পড়ছে 'Uly.ses' রচয়িতা বিখ্যাত আইরিস ঔপন্যাসিক জেম্‌স জয়েস-এর কথা (James Joyce, 1882-1941)। তিনি এই পথ ও শহরের পরিচ্ছন্নতা প্রসঙ্গে লিখেছেন—'Zurich is so clean that you could spill minestrone on the Bahnhof Strasse and eat it up without a spoon.'

অতএব আমি বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে আছি, তাকিয়ে আছি অবাক বিস্ময়ে। আমি ভুলে গেলাম ট্যুরিস্ট অফিসের কথা, ভুলে গেলাম আমার পাশে সিল্‌ভিয়া দাঁড়িয়ে আছে। সে বোধ করি বুঝতে পারে আমার মনের অবস্থা। তাই বলে ওঠে—সুইজারল্যাণ্ডের সবচেয়ে সুন্দর রাস্তা।

আমি মাথা নাড়ি। সে আবার বলে—পরে একসময় হেঁটে বেরিয়ে ভাল করে দেখবে, এখন ট্যুরিস্ট অফিসে যাও, তোমার বন্ধুরা বসে আছে।

লজ্জা পেয়ে বলে উঠি—হ্যাঁ, চলো।

—চলার কিছু নেই, এই যে তোমার সামনেই ট্যুরিস্ট অফিস।

তাকিয়ে দেখি, সত্যই তাই। বানহোপ স্ট্র্যাসীকে দেখে আর চোখ ফেরাতে পারি নি বলেই এতক্ষণ দেখতে পাই নি।

সিলভিয়া আমার একখানি হাত ধরে বলে—আমি এখন আসি তাহলে, আগামীকাল সকালে আবার দেখা হবে।

আমি ওর সঙ্গে করমর্দন করি। সে আমার হাত ছেড়ে দেয়। একটু হেসে বলি—তুমি কিন্তু আমাকে কথা দিয়েছো, আজই তোমার বয়ফ্রেণ্ডকে বিয়ের সম্মতি জানিয়ে দেবে।

সলাজ স্বরে সে বলে—হ্যাঁ, বলব। তারপরে একবার আমার দিকে তাকিয়ে ফুটপাত ধরে বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে হাঁটতে শুরু করে। আর আমি দরজা ঠেলে ট্যুরিস্ট্ অফিসে প্রবেশ করি।

খুব বড় নয় কিন্তু ভারী সাজানো-গোছানো বিন্যস্ত অফিস। একপাশে পর্যটকদের বসবার ব্যবস্থা। তাঁদের সামনে একটা বড় টেবিলে থাকে থাকে রঙ্গীন ব্রোশুর (Brochure) এবং 'লীফ্‌লেট'—সুইজারল্যাণ্ডের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানের বিবরণ। আরেকপাশে অফিস কাউণ্টার—চার-পাঁচজন নারী-পুরুষ দাঁড়িয়ে কাজ করছেন, কেউ পর্যটকদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন, কেউ বা বিভিন্ন ভ্রমণের টিকেট কাটছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, এতগুলো মানুষ এক জায়গায় জড়ো হয়েছেন, কিন্তু কোন চিৎকার-চেঁচামেচি নেই। অনেকেই কথা বলছেন কিন্তু এত আস্তে যে যাঁকে বলছেন, তিনি ছাড়া আর কেউ শুনতে পাচ্ছেন না।

এদিক-ওদিক তাকাতেই দেখতে পাই ওঁদের। মিস্টার ত্রিপাঠী ইসারায়

কাছে ডাকেন আমাকে। আমি এগিয়ে আসি, ও'দের পাশে একখানি সোফায় বসি।

মিসেস ত্রিপাঠী বলেন—সাড়ে ন'টায় বাস ছাড়বে। আমরা একটু চিন্তাতেই পড়ে গিয়েছিলাম, আপনি পে'ছিতে পারবেন কিনা? এদিকে আমরা আপনার টিকেট করে রেখেছি। যাক্‌ গে, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

—আমরা কোথায় যাচ্ছি?

—জ্যুরিখ দেখছি, সিটি ট্যুর করছি। তিনঘণ্টা লাগবে। বেলা সাড়ে বারোটায় ফিরে আসব। তারপরে আপনি পায়ে হে'টে ঘুরে বেড়াতে পারেন। কিম্বা অন্য কোন 'হাফ-ডে বাসট্রিপ' নিতে পারেন।

মিসেস টিকেটটা আমার হাতে দিতে চান। আমি বাধা দিয়ে বলি—ওটা আপনার কাছেই রেখে দিন। আমাকে কত দিতে হবে?

—পঁচিশ ফ্রাঁ।

দামটা দিয়ে দিই ও'কে। মনে মনে ভাবি—আমাদের কলকাতা ঘুরতে ঘুরতে পনেয়ো টাকা লাগে আর এ'দের জ্যুরিখ ঘুরতে পঁচিশ ফ্রাঁ। আড়াই ঘণ্টার বাসভ্রমণের জন্য সোয়াশ' টাকা।

দরিদ্র দেশের নাগরিকদের পক্ষে বিদেশভ্রমণ কি বিপুল ব্যয়বহুল! আজ একজন আমেরিকানকে এই ভ্রমণের জন্য তাঁদের টাকায় দিতে হচ্ছে সাড়ে বারো টাকা (ডলার) আর আমাকে গুনতে হ'ল সোয়াশ' টাকা। অথচ ডলারকে এক টাকা ধরে নিলেও আমেরিকানদের গড় জাতীয় আয় আমাদের প্রায় পাঁচগুণ।

বানহোপ স্ট্র্যাসীর ওপরে অবস্থিত হলেও ট্যুরিস্ট্‌ অফিসের পাশে আরেকটা চওড়া রাস্তা আছে, নাম—বানহোপ প্লাটস্‌ (Platz) অর্থাৎ 'প্লেস।' সেখানে একসারিতে চারখানি বাস দাঁড়িয়ে রয়েছে। টিকেট দেখে আমরা তারই একখানি বাসে উঠে আসি। নিজেদের সিটে এসে বসি। টিকেটে বাস ও সিটনম্বর লেখা রয়েছে। আমাদের ভাগ্য ভাল, ডানদিকের সিট পাওয়া গেল। এদেশে ডানদিক দিয়ে গাড়ি চলে।

বলা বাহুল্য লাক্সারী কোচ। কিন্তু 'লাক্সারী' শব্দটা আপেক্ষিক। আমার বিলাসিতা আর একজন লক্ষপতির বিলাসিতা এক হতে পারে না, আবার একজন লক্ষপতি ও কোটিপতির বিলাসিতা এক নয়। তেমনি আমাদের দেশের লাক্সারী বাস ও সুইজারল্যাণ্ডের লাক্সারী কোচ এক হতে পারে না। এটি শুধু বিলাসবহুল নয়, এর গঠনই অন্যরকম।

আমাদের দেশের তুলনায় চাকাগুলো ছোট ছোট, ফলে গাড়িগুলো নিচু। অসুবিধে নেই কোন। কারণ এদেশে বৃষ্টি হলে পথে জল দাঁড়ায় না। তাই বলে বসবার সিটগুলো নিচে নয়, অনেক ওপরে, প্রায় মাটি থেকে ফুট পাঁচেক ওপরে। বাসের ছাদের কোন 'ক্যারিয়ার' নেই, নিচে মাল রাখার জায়গা ও বাসের যন্ত্রপাতি। বাসগুলো দেখতেও ভারী সুন্দর। কোনটির গায়ের রং

সাদা কোনটির বা ঘি রং। কোনটির গায়ে চকোলেট রঙের চওড়া স্ট্রাইপ, কোনটির বা নীল অথবা লাল। আর কাচ, শরীরের প্রায় অর্ধেকটা জুড়েই কাচ। ফলে যে কোন সিটে বসে যে কোন দিকে তাকালেই সবটা দেখা যাবে।

বলা বাহুল্য বাসের দরজা ডানদিকে। দরজা খুলে দেবার পরে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে আমরা উঠে আসি ওপরে। মেঝেতে পুরু কার্পেট মাঝখানে 'প্যাসেজ' দুপাশে দুটি করে একসারিতে চারখানি সিট। সিটগুলো খুবই আরামদায়ক। বিমানের সিটের মতো পেছনে হেলিয়ে দিয়ে আধশোয়া হয়ে থাকা যায়।

সব সিট ভর্তি হল না। কিন্তু ঠিক সাড়ে ন'টায় বাসের ইঞ্জিন গর্জে উঠল। বাস চলতে শুরু করল।

গাইড-কাম-কণ্ডাক্টর পায়লটের পাশে বসে হাতে মাইক নিয়ে আমাদের দিকে ফিরে ইংরেজীতে বলতে শুরু করলেন—লেডিজ এ্যাণ্ড জেণ্টলমেন গুডমর্নিং। আমাদের সঙ্গে এই জুরিখ সিটি ট্যুরে যোগ দেবার জন্য সুইস ট্যুরিজম বিভাগের পক্ষ থেকে আমি পিটার ও পায়লট মাইকেল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।

এটি আড়াইঘণ্টার ভ্রমণ। সিটি ট্যুর হলেও আপনারা জুরিখের উপকণ্ঠে কিছু গ্রাম দেখতে পাবেন। আমরা ঠিক বেলা সাড়ে বারোটায় এখানে ফিরে আসব। আপনারা হোটেলে ফিরে যেতে পারেন কিম্বা নিচের বাজারে গিয়ে লাঞ্চ সেরে নিতে পারেন। তারপরে শহরের পথে পথে পায়চারি করতে পারেন কিম্বা আমাদের যে কোন বৈকালী ভ্রমণে অংশ নিতে পারেন। আজ সোমবার, আজ দুপুর একটায় আমাদের তিনটি ভ্রমণ আছে লুসার্ণ, ব্ল্যাক-ফরেস্ট ও মাউণ্ট সানটিস (Santis)। ভাড়া যথাক্রমে সাঁইত্রিশ, বেয়াল্লিশ ও ঊনপঞ্চাশ ফ্রাঁ। ঠিক বিকেল ছ'টায় আপনারা এখানে ফিরে আসবেন।

ছেলেটি তারপরে ফরাসী ও জার্মান ভাষায় একই কথা বলতে শুরু করেন। মিসেস ত্রিপাঠী স্বামীকে জিজ্ঞেস করেন—দুপুরবেলা হোটেলে ফিরে গিয়ে কি হবে? কোন একটা ট্রিপে যাবে নাকি?

—না। একদিনে দুটো ট্রিপ করে কি হবে? আমরা তো আরও কয়েকদিন আছি এখানে। মিস্টার আপত্তি করেন।

—তাহলেও সারা দুপুর হোটেলে বসে কি করবে? মিসেসের কণ্ঠে উষ্মা।

—হোটেলে যাবো কেন, মিস্টার ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে জুরিখের পথে পথে ঘুরে বেড়াবো।

—সত্যি? মিসেস মধুর কণ্ঠে প্রশ্ন করেন।

মৃদু হেসে মিস্টার উত্তর দেন—হ্যাঁ।

—দাদা আমাদের সঙ্গে থাকছেন তো?

আমি পেছন ফিরে উত্তর দিই—থাকব। দুপুরে জুগ ফিরে গিয়ে আমিই

বা কি করব ?

—থ্যাঙ্ক্‌ ইউ।

ত্রিপাঠীদের কথা নয়, আমি ভাবি গাইডের কথা। নিতান্তই একজন সাধারণ কর্মচারী। তবু তিনি স্বদেশের পর্যটন ব্যবসা প্রসারের জন্য কিরকম আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন!

গাইড ইংরেজী ও ফরাসীর পরে এখন জার্মানে একই কথা বলছেন। নিয়ম অনুযায়ী ও'র জার্মানেই প্রথম বলা উচিত ছিল। তাছাড়া ফরাসী সুইজারল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ভাষা। কিন্তু তিনি প্রথমেই ইংরেজীতে বলে নিয়েছেন। তাই তো বলবেন কারণ তিনি পর্যটন ব্যবসা প্রসারের জন্য কাজ করছেন, ভাষা নিয়ে রাজনীতি করতে আসেন নি। আজ সারা পৃথিবীতেই পর্যটন ব্যবসা মানে ডলার অর্থাৎ আমেরিকান ট্যুরিস্ট্‌ আর তাঁদের মাতৃভাষা ইংরেজী। আমরা নির্বোধ, ইংরেজী জেনেও তা ভুলে যাবার ব্যবস্থা চালিয়ে যাচ্ছি। ভুলে গেলে যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একঘরে হয়ে যাবো, সেকথা ভেবে দেখছি না। ভাবছি না যে আজকের পৃথিবীতে ইংরেজী ভুলে যাওয়া আর আত্মহত্যা করা একই কথা।

গাইড বলছেন—আমরা এখন পশ্চিম থেকে পূবে চলেছি, আমরা জুরিখ শহর দেখছি। এই শহর প্রধানত প্রটেস্ট্যাণ্টদের শহর। কারণ স্থায়ী শহরবাসীদের শতকরা পঞ্চান্নজন প্রোটেস্ট্যাণ্ট। জুরিখ শহরে সতেরোটি রেলস্টেশন আছে। আর আমাদের ট্রেন পৃথিবীর আধুনিকতম। আমাদের দেশের মতো জুরিখেও জিনিসপত্রের দাম মোটামুটি স্থিতিশীল। গতবছরে মাত্র শতকরা ছ'ভাগ মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে। আপনারা জানেন যে আমাদের দেশে বেকার প্রায় নেই বললেই চলে। আমাদের বেকারের সংখ্যা শতকরা মাত্র ০.৮ ভাগ। জনস্বাস্থ্যের দিকে সুইস সরকার সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে থাকেন। এই শহরে এগারোটি হাসপাতাল আছে। তার মধ্যে একটি ক্যান্সার ও একটি চোখের চিকিৎসার জন্য বিশ্ববিখ্যাত। জুরিখ শহরে রান্নাঘর ও বাথরুম সহ একটি দু'কামড়ার ফ্ল্যাটের ভাড়া মাসে ছ'শ' থেকে পনেরো শ' ফ্রাঁ। আমাদের দেশে জনপ্রতি গড় মাসিক আয় দুই থেকে তিন হাজার ফ্রাঁ।...

তার মানে দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর যৌথ আয় বিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকা। অথচ প্রকৃতপক্ষে সুইজারল্যাণ্ড একটি বন্ধ্যা দেশ। খাবার থেকে আরম্ভ করে পেট্রোল পর্যন্ত সবই বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। যেসব শিল্পজাত উৎপাদনের জন্য সুইজারল্যাণ্ড বিখ্যাত, তারও কাচামাল সব বাইরে থেকে আনতে হয়। অথচ দেশবাসীর অধ্যবসায় পরিশ্রম বুদ্ধি ও দেশপ্রেমের ফলে সুইজারল্যাণ্ড আজ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী দেশসমূহের অন্যতম।

বানহোপ স্ট্যাসী ও অন্য একটা রাস্তার মোড়ে এসে বাস থামল। অন্য রাস্তা

নয়, আমি বানহোপ স্ট্র্যাসীর দিকেই চেয়ে থাকি। দু'পাশেই বড় বড় বাড়ি। ছবির মতো সুন্দর সুন্দর দোকান আর অফিস। নানা আকারের বিভিন্ন সাজের দোকান। খেলনা জুয়েলারী ঘড়ি জুতো জামা কাপড় প্রভৃতির দোকান আর রেস্তোরাঁ। মাঝে মাঝে দুয়েকটা ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরস। আমি দেখি আর দেখি।

আমার দেখা শেষ হয় না কিন্তু পায়লটের সময় যায় ফুরিয়ে। বাস চলতে শুরু করে। সামনে তাকাই। আরে এ যে দেখছি ট্রাম। এদিকেই আসছে। কলকাতার ট্রামের মতই তবে অনেক ঝকঝকে তকতকে। আর দু'খানি কোচের গাড়ি নয়, চার কোচের ট্রাম। গাইড বলেন—এখন অফিসের সময় বলে চারখানি কোচ্, দুপুরের দিকে দুখানি কোচ্ কমিয়ে দেওয়া হবে।

যাত্রী যা রয়েছেন, তাতে আমাদের দেশের হিসেবে একখানি কোচই যথেষ্ট।

গাইড কিন্তু ট্রাম বলছেন না, বলছেন স্ট্রীট্কার। তিনি বলছেন—তেরোটি স্ট্রীট্কার লাইন ও পঁয়তাল্লিশটি বাসরুট আছে শুধু জুরিখ শহরের জন্য, এ ছাড়া ট্রেন ও ট্যাক্সি তো রয়েছেই।

—ট্যাক্সিভাড়া কি রকম? জনৈক যাত্রী প্রশ্ন করেন।

গাইড উত্তর দেন—বেশ বেশি। কারণ য়ুরোপে সবচেয়ে বেশি ট্যাক্সিভাড়া সুইডেনের রাজধানী স্টক্হোমে, তারপরেই জুরিখের স্থান। কাজেই আপনারা ট্যাক্সি না চড়লেই ভাল করবেন। তাছাড়া এখানে ট্রেন বাস ও স্ট্রীট্কার এত ভাল এবং বেশি যে ট্যাক্সি চড়ার কোন প্রয়োজন পড়ে না।

আমার ট্যাক্সি চড়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। তবু ভাড়াটা জেনে নেওয়া যাক। তাই জিজ্ঞেস করি—ক্লোটেন বিমানবন্দর থেকে জুরিখ শহর ১১ কিলোমিটার, এর জন্য ট্যাক্সিভাড়া কি রকম?

—তা······অন্তত ১৫ ডলার। আর সেখানে জনপ্রতি ট্রেনভাড়া মাত্র ১৮০ ডলার। ট্রেনে আসতে ১৩ মিনিট সময় লাগে এবং সকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে রাত সওয়া এগারোটা পর্যন্ত বিশ পঁচিশ মিনিট অন্তর অন্তর ট্রেন আছে। আমরা দাবী করি, পৃথিবীর আধুনিকতম রেলব্যবস্থা আমরা গড়ে তুলতে পেরেছি। আপনারা জুরিখ সেণ্ট্রাল স্টেশন দেখেছেন, এটি শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, বয়স শতাধিক বছর। শুধু ট্যুরিস্ট্ অফিস নয়, স্টেশনে পোস্টাপিস ব্যাংক ও সুইস এয়ারের অফিস প্রভৃতি রয়েছে। এখান থেকে আপনারা এক ট্রেনে সাড়ে তিনঘণ্টায় জেনিভা, সাড়ে চারঘণ্টায় মিউনিক, ছয় ঘণ্টায় মিলান (ইতালী), আট ঘণ্টায় প্যারী, দশ ঘণ্টায় ভিয়েনা (অস্ট্রিয়া), চোদ্দ ঘণ্টায় মাদ্রিদ (স্পেন) চলে যেতে পারেন।

—মিস্টার গাইড···

—নো, প্লীজ কল্ মি পিটার।

ভদ্রমহিলা লজ্জা পেয়ে যান। বলেন—আই এ্যাম্ সরি। মিস্টার পিটার,

আপনি আমাদের জুরিখ শহরের ট্রাম-বাস ভাড়া সম্পর্কে যদি একটু ধারণা দেন।

—নিশ্চয়ই। পিটার বলতে শুরু করেন—স্ট্রীট্‌কার কিম্বা বাসে উঠলে প্রথম পাঁচ স্টপেজের জন্য আপনাকে ৮০ সেণ্টাইম ভাড়া দিতে হবে। ষষ্ঠ স্টপেজ থেকে শহরসীমা পর্যন্ত ভাড়া ১২০ ফ্রাঁ। আর আপনি যদি সারাদিন ধরে ঘোরাঘুরি করতে চান, অনেকবার স্ট্রীট্‌কার কিম্বা বাসে চড়তে চান, তাহলে আপনাকে ৩·৫০ ফ্রাঁ দিয়ে একটা ডে-টিকেট করে নিতে হবে। আপনি যদি কয়েকদিন এই এই শহরে থাকেন, তাহলে অবশ্যই 'ডিসকাউণ্ট বুক্‌লেট' কিনে নেবেন। কারণ এই কিনলে এগারোবার পাঁচ স্টপেজের জন্য ৬ ফ্রাঁ ও ও চোদ্দবার শহরসীমা পর্যন্ত যাওয়া কিম্বা আসার জন্য মাত্র ১২ ফ্রাঁ খরচ পড়বে।

—কিন্তু ডিসকাউণ্ট বুকলেট কোথায় পাবো ? জনৈক সহযাত্রী প্রশ্ন করেন।

পিটার উত্তর দেন—যে কোন খবরের কাগজের দোকানে। আরেকটা কথা, আপনারা অবশ্যই আমাদের অফিস থেকে একখানা জুরিখের ম্যাপ চেয়ে নেবেন।

গাইড থামলেন একবার। তারপরে বাইরের দিকে ইসারা করে বলে উঠলেন—লেডিজ এ্যাণ্ড জেণ্ট্‌লমেন, আমরা এখন বানহোপ ব্রিজের ওপর দিয়ে লিম্যাৎ নদী পার হচ্ছি। জুরিখ হ্রদ থেকে সৃষ্ট হয়েছে এই লিম্যাৎ। হ্রদের উত্তর উপকূলে এই নদীর দু-তীরে জুরিখ শহর। নদীর ওপরে এরকম সাতটি পুল রয়েছে। একটি ছাড়া অন্য সব কটি পুলের ওপর দিয়ে গাড়ি যাতায়াত করে।

পুলের ওপর থেকে নদী, হ্রদ ও শহরের দৃশ্য বড়ই মনোরম। কিন্তু ছোট নদী, তার ওপরে জ্যামজট নেই। সুতরাং আমরা ঝড়ের বেগে নদী পার হয়ে এলাম।

নদী পার হবার পরেও কিন্তু নদীর সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচল না। পুল পার হয়ে ডানদিকে মোড় ফিরে আমরা নদীতীরের পথ ধরে দক্ষিণে চলেছি। চলতে চলতে লিম্যাৎকে দেখছি। গাইড বলেন—এ পথের নাম লিম্যাৎ কি (Limmat Quai)। 'কি' মানে তীরপথ।

বানহোপ স্ট্র্যাসীর মতো অতো প্রশস্ত কিম্বা মসৃণ পথ নয়। তাহলেও বড় সুন্দর। একদিকে নদী আরেকদিকে বাড়ি-ঘর। নদীর বুকে অসংখ্য পালতোলা ও দাঁড়-বাওয়া নৌকো, মোটর লঞ্চ ও মোটর বোট ঘুরে বেড়াচ্ছে। গাইড বলেন—এগুলো সবই পর্যটকদের অর্থাৎ আপনাদের জলবিহারের জন্য। আমরা যে পুলের ওপর দিয়ে লিম্যাৎ পার হয়ে এলাম, তার উত্তরে যে পুলটি রয়েছে, সেই পুলের গোড়াতেই লঞ্চঘাট। আপনারা সেখানে গেলেই এই জলবিহারের সুযোগ পাবেন।

বাস এগিয়ে চলেছে, আমরা চলতে চলতে দেখছি। ডানদিকে আরেকটা পুল, গাড়ি যাতায়াত করছে। গাইড বলেন—এই পুলের ওপারে Swiss Handi-

crafts Centre. আপনারা অবশ্যই সময় করে একবার এসে দেখে যাবেন, ভাল লাগবে।……

কথাটা মিথ্যে বলেন নি পিটার। এ দেশের হাতের কাজের বেশ খ্যাতি আছে। বিশেষ করে কাঠের ওপরে খোদাইকাজ, বয়নশিল্প, সূচিশিল্প (Embroidery) ও স্ট্র-পেণ্টিং (Straw painting) বিশ্ববিখ্যাত।

গাইড বলে চলেছেন—আমাদের বাঁদিকে এই যে পথটা পূর্বদিকে চলে গেছে, এই পথে খানিকটা এগিয়ে সারিনগার (Zahringer) মানে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। এই দিকে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলে উনিভেস্নারসিটেট (Universitat) বা বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে একই চৌহদ্দির মধ্যে রয়েছে Zoological and Palaeontological Museum, University Ethnological Museum এবং Swiss Federal Institute of Technology. বিশ্ববিদ্যালয়ের পূবে একেবারে শহরের শেষপ্রান্তে Zoological Gardens, সময় পেলে একদিন দেখে আসবেন।

তেমনি নদীতীরের পথ ধরে বাস এগিয়ে চলেছে। নদীর বুকে আরেকটা পুল। ওপর দিয়ে গাড়ি চলছে। আমরা পুল ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছি।

—লেডিজ এ্যাণ্ড জেণ্টলমেন, এ দেখুন পথের ডানদিকে নদীর তীরে রাটহাউস (Rathaus) বা টাউন হল। এইমাত্র আমরা যে পুলটা পেরিয়ে এলাম, তার নামও রাটহাউস ব্রিজ। আর এখন পথের বাঁদিকে দেখুন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ Guild Halls

গিল্ড হল্স নামটি শুনে কথাটা মনে পড়ে যায়। রেড ক্রশ ছাড়াও সুইজারল্যাণ্ডে বহু সমাজসেবা সংঘ ও যুবপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাঁরা সুইস সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার জন্য কাজ করে চলেছেন। বাজেল (Basel) কার্নিভ্যাল ও জুরিখের সেসেল-লয়টেন (Schselauten) অর্থাৎ বসন্তোৎসব তাঁদের এই মহতী প্রচেষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

লিম্যাৎ কি ধরে বাস এগিয়ে চলেছে। মনেই হচ্ছে না জুরিখ সুইজারল্যাণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টার তথা সুইস শ্রমশিল্পের কেন্দ্র ভূমি এবং তারই কেন্দ্রস্থল দিয়ে আমাদের বাস চলেছে। কেনই বা মনে হবে? জুরিখ যে সবুজ পাহাড়ের মাঝখানে একখানি মুক্তোর মতো! এখানে কারখানা আছে কিন্তু ধোঁয়া নেই, বাড়ি আছে কিন্তু বস্তি নেই। এঁদের সমস্ত কল-কারখানা বিদ্যুতে চলে আর তাই কারখানা আর কলেজ দেখতে একই রকম।

আমি শুধু দেখছি। যেদিকেই তাকাচ্ছি চোখ ফেরাতে পারছি না, কেবল দেখছি আর দেখছি। একটা আধুনিক শিল্পনগরী যে এমন আশ্চর্য মায়াময়ী হতে পারে, তা জুরিখ না দেখলে জানতে পারতাম না। মনে হচ্ছে এ দেখা শুধু দেখা নয়, সেই সঙ্গে শোনা। আমি যেন গান শুনছি, জয়-জয়ন্তী রাগের একখানি অশ্রুতপূর্ব গান—অবিস্মরণীয় সঙ্গীত। আমার জীবনে জুরিখ তাই

চিরকালের জয়ন্তী জুরিখ হয়ে রইল।

—লেডিজ এ্যাণ্ড জেণ্ট্‌লমেন, বাঁদিকে তাকিয়ে দেখুন, গ্রসমুন্‌স্টার (Grossmunster)। মিনার দুটি সহ ওপরের অনেকটা অংশই দেখা যাচ্ছে। এটি জুরিখের একটি বিখ্যাত 'ক্যাথিড্রেল'। একদিন আপনারা এসে দেখে যাবেন কিন্তু!

থামলেন গাইড। আমরা গীর্জাটিকে দেখতে থাকি। গম্বুজ দুটি আর উপরিভাগের গঠননৈপুণ্য দেখে মনে হচ্ছে একবার এসে দেখে যাওয়াই উচিত হবে।

পিটার আবার মাইক হাতে নেন—এবারে আমরা লিম্যাৎ নদীর পশ্চিমপারে যাবো। যে পুল পেরিয়ে ওপারে পেঁছিব, তার নামও মুন্‌স্টার পুল। আর ওপারে পেঁছিবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই আপনারা উপস্থিত হবেন বিশ্ববিখ্যাত জুরিখ হ্রদের তীরে।

ডানদিকে মোড় ফিরে বাস পুলের ওপরে উঠে এলো। পুলের ওপর থেকে জুরিখ হ্রদকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু হ্রদের দিকে এটাই নদীর ওপরে শেষ পুল নয়। এর পরেও আরেকটা পুল আছে। এবং সেটাই নদী ও হ্রদের সঙ্গমে অবস্থিত, গতকাল লুসার্ণে যেমন দেখে এসেছি।

পুল পেরিয়ে বাস বাঁয়ে বাঁক নিল। এতক্ষণ আমরা নদীর পূবতীর দিয়ে এসেছি, এখন পশ্চিমতীর ধরে চলতে শুরু করলাম। গাইড বলছেন—আমাদের ঠিক সামনে তেয়াটার আম হেক্‌টপ্লাট্‌স্ (Theater am Hechtplatz)—জুরিখের একটি বিখ্যাত রঙ্গালয়।

আমরা দেখি। কিন্তু তা ক্ষণকালের জন্য। বেশ জোরে বাস চলেছে। রঙ্গালয় পড়ে থাকে পেছনে।

গাইড বলে চলেছে—এখন আমরা যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, এর নাম স্টাটহাউস কি (Stadthaus Quai) অর্থাৎ মিউনিসিপ্যাল রোড। ডানদিকে তাকিয়ে দেখুন মিউনিসিপ্যাল অফিস আর বাঁদিকে নদীর তীরে মিউনিসিপ্যাল বাড (Bad) অর্থাৎ সুইমিং পুল।

মিউনিসিপ্যাল অফিস ছাড়িয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা জুরিখ হ্রদের তীরে এসে পেঁছিলাম। আর এই সঙ্গে শেষ হল জুরিখ শহরের মধ্যাঞ্চল পরিক্রমা।

তেমাথার মোড়ে এলাম। একটি আমাদের পথ উত্তর থেকে এসেছে, একটি সেই সঙ্গম পুল থেকে, আরেকটি হ্রদের তীর থেকে। হ্রদের তীরে পথের পাশে প্রশস্ত বাঁধানো অঙ্গন। তারই একধারে এসে বাস থেমে গেল। আরও কয়েকখানি বাস এবং অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে পারছি অঙ্গনের এই অংশটা নিশ্চয়ই 'কার-পার্ক'। তা না হলে বাস দাঁড়াতো না। এদেশে সবাই ট্র্যাফিক

আইন মেনে চলেন।

পিটার তাঁর সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে সহযাত্রীরাও কয়েকজন দাঁড়িয়ে পড়লেন। গাইড মুখের কাছে মাইক নিয়ে বলতে থাকলেন—সামনে পায়ারস্ (Piers), জুরিখ হ্রদের তীরে প্রমোদভ্রমণের ঘাট। আর এ জায়গাটি পর্যটকদের বিশ্রামস্থল। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এখান থেকে জুরিখ হ্রদ ও শহরের সৌন্দর্য দর্শন করেন।

—আমরা নামব না একবার! গাইড থামতেই জনৈকা তরুণী প্রশ্ন করেন।

গাইড উত্তর দেন—হ্যাঁ, নামবেন বৈকি। কিন্তু তার আগে একটা কথা···

—বেশ, বলুন।

—সবাই ঘড়ি দেখে নিন। ঠিক বিশ মিনিট পরে বাস ছাড়বে। আপনারা তার আগে গাড়িতে ফিরে আসবেন। যদি কেউ দেরি করেন, তাহলে কিন্তু বাস পাবেন না, আমরা চলে যাবো।

গাড়ির দরজা খুলে যায়। সহযাত্রীরা গুঞ্জন তোলেন, নামতে শুরু করেন।

—আপনি নামবেন না দাদা? মিসেস ত্রিপাঠী জিজ্ঞেস করেন আমাকে।

উত্তর দিই—হ্যাঁ, নামব বৈকি। চলুন নামা যাক।

আমরা নেমে আসি বাস থেকে। সুপ্রশস্ত বাঁধানো প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণে শিরীষ শাখার উচ্ছ্বাস নেই, কিন্তু লাল সাদা হলুদ গোলাপী ফুলের সমারোহ রয়েছে। আর রয়েছে বসার জায়গা। আমরা তারই একখানি বেঞ্চির ওপরে এসে বসি।

সামনে সুবিশাল শান্ত হ্রদ। হ্রদের তিন তীরেই অনেকটা জায়গা জুড়ে সারি সারি বাড়ি। তারপরে সবুজ পাহাড়ের সারি।

হ্রদের বুকে অসংখ্য রাজহাঁস আর জলযান—নৌকো মোটরবোট ও স্টীমার। কয়েকখানি স্টীমারকে জাহাজ বলা উচিত হবে। সবই পর্যটকদের জন্য। সত্যই কি প্রভূত আয়োজন! আমি অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকি।

—সন্ধ্যার পরে এলে আরও ভাল লাগে। মিঃ ত্রিপাঠী বলেন—তখন তীরের বাড়ি ও পথের লাল নীল সাদা সবুজ রঙের আলোগুলো হ্রদের বুকে প্রতিফলিত হয়ে এক অপরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করে।

ত্রিপাঠী হয়তো ঠিকই বলেছেন। কিন্তু সোনালী রোদেও হ্রদকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। আমি তাই নীরবে তাকিয়ে থাকি আর ভাবি, নিজের সৌভাগ্যের কথা, বাবা বিশ্বনাথের করুণার কথা, আমার বাবুজীর সীমাহীন স্নেহের কথা। আজ বাবুজি সঙ্গে থাকলে জুরিখ হ্রদ আরও সুন্দর হয়ে উঠত।

—প্রায় দশ মিনিট তো শেষ হতে চলল। মিসেস ত্রিপাঠী হঠাৎ বলে উঠলেন—এখুনি বাসে যেতে হবে। তুমি তাড়াতাড়ি তিনটে আইসক্রিম নিয়ে এসো।

—আই এ্যাম্ সরি! মিঃ ত্রিপাঠী প্রায় লাফিয়ে ওঠেন। এবং লাফাতে লাফাতেই আইসক্রিম আনতে ছুটলেন। খানিকটা দূরে একটা আইসক্রিম স্টল

রয়েছে।

মিসেস ত্রিপাঠী আমার দিকে একটু এগিয়ে বসে বলেন—আপনি ভারতীয় এবং আমাদের দুজনের চেয়ে বয়সে বড়। আপনি কেন আমাকে মিসেস ত্রিপাঠী বলে ডাকছেন দাদা! প্লীজ, আপনি আমাকে নাম ধরে ডাকবেন, আমার নাম ললিতা।

কাজটা খুব সহজ নয়, তবু মাথা নেড়ে বলি—চেষ্টা করব।

—চেষ্টা নয় দাদা, ডাকতেই হবে। আর আপনি নয়, তুমি বলতে হবে।

—বেশ, বলব। আচ্ছা একটা কথা তোমাকে কাল জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম। কিন্তু পাছে কিছু মনে করো, তাই আর বলতে পারি নি।

—মনে করব! কি এমন কথা?

—তোমরা তো দুজনেই ট্যুর করছ?

ললিতা মাথা নাড়ে।

আমি প্রশ্ন করি—বাচ্চাদের কার কাছে রেখে এসেছো?

—বাচ্চাদের! কার বাচ্চা? আমার?

আমি মাথা নাড়ি।

ললিতার মুখখানি মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে যায়। সে একটুকাল চুপ করে থাকে। তারপরে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে ওঠে—বাচ্চা থাকলে তো তাকে রেখে আসব দাদা! কৌশিক আমাকে বাচ্চা দিতে পারে নি।

প্রসঙ্গটা এমন পর্যায়ে পেঁছিতে পারে ভাবতেও পারি নি। কথাটা না জিজ্ঞেস করলেও কোন ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এখন পিছু হটলে চলবে না। তাই সহানুভূতির স্বরে বলি—কি আর করবে বোন, ভগবান না দিলে…

—না, না, না। এটা সেকালের মানুষদের বোঝাবার জন্য একটা মিথ্যে সান্ত্বনা। ভগবানের দোহাই দিয়ে আমাকে ভোলাতে পারবেন না।

কি বলব বুঝতে পারছি না। তাই চুপ করে থাকি। ভাবি, কি ভুলই না করলাম। মেয়েটার এমন একটা আনন্দময় দিন মাটি করে দিলাম।

ললিতা আবার বলে—অবশ্য আমার এই দুর্ভাগ্যের জন্য কেবল কৌশিককে দায়ী করা উচিত হবে না। ভুল আমিও করেছি। বিয়ের পরই চলে এলাম ম্যাঞ্চেস্টার। আত্মীয়-গুরুজন কেউ নেই, ঝি-চাকর নেই, কেবল আছে টাকা, অনেক টাকা। আমি মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, এত টাকা আমার হতে পারে, কোনদিন ভাবতেও পারি নি। তার ওপর চারিপাশের পরিবেশ, এমন কি কিছু ভারতীয় পরিবারকে পর্যন্ত পার্টিতে দেখে মনে হত, এই তো বেশ আছি। কেন আবার সন্তানধারনের কষ্ট, সন্তানপালনের ঝামেলা? তার চেয়ে এই ভাল।

য়ুরোপ আমেরিকার দম্পতিদের মতই আমরা বার্থ কণ্ট্রোলের সাহায্য নিলাম। তখন বুঝতে পারি নি, তার ফলে আমার মাতৃত্বের তৃষ্ণা অতৃপ্ত থেকে যাবে। এবারেও লণ্ডনে আমরা বড় ডাক্তার দেখিয়েছিলাম।……

—তিনি কি বললেন ?

—বললেন, আমি কখনও কৌশিকের সন্তানের মা হতে পারব না।

ললিতা আঁচলে চোখ মোছে। সে কাঁদছে। গতকাল রিগিতে দেখা হবার পর থেকে ভেবে আসছিলাম, এরা সুখী দম্পতি। এই হাসি-খুশি মেয়েটির বুকের মাঝে এমন অতৃপ্তির জ্বালা, তা ভাবতেও পারি নি।

ললিতা আবার বলে—দেশে আমাদের দুজনেরই মা-বাবা, ভাই-বোন আছে। কৌশিক কম্প্যানী থেকে বছরে একবার করে সপরিবারে দেশে যাওয়া-আসার যাবতীয় খরচ পায়, ওর ছুটিরও কোন অসুবিধে নেই। তবু তিন বছর হল আমরা দেশে যাই না।

—কেন ?

—গেলে সবাই যে একই প্রশ্ন করে। তাছাড়া শ্বশুর-শাশুড়ীকে মুখ দেখাতে বড় লজ্জা লাগে আমার !

খুবই স্বাভাবিক। আমাদের সমাজে আজও সন্তানহীনা বধূ সকলের অনুকম্পার পাত্রী। সব পেয়েও ললিতা কিছুই পায় নি। তাই ওকে আমি কি সান্ত্বনা দেব ? আমি কেবল সর্বদুঃখহারী পরমকরুণাময়ের কাছে ললিতার শান্তি কামনা করি।

আবার বাস এগিয়ে চলেছে। সহযাত্রীরা সকলেই মৃদুকণ্ঠে হাসি-ঠাট্টা গালগল্প করছেন। মিস্টার ত্রিপাঠীও মাঝে মাঝে কথা বলছেন, আমি সাড়া দিচ্ছি। কিন্তু ললিতা নির্বাক। এবারে বাসে ওঠার পরে সে একটাও কথা বলে নি। চুপ করে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে।

এতে অবশ্য আপত্তি করার কিছু নেই। বাইরের দৃশ্য সত্যই তাকিয়ে থাকবার মতো। পায়ার্স থেকে বাস হ্রদের তীরপথ ধরেছে। রাস্তাটার নাম General Guisan Quai—পথটি পশ্চিমে প্রসারিত।

এবারে রওনা হবার একটু পরেই আমরা বানহোপ স্ট্র্যাসীর মোড় পেরিয়েছি। জুরিখ সেণ্ট্রাল রেলস্টেশনের কাছ থেকে শুরু হয়ে পথটা ওখানে হ্রদের তীরে এসে শেষ হয়েছে।

বানহোপ স্ট্র্যাসী ছাড়িয়ে পিটার পথের ডানদিকে দেখিয়েছেন 'Concert Hall/Congress House.'

এখন পথের ডাইনে আধুনিক ডিজাইনের বড় বড় বাড়ি আর বাঁয়ে হ্রদ, জুরিখ হ্রদ। তারই তীরে তীরে পথ চলেছি আমরা।

পথটা বাঁয়ে বাঁক নিয়ে দক্ষিণমুখী হয়েছে। পিটার বলে উঠলেন—এখানেই জেনারেল গুইসান কি শেষ হয়ে গেল, শুরু হল মাইথেন কি (Mythen Quai) আর এখানেই হ্রদের উত্তরতীর ফুরিয়ে গেল। আমরা এখন হ্রদের পশ্চিমতীর

ধরে দক্ষিণে চলেছি।

একবার থামেন পিটার। তারপরে আবার বলেন—জুরিখ হ্রদের উত্তরপারেই জুরিখ শহরের সমৃদ্ধতম অংশ। কিন্তু উত্তরতীর খুবই সংকীর্ণ, কারণ হ্রদটি পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ।

—আমরা যেখানে বাস থামিয়েছিলাম, এখান থেকে সেই পর্যন্ত বোধ হয় হ্রদের উত্তরপার? জনৈকা সহযাত্রিণী প্রশ্ন করেন।

পিটার উত্তর দেন—না, ঠিক সে পর্যন্ত নয়, লিম্যাৎ নদীর ওপার পর্যন্ত উত্তরপার।

বাস ছুটে চলেছে। পথের প্রকৃতি একই রকম। সমতল ও মসৃণ ঝকঝকে পথ। হ্রদের এই পশ্চিমতীরেও অনেকটা পর্যন্ত জুরিখ শহর। তাই আমাদের ডানদিকে বাড়িঘর আর বাঁদিকে হ্রদ।

হ্রদের তীরভূমি বাঁধানো। সেখানে কোথাও বুট্‌জহয়জার (Bootshauser) বা Boathouse, অথবা হাফেন (Haifen) বা Harbour অর্থাৎ প্রমোদতরী ভাড়া নেবার জায়গা, কোথাও Badanstalt বা Strandad অর্থাৎ সুইমিং পুল বা সাঁতার কাটার জায়গা, কোথাও Seepolizel অর্থাৎ হ্রদের পুলিশচৌকি আবার কোথাও বা Sea restaurant অর্থাৎ হ্রদের বুকে ভাসমান রেস্তোরাঁ। আর 'কার-পার্ক' বা গাড়ি রাখার জায়গা তো রয়েছেই। কারণ এদেশে মানুষ আছে অথচ গাড়ি নেই, এটি হবার নয়।

পায়ার্স থেকে রওনা হবার মাত্র মিনিট পনেরোর মধ্যে জুরিখ শহর শেষ হয়ে গেল, আমরা শহরতলীতে পৌঁছে গেলাম।

কেনই বা পৌঁছব না। তেলের মতো মসৃণ পথ, কোথাও জ্যামজট নেই। ঝড়ের বেগে বাস ছুটছে। পনেরো মিনিটে কম করেও বিশ-পঁচিশ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে এসেছি।

এখন পথের পাশে গ্রাম, ছবির মতো মনোরম। সবুজ গ্রামাঞ্চলের পাশ দিয়ে বাস চলেছে। গ্রামের বাড়িগুলো সবই দোতলা এবং পাশাপাশি এক জায়গায়। এক গ্রামের বাড়িগুলো সব একরকম—বাংলো টাইপের দোতলা বাড়ি। বাড়ির সামনে পথ আর পথের পাশে ক্ষেত, বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এক জায়গায় বাড়ি তৈরির কারণ বোধ করি, বাড়ির জন্য এঁরা বেশি জমি নষ্ট করেন নি।

গ্রামে বাজার ও পেট্রোল-পাম্প। দেখে মনে হচ্ছে এটি কৃষিপ্রধান গ্রাম। কিন্তু প্রায় প্রতি বাড়ির সামনেই মোটর গাড়ি।

শুনেছি ক্ষেতে জল দেবার জন্য নাকি এঁরা এমন সুন্দর সেচব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন যে ঘরে বসে সুইচ টিপলে ক্ষেতে জল দেওয়া হয়ে যায়।

গ্রামের চারিদিকেই ক্ষেত অথবা সবজি বাগান। ক্ষেতের মাঝে মাঝে খানিকটা জায়গা জুড়ে বড় বড় গাছের জটলা। এক কথায় ক্ষেতের মধ্যে বন। সেখানে ফসল ফলছে না, তবু এঁরা সযত্নে বনগুলি রেখে দিয়েছেন। কারণ প্রাকৃতিক

স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য অরণ্য অপরিহার্য।

যেখানে ক্ষেতের বদলে বড় গাছ, সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য কিন্তু আরও রমণীয়। ঘাসে ছাওয়া সমতল কিম্বা উঁচু-নিচু প্রান্তর জুড়ে বনস্পতির চন্দ্রাতপ, চড়ুইভাতির আদর্শস্থল। দেখে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে বন্ধ্যা প্রান্তরের পাশ দিয়ে বাস ছুটে চলেছে। পথের পাশে ঘাসে ছাওয়া টিলা। ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে লাল-হলুদ ছোট ছোট ফুল আর বড় বড় সবুজ গাছ। দূরে কালো পাহাড়ের ঢেউ। এসব জায়গায় চাষ হয় না, ফল ফলে না। কিন্তু অপরূপ রূপ পথিকের প্রাণ আকুল করে তোলে।

আবার উপত্যকা, প্রায় দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত সমতল সবুজ উপত্যকা। উপত্যকা জুড়ে ক্ষেত, কোথাও গম কোথাও সবজি কোথাও বা অন্য কোন ফসল। দেখে চোখ সার্থক হচ্ছে।

অনেকক্ষণ কথা বলেন নি পিটার। বোধ করি শক্তি সঞ্চয় করে নিচ্ছিলেন। এবারে শুরু করেন—লেডিজ এ্যান্ড জেন্ট্‌লমেন, আপনারা এখন সুইজারল্যান্ডের পল্লীঅঞ্চল দেখছেন। দেখে আশা করি ভালই লাগছে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে, কৃষিসম্পদে আমরা বড়ই দরিদ্র। খাবার আমাদের বিদেশ থেকে আনতে হয়। দেশের মানুষদের শতকরা মাত্র ৭ জন কৃষিজীবী। বাকি ৯৩ জন কলকারখানা কিম্বা অফিসে কাজ করেন।

আপনারা সবাই জানেন যে সুইজারল্যান্ডের জনসংখ্যা ৬৫ লক্ষ। কিন্তু গতবছর শুধু জুরিখ শহরেই ২০ লক্ষ বিদেশী পর্যটক পদার্পণ করেছেন।

—আর আপনাদের সারা দেশে? জনৈকা সহযাত্রী প্রশ্ন করেন।

পিটার উত্তর দেন—৯০ লক্ষ।

—সে কি! আপনাদের মোট জনসংখ্যার…

—প্রায় দেড়গুণ। এবং আশা করছি এবছর আমাদের দেশে এক কোটি বিদেশী পর্যটক আসবেন। আর তাতে আমরা একেবারেই বিব্রত বোধ করব না। আমরা তাঁদের আশ্রয় ও খাদ্য যোগাতে পারব। পরিবহনের ব্যবস্থা করতে পারব।

পিটারের কথা শুনে সত্যই বিস্ময় বোধ করছি। ৬৫ লক্ষ মানুষের দেশে বছরে এক কোটি পর্যটক আসছেন, আর আমাদের ৭০ কোটি মানুষের দেশে যাচ্ছেন মাত্র ৯/১০ লক্ষ। আয়তনে সুইজারল্যান্ড ভারতের আশি ভাগের এক ভাগ। তার মানে বছরে আমাদের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে পর্যটক যান ০ ২৬ জন আর এদেশে আসেন ১৬০ জন।

পিটার এখন চুপ করে আছেন। আর তাই বোধ হয় পায়লট টেপ বাজাচ্ছেন। একটা সুইস কনসার্ট বাজছে। শুনতে মন্দ লাগছে না।

হ্রদের তীরপথ বোধ করি শেষ হয়ে গেল। কারণ আমরা এখন ডাইনে মোড় ফিরে পশ্চিমে চলেছি। জুরিখ শহর ছাড়িয়ে এসেছি বেশ কিছুক্ষণ, এখন

জুরিখ হ্রদও পড়ে রইল পেছনে।

কয়েক মিনিট চলার পরে একটা ছোট হ্রদের পাশে পেঁছলাম। টেপ বন্ধ করে পিটার বলেন—এই হ্রদের নাম টুয়েলার (Tueller)। এটি বিশ মিটার গভীর, কিন্তু চড়া পড়েছে বলে মাঝখান দিয়ে হেঁটে পারাপার করা যায়।

হ্রদ থেকে কিছুদূর এগিয়ে একটা 'ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড'। বেশ বড় একটি মাঠ জুড়ে 'এলুমিনিয়াম্-হাট্স', ছোট ছোট ঘর। অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

পিটার বলেন—যেসব পর্যটক প্রকৃতির কোলে থাকতে ভালোবাসেন, তাঁরা জুরিখ থেকে গাড়িভাড়া করে এখানে চলে আসেন। এর প্রত্যেকটি ঘরে জল আলো ও রান্নার ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া এখানে রেস্তোরাঁও রয়েছে।

ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড ছাড়িয়ে এলাম, কিন্তু পিটার থামলেন না। সত্যি মানুষটা আমাদের জন্য কি পরিশ্রমই না করে চলেছেন। তিনি বলছেন—ঐ দেখুন, সামনের পাহাড়টার ওপরে রিগি-কুলম দেখা যাচ্ছে।

—কোথায়? ললিতা হঠাৎ বলে ওঠে।

আমি ইসারা করে দেখিয়ে দিই। সে তাকিয়ে থাকে। কি দেখছে, কি ভাবছে ললিতা?

আমি ভাবি, মাত্র গতকাল ওখানেই ওর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। আর আজই সে অকপটে আমার কাছে নিজের জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যাটার কথা বলে ফেলল! কেন বলল? দুঃখে না ক্ষোভে?

কিন্তু থাক্‌গে ললিতার কথা। তার চেয়ে রিগিকে দেখা যাক। গতকাল এরও পরে আমরা রিগিতে পেঁচৌছি। বাবুজি আমার সঙ্গে ছিলেন। আজ বাবুজি আসেন নি, তিনি জুগে রয়ে গিয়েছেন। এখন বোধ করি বিড়লাজীর সঙ্গে গল্প করছেন।

একটা বনময় পাহাড়ের গিরিশিরা বেয়ে বাস ওপরে উঠছে। অনেকটা উঠে এসেছি, উত্তরে চলেছি। আমি আলপ্‌স পর্বতমালায় বিচরণ করছি। আলপ্‌স আমাকে কেবলি হিমালয়ের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। হিমালয় যে আমার মনের মুকুর, হৃদয়ের অন্তস্তল আর প্রাণের প্রাণ।

—জুরিখ! সহসা জনৈক সহযাত্রী প্রায় চিৎকার করে ওঠেন।

সত্যিই তাই। এখান থেকে দূরের সমতলের বুকে জুরিখ শহরকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। শুধু শহর নয়, সেই সঙ্গে নদী আর হ্রদ। আমরা দেখি, শুধু দেখি আর দেখি। সত্যিই ভারী সুন্দর, মনে হচ্ছে রঙীন চলচ্চিত্র দেখছি।

একটু বাদে প্রকাণ্ড পার্কের সামনে এসে বাস থামল। পার্কটা পথের পাশে হলেও অনেকটা উঁচুতে।

পিটার আবার মাইক হাতে নিলেন। আমরা তাঁর দিকে তাকাই। তিনি বলেন—এ জায়গার নাম টলউট গেফার। (Tollwut-Gefahr)। এটা একটা Deer Park—আপনারা বাস থেকে নেমে একটু পায়চারি করে নিতে পারেন।

আমরা এখানে কিছুক্ষণ থামব।

—কতক্ষণ? একজন সহযাত্রী জিজ্ঞেস করেন।

পিটার উত্তর দেন—আধঘণ্টা।

সবাই খুশি হন। সবার সঙ্গে আমরাও নেমে আসি গাড়ি থেকে। পথের ডানদিকে খানিকটা উঁচুতে তারকাঁটার বেড়া। বেড়ার ভেতরে বনময় পাহাড়ী এলাকা, ঘাস ঝোপঝাড় আর বড় বড় গাছ। পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দুটি তিব্বতী চোর্তেন বা দোলমঞ্চের মতো করা হয়েছে। ভেতরে কি আছে দেখতে পাচ্ছি না। কেবল দেখছি কয়েকটা হরিণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভেতরে যাবার উপায় নেই। কিন্তু পথের ধারে বসবার বেঞ্চি রয়েছে।

আমরা না বসে এগিয়ে চলি। মিনিট দুয়েক হাঁটার পরেই পথটা প্রশস্ত একফালি বাঁধানো চত্বর তথা কার-পার্ক-এ পরিণত হল। সেখানে বহু গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। চত্বরের ধারে কয়েকটি দোকান ও একটা রেস্তোরাঁ।

তখন ত্রিপাঠী আমাকে আইসক্রিম খাইয়েছেন। আমারও কিছু খাওয়ানো উচিত। বলি—চলুন, ভেতরে গিয়ে এক কাপ করে কফি খাওয়া যাক।

ললিতা আপত্তি করে না। আমরা সুসজ্জিত রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করি।

কেন যেন ললিতা প্রায় একচুমুকে কফি শেষ করে উঠে দাঁড়ায়। ওর দিকে তাকাই। সে বলে—আমি গাড়িতে চলে যাচ্ছি, আপনারা আসুন।

আমাদের সম্মতির অপেক্ষা না করেই সে বেরিয়ে যায় রেস্তোরাঁ থেকে। কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই ঘটনাটা ঘটে গেল আর তার জন্য লজ্জা পেলেন কৌশিক। অসহায়ের মতো একটু হেসে বললেন—বড়ই খেয়ালি আর ভাবপ্রবণ। বারো বছর ধরে আমাকে ওর খেয়াল যুগিয়ে চলতে হচ্ছে। কি করব বলুন, একে বিদেশে পড়ে থাকতে হচ্ছে, তার ওপরে ছেলেপুলে হল না।

—তা একটা চাকরি যোগাড় করে দেশে ফিরে গেলেই পারেন!

—চাকরি হয়তো যোগাড় করা যেতে পারে, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে জীবনযাত্রার মান নিচু হয়ে যাবে, standard বজায় রাখতে পারব না। এতকাল বিদেশে বাস করে কতগুলো সুখ-স্বাচ্ছন্দে আমরা এমনই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি যে এখন সেগুলো না পেলে অশান্তি অনিবার্য। তাছাড়া ললিতার পক্ষে দেশে ফিরে adju t করা আরও কঠিন।

—কেন বলুন তো?

—আমার এবং ওর ভাইবোনদের সবারই ছেলেমেয়ে আছে। কাজেই ওর পক্ষে দেশে ফিরে সবার সঙ্গে মানিয়ে চলা খুবই কঠিন।

কি বলব? নিঃশব্দে কফিতে চুমুক দিতে দিতে ভাবি, কি বিচিত্র এই জগৎ! সকালে সিলভিয়া বলেছে, সন্তানধারণ ও সন্তানপালন আদিমযুগের ব্যাপার। আর দুপুরে শুনছি, মা না হতে পারার জন্য ললিতা দেশত্যাগী হয়েছে।

বেরিয়ে আসি রেস্তোরাঁ থেকে। এগিয়ে চলি বাসের দিকে। সেই একই কথা ভেবে চলি, জগতে কত রকমের সমস্যা, আমরা তার কতটুকু জানি? দেশে বসে ভাবি, য়ুরোপ আমেরিকায় কত সুখ কত শান্তি। সেখানে যাঁরা চাকরি-বাকরি করেন, তাঁরা কত আনন্দে আছেন। আজ সিলভিয়া আর ললিতা আমাকে আবার জানিয়ে দিল সুখ প্রাচুর্যের মুখাপেক্ষী নয়, শান্তি ঐশ্বর্যের ওপর নির্ভরশীল নয়।

বাস এগিয়ে চলেছে। সেই পাহাড়ী পথ। আমরা আরও ওপরে উঠছি।

বেলা সাড়ে এগারোটার সময় একফালি ভারী সুন্দর প্রশস্ত জায়গায় এসে বাস থেমে গেল। একটু অবাক হয়ে সবাই পিটারের দিকে তাকালাম।

পিটার বলেন—এটা একটা কেব্‌ল্‌কার স্টেশন, নাম Felsenegg। কিন্তু সেজন্য গাড়ি থামাই নি। সামনে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখুন, জুরিখ শহরকে কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে! এখানে পাঁচ মিনিট থামব। যাঁরা ছবি নিতে চান, চট করে নেমে গিয়ে তুলে নিয়ে আসুন।

পাঁচ মিনিট বলার জন্যই বোধ করি য়ুরোপে এসে এই প্রথম হুড়োহুড়ি দেখতে পেলাম। আমার অধিকাংশ সহযাত্রীর সঙ্গেই ক্যামেরা রয়েছে। তাঁরা অনেকেই একসঙ্গে বাস থেকে নামতে চাইছেন। একটু ভিড় কমলে আমি ও ত্রিপাঠী নেমে আসি পথে। ললিতা গাড়িতেই বসে থাকে।

পিটার ঠিকই বলেছেন। সত্যই দুটি নদী ও হ্রদের তীরে জুরিখ শহরকে ছবির মতো মনে হচ্ছে এখান থেকে। মনে হচ্ছে নিচের সারা উপত্যকা জুড়ে কেউ একখানি রঙ্গীন ছবি এঁকে রেখেছেন।

ছবি তুলে ফিরে আসি গাড়িতে। বাস চলতে আরম্ভ করল। আমি কিন্তু জুরিখের দিকেই তাকিয়ে থাকি। তাকে দেখে যে আশ মেটে না।

—লেডিজ এ্যান্ড্ জেন্ট্‌লমেন……। পিটার আবার মাইক হাতে নিয়েছেন। তিনি বলছেন—একটু বাদেই আমরা পাহাড় থেকে নিচে নামতে শুরু করব। সমতলে পেঁছবার কিছু পরে সীল (Sihl) নদীর তীরে পেঁছব। তারপরে পুল পেরিয়ে সীল ও লিম্যাৎ নদীর মাঝখানের অংশে উপস্থিত হব। হ্রদের উত্তরতীরে এই দুই নদীর মাঝখানে দ্বীপের মতো ভূখণ্ডেই জুরিখ শহরের প্রথম পত্তন হয়েছিল। চারিদিকে জল দিয়ে ঘেরা ভূখণ্ডটি বাইরের আক্রমণ থেকে নিরাপদ ছিল বলেই এখানে জনপদ গড়ে উঠেছিল। আপনারা যাঁরা প্যারী গিয়েছেন, তাঁরাও জানেন যে স্যেন (Seine) নদীর দ্বীপে প্রথম প্যারী শহরের পত্তন হয়, তারপরে দুদিকে শহর বিস্তৃতিলাভ করে। জুরিখের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

জুরিখ শহরের তিনদিকেই এইরকম পাহাড় আর পাহাড়তলীর নিচু জমি। বলা বাহুল্য এসব জায়গায়ও জনপদ গড়ে উঠেছে। কিন্তু এগুলো গ্রাম, এগুলো জুরিখ শহরের অন্তর্ভুক্ত নয়। চারিপাশে এইসব গ্রাম নিয়ে জুরিখ

শহরের জনসংখ্যা সাত লক্ষের ওপরে।

জুরিখ প্রায় দু হাজার বছরের শহর। লিনডেনহফ্ স্কোয়ার থেকে এই শহরের শুরু। আপনারা যখন পায়ে হেঁটে শহর দেখবেন, তখন অবশ্যই লিম্যাৎ নদীর তীরে ছায়াঘেরা সবুজ লিনডেনহফ্ স্কোয়ারটি দেখবেন। ওখানেই খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রোমানদের একটা 'কাস্টমস হাউস' ছিল। পরবর্তীকালে তাঁরা সেটিকে দুর্গে পরিণত করেন। চারশ' বছর পরে এ্যালেমান-রা (Alemanni) এসে রোমানদের পরাজিত করে দুর্গটি দখল করে নেন। নবম শতাব্দীতে রোমানদের পরিত্যক্ত স্থানে একটি প্রাসাদ নির্মিত হয়। একাদশ শতাব্দীতে জুরিখ জার্মান রাজাদের প্রিয় মিলনভূমিতে পরিণত হয়। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে জুরিখ রেশম ও পশমের ব্যবসায় ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠতে শুরু করে। চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নাইট (Knight) এবং ব্যবসায়ীরা একটি শক্তিশালী সংঘ (Guild) গঠন করে শহরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এবং অবশেষে ১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা কনফেডারেশনে যোগদান করেন। তারপর থেকে জুরিখ আর কখনো পেছনে তাকায় নি, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে সমানে এগিয়ে চলেছে।

বেলা ঠিক সাড়ে বারোটায় ট্যুরিস্ট অফিসের সামনে এসে বাস থামল। বাস থেকে নামার সময় দেখছি প্রায় সকলেই পায়লটের সামনে একখানি প্লাস্টিকের প্লেটের ওপরে পয়সা দিচ্ছেন। পয়সা মানে দশ-বিশ সেণ্টাইম নয়। অন্তত এক ফ্রাংক্। অর্থাৎ আমাদের পাঁচ টাকা।

আমি কৌশিকের দিকে তাকাই। তিনি কানে কানে বলেন—য়ুরোপে ঘুষ নেই কিন্তু 'টিপ্স' আছে, আর সেটা এসব ক্ষেত্রে প্রায় বাধ্যতামূলক। অন্তত একটা ফ্রাংক দিয়ে দিন, নইলে বড্ড খারাপ দেখাবে। এঁরা ভাববেন, আমরা ইণ্ডিয়ানরা দরিদ্র অথবা কৃপণ। আমাদের পয়সা নেই অথবা হাত দিয়ে জল গলে না।

অতএব ভারতবাসীর সম্মানার্থে একটি ফ্রাংক্ প্লেটের ওপর রেখে দিই। তারপরে মুখে একটু কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে পিটার ও পায়লটের সঙ্গে করমর্দন করে নেমে আসি বাস থেকে।

হঠাৎ ললিতা জিজ্ঞেস করে—দাদার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে?

—শুধু আমার কেন, তোমাদেরও তো পেয়েছে!

—তাহলে চলুন, নিচের বাজার থেকে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।

—কিন্তু তুমি বলেছিলে, আবার একটা 'ইভ্নিং ট্রিপ' করবে, তাহলে তো এখুনি টিকেট নিয়ে নিতে হয়।

—না, আজ আর ট্রিপ নয়, কাল হবে। ললিতা উত্তর দেয়।

কৌশিক জিজ্ঞেস করেন—আপনি ট্রিপ করবেন কি?

উত্তর দিই—না। তার চেয়ে চলুন, নিচের বাজারে যাওয়া যাক। খাওয়াও হবে, বাজারটাও দেখা যাবে।

—দেখার মতই বটে। কৌশিক মন্তব্য করেন।

আমরা স্টেশনে আসি। সকালে সিল্‌ভিয়ার সঙ্গে যে এসক্যালেটার দেখে গিয়েছি, তাতে চড়েই নেমে আসি নিচে।

হ্যাঁ, সত্যই পাতাল বাজারে উপস্থিত হয়েছি। টাইল্‌স বসানো ঝকঝকে পথ। মূল পথটি বারো-চোদ্দ ফুট চওড়া। সেই পথ থেকে প্রতি দু'সারি দোকানের পরে দশ-বারো ফুট চওড়া একটি পথ বানহোপ স্ট্র্যাসীর দিকে প্রসারিত। প্রতি পথের দু-পাশেই সারি সারি দোকান। গড়নটা আমাদের নিউমার্কেটের মতো হলেও তার চাইতে অনেক বেশি চোখ-ধাঁধানো। আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তো বটেই। দোকানগুলি যেমন আলো-ঝলমল, তেমনি সুন্দর করে সাজানো। মাটির নিচে বাজার। সুতরাং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। স্ন্যাকস-বার থেকে জুয়েলারী শপ পর্যন্ত সব রকমের দোকানই রয়েছে।

খাওয়া পরে হবে, আগে একটু দেখে নিই। সত্যি ভারী সুন্দর। দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি। চলতে চলতে দেখি। দু'পাশে আলোঝলমল দোকান আর নানা দেশের পর্যটক। অনেকেই কেনাকাটা করছেন। ঘড়ির দোকানেই ভিড় বেশি। তাই হবে। কারণ পর্যটন জগতের জনপ্রিয় প্রবাদ—'You can't leave Europe without seizing the opportunity to buy a Swiss watch.'

তবে শুনেছি, জুরিখ থেকে নাকি লুসার্নে ঘড়ি কেনা সুবিধে। পঁচিশ-পঞ্চাশ ডলারে অর্থাৎ আড়াইশ' থেকে পাঁচশ' টাকায় পছন্দসই ভাল ঘড়ি পাওয়া যায়।

আমার অবশ্য এসব ভাবনা অর্থহীন। পাঁচশ' ডলার সম্বল করে যে মানুষ য়ুরোপ ভ্রমণে এসেছে, তার কাছে পঁচিশ ডলার যখের ধন।

বলা নেই কওয়া নেই ললিতা গিয়ে একটা দোকানে ঢুকে পড়ল। কৌশিক কোন আপত্তি করেন না। কারণ ভারতীয় হলেও বিদেশী মুদ্রার অভাব নেই তাঁর। অতএব আমরাও ললিতার পেছনে দোকানে আসি।

না, ললিতা ঘড়ির কাউন্টারে যায় না, সে ক্যামেরা বিভাগে এসে উপস্থিত হয়। লন্ডনে ক্যামেরাটি চুরি গিয়েছে। একটা ক্যামেরা ওদের খুবই দরকার।

দেখাশোনার পরে ললিতা 'হট্‌ শট' টাইপের একটা ছোট ক্যামেরা পছন্দ করে। ফ্ল্যাশ ব্যাটারী ও ফিল্মসহ ৩১ ফ্রাঙ্ক দাম পড়ে। আমাদের হিসেবে মাত্র ১৫৫ টাকা। খুবই শস্তা বলতে হবে। আর এই জাতীয় ক্যামেরায় সুবিধেও অনেক। পকেটে নিয়ে চলা-ফেরা করা যায়, চটপট ছবি ওঠে। এবং একটা ফিল্মে চব্বিশটা ছবি আসে। বিদেশী পর্যটকদের অনেকেরই দেখছি এই ধরনের

একটা ক্যামেরা রয়েছে। আমার 'ইয়াসিকা-৬৩৫' বড়ই ভারী আর একটা ফিল্মে মাত্র বারোখানি ছবি ওঠে।

তাহলেও ক্যামেরা কেনা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। আমার কাছে ৩১ ফ্রাঁ অনেক টাকা। অতএব ওদের সঙ্গে বেরিয়ে আসি দোকান থেকে।

বেরিয়ে এসেই ললিতা বলে—দাদা, একটু দাঁড়ান এখানে, আপনার একটা ছবি নিয়ে নিই। আর হয়তো দেখা হবে না এ জীবনে।

শুধু একা নয়, কৌশিক এবং ললিতার সঙ্গেও ছবি তুলতে হয় আমাকে। তারপরে ললিতা বলে—আসুন, এবারে কিছু খাওয়া যাক। আপনার নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়ে গেছে।

—শুধু দাদা কেন, ভাই আর বউমারও তো খিদে পাওয়া উচিত। কৌশিক হাসতে হাসতে বলেন।

সামনের একটা রেস্তোরাঁ কাম-স্ন্যাক্সবার দেখিয়ে ললিতা বলে চলুন, ওখানে যাওয়া যাক।

ললিতাকে এখন অনেকটা স্বাভাবিক মনে হচ্ছে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি।

স্ন্যাক্সবার-এর সামনে পথের পাশে একটা পাথরের স্থায়ী টেবল এবং একটু দূরে নোংরা ফেলার বিন্। দোকান থেকে খাবার নিয়ে এসে সবাই এখানে দাঁড়িয়ে খাচ্ছেন, খাওয়া হলে প্ল্যাস্টিকের প্যাকেট কিম্বা বাসনপত্র বিন্-এ ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছেন। পথ ও টেব্ল দুই-ই পরিষ্কার থাকছে।

একটি দীর্ঘাঙ্গী ও স্বাস্থ্যবতী তরুণী সেই টেবিলে দাঁড়িয়ে কি যেন খাচ্ছে। তাকে দেখিয়ে ললিতা বলে—দেখুন, ওর গলায় স্বামী রজনীশের লকেট। তার মানে মেয়েটি রজনীশের শিষ্যা। সুইজারল্যাণ্ডের তরুণ সমাজে রজনীশ খুবই জনপ্রিয়।

একবার থামে ললিতা, তারপরে আমাকে জিজ্ঞেস করে—আপনি তো ভেজিটারিয়ান?

—না, ঠিক ভেজিটারিয়ান নই, তবে হোটেল-রেস্তোরাঁয় কখনও মাছ-মাংস খাই নে।

—আমরা ভেজিটারিয়ান। আপনি কি খাবেন? রস্টি (Rosti) অথবা পিট্জা পাই (Pizza pie)।

—আমার কোনটি সম্পর্কেই ধারণা নেই।

—তাহলে রস্টি খান। A specially made, Swiss type of fried potatoes served writh sausages and salad. সাত-আট ফ্রাঁ দাম পড়বে।

তার মানে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা। কিন্তু উপায় কি? এ তো কলকাতা নয়, জুরিখ! আলুভাজা খেতে চল্লিশ টাকার বিদেশী মুদ্রা গুনে দিতে হবে। অগত্যা বলি—ঠিক আছে, তাই নেওয়া যাক।

—আরেকটা কথা দাদা! আপনাকে কিন্তু শুনতেই হবে।

আমি ওর দিকে তাকাই।

ললিতা বলে—এবেলা আমরা আপনাকে লাঞ্চ্ খাওয়াবো।

মনে মনে লজ্জা পাই। বাবা বিশ্বনাথ নিশ্চয়ই আট ফ্রাংকের জন্য আমার আকুলতা টের পেয়ে গিয়েছেন। তাহলেও একবার আপত্তি করা উচিত।

কিন্তু তার আগেই সোচ্চার স্বরে কৌশিক বলে ওঠেন—নিশ্চয়ই। আপনি আজ আমাদের গেস্ট্।

—কিন্তু…

—না, কোন কিন্তু নয়। ললিতা বলে ওঠে—আমাদের উচিত ছিল হোটেলে নিয়ে গিয়ে লাঞ্চ্ খাওয়ানো। তা যখন হয়ে উঠল না - প্লীজ, আপনি আপত্তি করবেন না।

অতএব আমি আর আপত্তি করি না। ওরা স্বামী-স্ত্রী গিয়ে খাবারের দোকানে লাইন লাগায়। আমি দাঁড়িয়ে থাকি টেবিলের ধারে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকি চারিদিক। সত্যি দেখবার মতো। মনেই হচ্ছে না আমি মাটির নিচে দাঁড়িয়ে আছি। অবশ্য জানি, এটা মনে হয় না। তবে সেই সঙ্গে ভেবে অবাক হচ্ছি—ছোট দেশ বলে কি ভাবে এঁরা জায়গার সদ্ব্যবহার করেছেন। ওপরে রেলস্টেশন, নিচে বাজার। নিচে রেলস্টেশন ওপরে বিমানবন্দর। আর সেই বিমানবন্দর অথবা বাজারকে এঁরা কি রকম দর্শনীয় করে তুলেছেন, কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখেছেন!

ওরা খাবার নিয়ে আসে। সেই সঙ্গে একটা বেশ বড় মিনারেল ওয়াটারের বোতল। এই একটা বিচিত্র ব্যাপার। য়ুরোপে জল কিনে খেতে হয়।

স্বামী রজনীশের শিষ্যাটি এখনও খাচ্ছে। আমরাও তার পাশে দাঁড়িয়ে খেতে শুরু করি। আলুভাজা খেতে ভালই লাগছে। পরিমাণও মন্দ নয়, তাছাড়া অনেকখানি সালাড দিয়েছে। পেট ভরে যাবে, ভাগ্যিস ওরা সঙ্গে ছিল। নইলে আমি কি খেতে কি খেতাম, কে জানে?

এ কি! মেয়েটা খাবার ফেলে ছুটল কোথায়। না, দূরে যায় নি। ঐ তো ছেলে দুটির কাছে গিয়েছে। ওদের সঙ্গে করমর্দন করছে। ওরা ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে। ব্যাপার কি?

আলিঙ্গন ও চুম্বন শেষ হবার পরে ছেলে দুটির হাত ধরে মেয়েটি ফিরে এলো নিজের জায়গায়। আর তখুনি বুঝতে পারি ব্যাপারটা। ছেলে দুটির গলায়ও একই রকম লকেট। অর্থাৎ ওরাও স্বামী রজনীশের শিষ্য। গুরুভাইদের সঙ্গে গুরুবোনের বাজারে দেখা হবার উচ্ছ্বাস প্রকাশিত হল।

আমাদের খাওয়া হয়ে যায়। জল খেয়ে প্ল্যাস্টিকের বোতল, প্লেট ও চামচ ফেলে দিয়ে বানহোপ্ স্ট্রীটের দিকে এগিয়ে চলি।

কৌশিক জিজ্ঞেস করেন—আপনি কি এখন জুগে ফিরে যাবেন?

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলি—কি করব বুঝতে পারছি না।

—এত তাড়াতাড়ি ফিরে কি করবেন? ললিতা বলে—তার চেয়ে পায়ে হেঁটে জুরিখ শহর খানিকটা দেখে যান।

ললিতা পরামর্শ দেয়, কিন্তু সকালের কথামত নিজে সঙ্গী হতে চায় না। কেন?

—তাই করুন। কৌশিকও সমর্থন করেন ললিতাকে।

এসক্যালেটারে চড়ে উঠে আসি বানহোপ স্ট্রীটে।

আমার একখানি হাত ধরে ললিতা বলে—আগামীকাল আবার জুরিখে আসছেন তো?

—তাই তো ভাবছি।

—তাহলে বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ ট্যুরিস্ট অফিসে আসুন, একসঙ্গে একটা ইভ্‌নিং ট্রিপ করা যাবে।

—বেশ তো, তাই হবে।

করমর্দন করে ওরা বিদায় নেয়। আমি দাঁড়িয়ে থাকি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দেখি। একটু বাদে জুরিখের জনতার মাঝে হারিয়ে যায় ওরা। আর আমি জুরিখের পথে পদচারণা শুরু করি। আমি আবার একা। আমি যে পথিক। সকল কালের সকল দেশের সকল পথের পথিক।

॥ এগারো ॥

ব্রেকফাস্ট করে বাবুজির সঙ্গে বেরিয়ে আসি হোটেল থেকে। বাগান পেরিয়ে উঠে আসি বাস-পথে। হাঁটতে থাকি শোনেগের দিকে। কয়েক মিনিট বাদেই ডানদিকে একটা চড়াই পথ। এটাও বাঁধানো মোটর চলাচলের পথ, তবে চওড়ায় কম। বাবুজি বলেন—ফরেস্ট রোড। আজ আমরা বনভ্রমণে চলেছি।

গতকাল ললিতাদের বিদায় দেবার পরে বানহোপ স্ট্রীট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আর দেখতে দেখতে চলে গিয়েছিলাম জুরিখ হ্রদের তীরে। বেশ কিছুক্ষণ সেখানে ঘোরাঘুরি করার পরে আবার একই পথে ফিরে এসেছি স্টেশনে, ট্রেন ধরে সাতটার মধ্যেই পেঁছে গিয়েছি হোটেলে। ডিনারের পরে দেখা হয়েছে বাবুজির সঙ্গে। তখুনি তিনি বলেছেন—কাল সকালে আমরা পায়ে হেঁটে পাহাড় ও বন দেখতে বের হব।

আজ বাবুজির কথার সত্যতা বুঝতে পারছি। একটা বনময় পাহাড়ের গা বেয়ে আমরা ওপরে উঠছি। পথের দুদিকেই বড় বড় গাছ। স্প্রুস এবং পাইন জাতীয় গাছই বেশি। আবহাওয়া ও উচ্চতার পার্থক্য এবং মাটির বিভিন্নতার জন্য সুইজারল্যাণ্ড বিচিত্র বনসম্পদে সমৃদ্ধ। মধ্য য়ুরোপের নিম্নভূমির বড় বড় গাছপালা থেকে শুরু করে আর্কটিক অঞ্চলের ছোট ছোট গাছপালা পর্যন্ত সবই এদেশে দেখতে পাওয়া যায়। এবং সুইস আল্‌পসে মাত্র কয়েক ঘণ্টা পর্বতারোহণ করলেই এই বৈচিত্র্য দর্শন করা যায়।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বনভূমি ধ্বংস হয়ে যায়। এ কথাটি সুইজারল্যাণ্ডের ক্ষেত্রেও অনেকখানি সত্য। এদেশেও চাষবাসের প্রয়োজনে নিম্নাঞ্চলের প্রায় পঁচাত্তর শতাংশ বনভূমি পরিষ্কার করে-ফেলা হয়েছে। তবু এখনও এদেশে ১০০০ ফুট থেকে ১৬০০ ফুট উচ্চতার মধ্যে ওক বাদাম ও আঙুর প্রভৃতি গাছ দেখতে পাওয়া যায়। তার ওপরে মানে ৪০০০ ফুট পর্যন্ত উচ্চতায় যেমন চাষ-বাস হয়, তেমনি দেখা যায় স্প্রুস ও পাইন জাতীয় বন।

এটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল। সুতরাং এখানে আঙুর কিম্বা গমের ক্ষেত নেই, রয়েছে শুধুই বড় বড় গাছ। আমি কেবল পাইন ওক আর বাদাম গাছগুলো চিনতে পারছি।

হিমালয়ের গহন-গিরি-কন্দরে যাঁরা সামান্য কিছু পদচারণা করেছেন, তাঁরাও জানেন, ভারত বনসম্পদে কতখানি সমৃদ্ধ। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরা দেখতে পেয়েছেন যে এই সম্পদের প্রতি আমাদের কি অমার্জনীয় অবহেলা! দেখেছেন যে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কর্মবিমুখতার জন্য এই অমূল্য অরণ্যসম্পদ আমরা কি ভাবে নষ্ট করে ফেলছি? আর এখানে?

দেখে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে আমার। শীতের দেশ, এখনও ন'টা বাজে নি। অথচ এরই মধ্যে বনবিভাগের কর্মীরা এসে কাজে লেগে গিয়েছেন। তাঁরা জ্যাকেট গায়ে গামবুট পায়ে দস্তানা হাতে গাঁইতি ও বেলচা নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। গাছের গোড়া সাফ করে মাটি দিচ্ছেন, গাছকে পরগাছা-মুক্ত করে ঝোপঝাড় ছেঁটে ফেলে বনপথ ও বনভূমি পরিষ্কার করছেন। ভারী ভাল লাগছে দেখতে। দেখতে দেখতে দুজনে পথ চলেছি।

পাহাড়টা কিন্তু মন্দ বড় নয়। হাঁটতে হাঁটতে আমরা অনেকটা ওপরে উঠে এসেছি। কিন্তু আমার কথা বাদই দিলাম, বাবুজির এখন ঊনআশি চলেছে, তিনিও ক্লান্তিবোধ করছেন না। কেনই বা করবেন? একে শান্ত সুন্দর শীতল আবহাওয়া, তার ওপরে পথের ক্রমমাত্রা বা ঢাল বড়ই মৃদু। পথটা খুবই ধীরে ধীরে ওপরে উঠেছে। আর পথের পাশে ফুটে আছে অসংখ্য লাল নীল হলুদ ও সাদা ফুল। তারা মাথা দুলিয়ে আমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। আমরা আনন্দে আরোহণ করছি।

কথায় কথায় বাবুজি বললেন—এ পাহাড়টাকেও তুমি আল্‌পস বলতে পারো বৈকি! আল্‌পস তো কোন একটা বিশেষ পর্বতশ্রেণীর নাম নয়। আলপ্‌স হচ্ছে, 'the collective name for the great mountain system of Europe. ইতালীর Gulf of Genoa থেকে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা পর্যন্ত বিস্তৃত। ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী এবং অস্ট্রিয়া জুড়ে এই পর্বতমালা।

—আচ্ছা আল্‌পসের উচ্চতম শিখর মঁ ব্লা (Mount Blanc : 15,781') তো ইতালী ও ফরাসী সীমান্তে?

—হ্যাঁ। তবে সুইস সীমান্তেরও কাছে। আল্‌পসের দুর্গমতম শৃঙ্গ ম্যাটারহর্ণ (Matterhorn : 14,688') ইতালী ও সুইস সীমান্তে অবস্থিত।

একবার থামেন বাবুজি। তারপরে আবার চলতে চলতে বলতে থাকেন—হিমালয় যেমন ভারত-উপমহাদেশের সারা উত্তর-সীমান্ত জুড়ে দুর্ভেদ্য রক্ষা-প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে, আল্‌পস তেমন নয়। অসংখ্য পর্বতশ্রেণী নিয়ে আলপস্‌ পর্বতমালা, কিন্তু এই পর্বতশ্রেণীগুলো একসঙ্গে যুক্ত নয়। অনেক-গুলির মাঝেই রয়েছে সুগম গিরিপথ কিম্বা সমতল উপত্যকা।

'Alp' শব্দের অভিধানিক অর্থ 'high mountain' বা উঁচু পাহাড়। আবার অনেকের মতে 'Alp' হচ্ছে 'high pastures and not the peaks and ridges of the chain'—তার মানে আল্‌প মানে শৃঙ্গ কিম্বা গিরিশিরা নয়। আল্‌প হচ্ছে উচ্চ তৃণভূমি। আমি ভৌগোলিক নই, সুতরাং কাঁরা ঠিক বলেছেন বলতে পারব না। তবে এ সম্পর্কে আমিও নিঃসন্দেহ যে আল্‌পস হিমালয়ের মতো কোন বিশেষ পর্বতশ্রেণী নয়, কারণ অস্ট্রেলিয়া ও জাপানেও আল্‌পস রয়েছে। তার মানে দক্ষিণ, পশ্চিম, ও মধ্য-য়ুরোপের প্রায় সমস্ত পার্বত্য অঞ্চলটাই আল্‌পস।

—আচ্ছা সুইজারল্যাণ্ড তো মধ্য-আল্পস পর্বতমালায় অবস্থিত!

বাবুজি থামতেই আমি জিজ্ঞেস করি।

বাবুজি উত্তর দেন—হ্যাঁ। তবে এঁরা বলেন বার্নিজ (Bernese) আল্পস। তুমি জানো যে বার্ন (Berne) হচ্ছে সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানী। মাত্র দেড় লক্ষ মানুষের ছোট শহর, এখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে, ফরাসী দেশের কাছাকাছি অবস্থিত। সুইস আল্পস লেক লেমান (Lac Leman) বা জেনিভা হ্রদ থেকে জুরিখ হ্রদ পর্যন্ত বিস্তৃত। এছাড়া পশ্চিম-আল্পসের জুরা (Jura) মালভূমি, বার্নের উচ্চভূমি (Bernese Oberland) এবং স্টবু (Staub) উপত্যকাও সুইজারল্যাণ্ডের অন্তর্গত।

কথা বলতে বলতে আমরা পর্বতারোহণ শেষ করে ফেলেছি, পাহাড়টার ওপরে উঠে এসেছি। অনেকখানি সমতল। প্রচুর গাছপালা। আর রয়েছে বসবার বেঞ্চি। দু-জোড়া মধ্যবয়সী নারী-পুরুষ দুটি বেঞ্চিতে বসে আছেন। আমরাও একটা বেঞ্চিতে এসে বসে পড়ি।

বাবুজি বলেন—সকালে বিড়লাজীর কাছে না গেলে, আমি হাঁটতে হাঁটতে এখানে চলে আসি। জায়গাটা যেমন সুন্দর, তেমনি শান্ত ও নির্জন। তবে রোজই মনে হয় এখানে একটা 'কফি-কর্ণার' থাকলে ভাল হত। কিন্তু 'ভিজিটার' এত কম যে দোকানীর পোষাতো না।

কথাটা ঠিকই বলেছেন বাবুজি। এখন এক কাপ গরম কফি পেলে বড়ই ভাল হত।

তার চেয়েও বড় কথা জায়গাটি সত্যি সুন্দর। ওপরে বড় বড় গাছের চন্দ্রাতপ, আর মাটিতে মখমলের মতো নরম ঘাস। জুগ হ্রদের খানিকটা অংশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আর শুনতে পাচ্ছি পাখির গান।

বাবুজি বলেন—এই পাহাড়টার ওপরেও একটা ছোট হ্রদ আছে। সামনের বনপথটি দিয়ে কয়েক মিনিট হাঁটতে হবে। এখানে তবু দু-চারজন আসেন, সেখানে কেউ যান না। তাহলেও আমি মাঝে মাঝে গিয়ে একা একা বসে থাকি। ভারী ভাল লাগে।

শুনেছি বায়রণ, শেলী, লঙফেলো প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত কবিরা সুইজারল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়েছেন। বাবুজি তাঁদের মতো কবি কিম্বা দার্শনিক নন। তিনি কলকাতা হাইকোর্টের একজন বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী। আইন নিয়ে তাঁর জীবন। অথচ মানুষটি কি আশ্চর্য-সুন্দর কবি-মনের অধিকারী! কে বেশি সুন্দর? এই অরণ্যপ্রকৃতি কিম্বা আমার বাবুজি? আমার কাছে সমান সুন্দর। কারণ আমার জীবনে সুইজারল্যাণ্ড এবং বাবুজি এক হয়ে রইলেন।

পাহাড় থেকে ফিরে আসতে বেলা দশটা বেজে গেল। বাবুজি আর হোটেলে এলেন না, তিনি পারিজাতে চলে গেলেন। একেবারে লাঞ্চ সেরে ফিরবেন।

আমি হোটেলে এসে চাবির জন্য মণিকার সামনে হাত বাড়াই। সে চাবি হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করে—কোথায় গিয়েছিলেন?

—পাশের পাহাড়ে।

—কেমন লাগল?

—ভারী সুন্দর।

—এখন কি করবেন?

—জুরিখ যাবো। ভাবছি একটা ইভ্‌নিং ট্রিপ্ করব।

—কোথাকার ট্রিপ্?

—তা ঠিক করি নি।

—মাউণ্ট্ সান্‌টিস থেকে ঘুরে আসুন, ভাল লাগবে।

—বেশ, তাই যাবো।

—আগামীকাল কোথায় যাচ্ছেন?

—কাল ভাবছি ব্রেকফাস্ট করেই জুরিখ চলে যাবো, সিটি ট্যুর করব।

—কাল আমাকেও জুরিখ যেতে হবে। ছুটি নিয়েছি।

—কোন কাজ আছে?

—হ্যাঁ।

আর কোন কথা বলে না মণিকা। অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আমিও চাবি নিয়ে চলে আসি ওপরে। কিন্তু জুরিখ যাবার কথা মনে হতেই মণিকা অমন গম্ভীর হয়ে গেল কেন?

সে ভাবনায় আমার কি কাজ? ললিতা সাড়ে বারোটার মধ্যে ট্যুরিস্ট অফিসে যেতে বলেছে। হাতে মাত্র ঘণ্টাদুয়েক সময়।

দাঁড়ি কেটে স্নান সেরে টাকা-পয়সা, কাগজপত্র ও ক্যামেরা সাইড-ব্যাগে ভরে নিয়ে একেবারে তৈরি হয়ে নিচে নেমে আসি। মণিকার কাছে চাবি রেখে দিয়ে ডাইনিং হলে আসতেই সিল্‌ভিয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। সে হাসিমুখে সামনে এসে জিজ্ঞেস করে—জুরিখ যাচ্ছ?

—হ্যাঁ।

—বোসো, খাবার নিয়ে আসছি।

কি খাবো জিজ্ঞেস না করেই সে কিচেনে চলে যায়। এরই নাম ভালোবাসা, যার কোন জাত নেই, ধর্ম নেই, দেশ নেই। নর ও নারীর প্রভেদ নেই।

ডাইনিং হল প্রায় ফাঁকা। এখনও লাঞ্চের ভিড় পড়ে নি। সুবিধেমতো একটা জায়গা দেখে বসে পড়ি।

সিল্‌ভিয়া খাবার নিয়ে আসে। রুটি মাখন চীজ, ভেজিটেব্‌ল স্যুপ, ডিমভাজা, ফ্রুট-সালাড ও ফ্রুট-জুস।

খাবার পরিবেশন শেষ করে সিল্‌ভিয়া পাশের চেয়ারে বসে পড়ে। আমি খেতে শুরু করি। সিল্‌ভিয়া বলে—কাল কথাটা বলেছি ওকে।

—কি বলল ?

—কি আর বলবে, খুশি হল।

—তাহলে বিয়েটা কবে ?

—আগামী সপ্তাহে রেজিস্ট্রারকে দরখাস্ত দেব, তিনি যেদিন ঠিক করে দেন।

একবার থামে সিল্‌ভিয়া, তারপরে আবার বলে—আশা করছি আগামী মাসের তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ সপ্তাহে তারিখ পড়বে।

—কনগ্র্যাচুলেশন। আমি উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠি।

সিল্‌ভিয়া মাথা নিচু করে। একটু পরে বলে—একটা কথা রাখবে ?

—সম্ভব হলে নিশ্চয়ই রাখব। কি কথা বলো !

—তুমি আমাদের বিয়েতে থাকবে ?

হাসি পায় আমার, কিন্তু হেসে ফেললে সিল্‌ভিয়া কষ্ট পাবে। তাই গম্ভীর স্বরে বলি—আমি তো ক'দিন বাদেই চলে যাচ্ছি।

—তা যাও। আমাদের বিয়ের তো দেরি আছে। আমি তোমাকে তারিখটা জানিয়ে দেব, তখন আবার এসো। তোমাকে আর হোটেলে উঠতে হবে না, আমার ফ্ল্যাটে থাকবে। বিয়ের পরে একটা দিন থেকে চলে যেও।

সিল্‌ভিয়া কেমন করে জানবে যে আমি একজন দরিদ্র লেখক, অপরের সাহায্যে য়ুরোপে এসেছি ! আমার পক্ষে ওর নিমন্ত্রণ রক্ষা করা অসম্ভব।

কিন্তু…কথাটা মনে পড়ে আমার, তাই তো ! আমাকে যে লণ্ডন প্যারী বন্ (কোলন) হয়ে রোম যাবার পথে একবার জুরিখ নামতে হবে। আমার সুইস এয়ারের টিকেট, তাই ওঁরা আমাকে কোলন থেকে এখানে নিয়ে এসে এখানে রোমের বিমান ধরিয়ে দেবেন। তখন অবশ্য মাত্র ঘণ্টা দেড়েক জুরিখ বিমান-বন্দরে অপেক্ষা করার কথা। তবে ফ্লাইট বদল করে নিয়ে আমি এখানে স্টপ্-ওভার নিতে পারি।

কথাটা বলতেই উৎসাহিত হয়ে ওঠে সিল্‌ভিয়া। জিজ্ঞেস করে—কোলন থেকে রোমের পথে তোমার কবে জুরিখ আসার কথা ?

সাইড-ব্যাগটা দেখিয়ে বলি—আমার ডায়েরীতে সব লেখা আছে।

সে ডায়েরী দেখে বলে—তুমি ২১শে জুন সকাল দশটায় কোলন থেকে সুইস এয়ারের ৫৮৭ নম্বর ফ্লাইটে চড়ে এগারোটায় জুরিখ পেঁাচচ্ছ। এখান থেকে আবার দুপুর সাড়ে বারোটায় ৬০৪ নম্বরের সুইস এয়ার ফ্লাইট ধরে বেলা দুটো নাগাদ রোম…না, সেদিন রোম যাওয়া হবে না তোমার !

সিল্‌ভিয়া পকেট থেকে পেন বের করে আমার ডায়েরীতে লেখা রোমের ফ্লাইট কেটে দেয়।

হেসে জিজ্ঞেস করি—কবে যাওয়া হবে তাহলে ?

একটুকাল চুপ করে থাকে, কি যেন হিসেব করে, তারপরে বলে—২৪শে জুন। তুমি ২১শে এখানে আসবে, ২২শে আমাদের বিয়ের দিন ঠিক করব রেজিস্ট্রারকে বলে। ২৩শে আমাদের সঙ্গে পিক্‌নিকে যাবে, ২৪শে দুপুরের দিকে কোন ফ্লাইট ধরে তুমি রোম চলে যাবে।

খাওয়া হয়ে যায়, আমি উঠে দাঁড়াই। বলি—আচ্ছা, সেসব পরে ঠিক করা যাবে। এখন আমাকে ছুটি দাও। সাড়ে বারোটার মধ্যে জুরিখ পেঁছিতেই হবে।

—কেন, তোমার সেই ইণ্ডিয়ান স্বামী-স্ত্রী বন্ধুরা অপেক্ষা করবেন?

—হ্যাঁ।

—তাহলে আর দেরি করো না। এখন এগারোটা বেজে একুশ, এগারোটা পঁচিশে একটা বাস আছে।

মুখ ধুয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে বাসস্ট্যাণ্ডে আসি। এবং বাসটা পেয়ে যাই।

বাসে উঠে বসতেই আবার সিল্‌ভিয়ার ভাবনা পেয়ে বসে আমাকে। গতকাল এই বাসে করে ওর সঙ্গে জুগ গিয়েছি। জুরিখ যাবার পথে আমি ওকে বিয়ে করার পরামর্শ দিয়েছি। আর তাই ওর বিয়েতে আমাকে উপস্থিত থাকতেই হবে। শুধু কৃতজ্ঞতার আমন্ত্রণ নয়, সেই সঙ্গে ভালোবাসার দাবী।

শেষ পর্যন্ত মিনিট পাঁচেক দেরি হয়ে যায়। কি করব জুগ স্টেশনে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। তাড়াতাড়ি ট্যুরিস্ট অফিসে আসি।

না, ওরা এখনও এসে পেঁছিয় নি। কাল আমার দেরি হয়েছিল। আজ ওরা দেরি করছে। একখানি সোফায় বসে পড়ি।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলে, কিন্তু আমার প্রতীক্ষার অবসান হয় না। ওরা আসে না। অথচ এদিকে যে বারোটা পঞ্চাশ! একটায় বাস ছাড়বে। টিকেট করতে হবে।

এসে লাইনে দাঁড়াই। আমার আগে মাত্র দুজন। বড়জোর মিনিট দুয়েক সময় লাগবে। এরই মধ্যে আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

কোথায় যাবো? মণিকা বলেছে, মাউণ্ট সান্‌টিস। তাই যাওয়া যাক। একটায় বাস ছাড়বে, ছ'টা নাগাদ ফিরে আসবে। ভাড়া ৪৯ ফ্রাংক, অর্থাৎ ২৪৫ টাকা।

গতকাল ললিতা আমার টিকেট করে রেখেছে, আমাকে লাঞ্চ খাইয়েছে। আজ আমারও ওদের টিকেট করে রাখা উচিত।

কিন্তু ওরা যে এখনও আসছে না। এতগুলো টাকা! যদি না আসে, মুশকিলে পড়ে যাবো।

তার চেয়ে থাকগে, এলে ওরা নিজেরাই টিকেট করে নেবে। কি আর মনে করবে?

টিকেট করে দরজার বাইরে এসে দাঁড়াই। কিন্তু কোথায় কৌশিক, কোথায়

ললিতা ?   ওরা আর আসবে না আজ।

কিন্তু ললিতাই তো আমাকে আসতে বলেছিল। বিদায়বেলায়ও বলেছে—সাড়ে বারোটা নাগাদ ট্যুরিস্ট অফিসে আসুন, একটা ট্রিপ্ করা যাবে।

ওরা জুরিখে থাকে। ওদের তো এত দেরি হবার নয়। তাহলে কি ওরা ইচ্ছে করেই এলো না! কিন্তু কেন? গতকাল উত্তেজনার বশে উভয়েই আমার কাছে ব্যক্তিগত সমস্যার কথা বলে ফেলেছে, আজ তাই আর মুখ দেখাবে না আমাকে? অথবা কোন দাম্পত্য কলহ?

যাই হয়ে থাক, আমি সেকথা জানতে পারব না কোনদিন। ওদের সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না। আমি ওদের হোটেলের ঠিকানা রাখি নি। আমি যে পথিক। পথের পরিচয় পথেই শেষ হয়ে যায়।

ওদের ভাবনারও আর সময় নেই। সহযাত্রীরা বাসে উঠে গিয়েছেন। আমিও বাসে উঠি। আজ আমি একা।

বাস চলতে শুরু করে। গতকালের পথেই বাস চলল এগিয়ে। সেই বানহোপ্ স্ট্রীট দিয়ে বানহোপ ব্রিজ পার হয়ে লিম্যাৎ নদীর পূবপারে এলো, সেই লিম্যাৎ রোড ধরে দক্ষিণে অর্থাৎ হ্রদের দিকে এগিয়ে চলল।

আজ আর মুনস্টার ব্রিজ পার হয়ে নদীর পশ্চিমপারে এলাম না। পূবপার ধরেই হ্রদের দিকে এগিয়ে চললাম।

মিনিট বিশেক বাদে জুরিখ হ্রদের তীরে পেঁছিলাম। আর তখুনি আমাদের গাইডকে চিনতে পারলাম। ভদ্রমহিলার বয়স হয়েছে, বৃদ্ধাই বলা যেতে পারে। পায়লটের পাশে এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলেন। এবারে মাইক হাতে নিয়ে বলতে শুরু করেছেন—লেডিজ এ্যাণ্ড জেণ্ট্লমেন, গুড্ আফ্টারনুন। আমি মিস মারিয়ান (Marrianne), এখন আপনাদের ফ্রেণ্ড্ ফিলোসফার এ্যাণ্ড গাইড। আর আমার পায়লটের নাম হান্স (Hans)। এই ভ্রমণে যোগদানের জন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।

আমরা এখন মাউণ্ট সান্টিস চলেছি। বলা বাহুল্য, মাউণ্ট সান্টিস আল্পসের একটি পর্বতশিখর। উচ্চতা ৮২০৫ ফুট অর্থাৎ ২৫০১ মিটার। শেষ ১১৪৯ মিটার আমাদের কেব্লকার-এ করে উঠতে হবে। শিখরটি পূর্ব সুইজারল্যাণ্ডে অর্থাৎ অস্ট্রিয়ার দিকে অবস্থিত।

থামলেন গাইড। ভেবেছিলাম, কালকের মতই তিনি এখন জার্মান কিম্বা ফরাসীতে বলবেন। কিন্তু না, তিনি জাপানী ভাষায় বলতে শুরু করেছেন। অকারণে নয়, আমাদের সঙ্গে বেশ কয়েকজন জাপানী পর্যটক রয়েছেন। ওঁরা বিদেশ ভ্রমণে বেরুবার আগে মোটামুটি ইংরেজী শিখে নেন। সাধারণতঃ ওঁরা ইংলিশ ট্যুর নেন। তবু সুইস সরকার ওঁদের জন্য দেখছি জাপানী জানা গাইডের ব্যবস্থা করেছেন।

খুবই স্বাভাবিক। কারণ এশিয়ার যে দেশটিকে য়ুরোপ সবচেয়ে বেশি

শ্রদ্ধা করে, সে হল জাপান। আপন যোগ্যতাতেই আজ জাপান য়ুরোপ ও আমেরিকার এই শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। ইলেক্‌ট্রোনিকস থেকে বিলাসদ্রব্য পর্যন্ত প্রায় সারা বাজারটাই যে এখন জাপানের দখলে। কাজেই জাপানী পর্যটকদের জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থা।

গতকাল পায়ার্স থেকে সঙ্গমের যে পুলটি দেখেছিলাম, আমরা এখন সেই পুলের অপর পারে। এ জায়গাটি যে এত সুন্দর গতকাল বুঝতে পারি নি। চারিদিক থেকে ছ'টি রাস্তা এসে এখানে মিলেছে। গাইড বললেন, এ জায়গাটার নাম বেলভিউ প্লাট্‌স (Bellevue Platz)।

আমরা হ্রদের তীরপথটি ধরলাম। এর নাম ইউইও কি (Uio Quai)। বাস দক্ষিণ-পূবে ছুটে চলেছে। হ্রদের উত্তর ও পশ্চিম তীরে শহরকে ছবির মতো সুন্দর দেখাচ্ছে। এই পূবপারও কিছু কম সুন্দর নয়। পথের দুদিকে বাগানঘেরা বাংলোর সারি। বাড়ি থাকলেও হ্রদকে দেখতে পাচ্ছি পরিষ্কার। গতকালও দেখেছি, আজও দেখছি হ্রদের বুকে শত শত রাজহাঁস। এত নৌকো, মোটরবোট, স্টীমার অথচ ওরা নির্ভয়ে সাঁতার কাটছে।

গাইড বলেন—এ রাস্তাটি এন. এইচ. এইট বা আট নম্বর জাতীয় সড়ক।

একটু থেমে ডানদিকে তাকিয়ে তিনি আবার বলেন—আমরা জুরিখ হ্রদের তীর দিয়ে চলেছি। এই হ্রদটি ২৪ মাইল লম্বা ও ১৫০ ফুট গভীর। শীতকালে যখন চারিদিক বরফে ঢেকে যায়, তখনও এ হ্রদে নৌকো চলে রাজহাঁস ভাসে। তবে প্রতি শতাব্দীতে দুবার কয়েকদিনের জন্য এ হ্রদ তুষারে ঢেকে যায়।

—এ শতাব্দীতে গিয়েছে কি? জনৈক জাপানী সহযাত্রী জিজ্ঞেস করেন।

গাইড উত্তর দেন—হ্যাঁ, ১৯২৯ ও ১৯৬৩ সালে।

—তাহলে বিংশ শতাব্দীতে আর তুষারাবৃত হবে না?

—আমাদের তাই বিশ্বাস।

তাহলে এঁরা এখনো অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস করেন!

জুরিখ শহর শেষ হয়ে গেল। বাস তেমনি তীরপথ ধরে ছুটে চলেছে।

কয়েক মিনিট পরে হ্রদের তীরে আরেকটা শহরে এলাম। গাইড বলেন—রাপারস্‌উইল (Rapperswil)। ছোট হলেও শহরটি সুন্দর।

গাইড যোগ করেন—এবারে পথের দিক পরিবর্তন হবে। এতক্ষণ আমরা দক্ষিণ-পূবে এসেছি, এবারে উত্তর-পূবে যাবো।

ঠিকই বলেছেন বৃদ্ধা। হ্রদের তীরপথ থেকে বাস বাঁয়ে মোড় নিল। জুরিখ হ্রদ আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

বেলা দুটোর সময়, অর্থাৎ জুরিখ থেকে রওনা হবার ঠিক একঘণ্টা বাদে আমরা টগেনবুর্গ (Toggenburg) পৌঁছলাম। পথে রিকেনপাস (Ricken-pass) নামে একটি গিরিপথ পেরিয়ে এসেছি। অবশ্য গাইড বলে দিয়েছেন বলেই বুঝতে পেরেছি ওটা একটা গিরিপথ। এঁরা যে সেটিকে সদর রোড

বানিয়ে ছেড়েছেন।

গাইড বলেন—টগেনবুর্গ বেশ বড় শহর। বয়নশিল্পের জন্য বিখ্যাত।…

কথাটা মনে পড়ে যায়। সেদিন বিমানে বসে মিস্টার চাওড়া এই নামটা বলেছিলেন। তিনি এখানেই কাজে এসেছেন। হয়তো আজও আছেন। কিন্তু দেখা হবার কোন সুযোগ নেই।

—ওয়াটউইল (Wattwil) বেশ বড় রেলস্টেশন। এখানে এন এইচ. এইট ছেড়ে দিয়ে আমাদের ষোল নম্বর জাতীয় সড়ক ধরতে হবে। এখন আমরা আবার দক্ষিণ-পুবে যাবো।

গাইড থামলে আমি বাইরের দিকে তাকাই। আট আর ষোলোয় তফাৎ কিছু নেই। সব পথই সমান প্রশস্ত ও মসৃণ।

শুধু পথ নয়, পথের পাশে ভিলাগুলিও দেখবার মতো। আধুনিক ডিজাইনের সব বাড়ি। অধিকাংশ বাড়িতে কাচের দেওয়াল। প্রতি বাড়ির সামনে গাড়ির সারি।

গাইড বলেন—দেখে বুঝতে পারছেন, এটি এখন খুবই সমৃদ্ধ অঞ্চল। কিন্তু কিছুকাল আগেও এ অঞ্চলের অধিবাসীদের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। কারণ পাথুরে মাটি ও উচ্চতার জন্য এখানে ফসল প্রায় হয় না বললেই হয়। কিন্তু পর্যটন ব্যবসা এঁদের অবস্থা ফিরিয়ে দিয়েছে।

সামনে তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণী সূর্যালোকে ঝকঝক করছে। আমি দেখি আর দেখি, ভাবি হিমালয়ের কথা। আশ্চর্য, আল্‌পসে এসেও হিমালয়ের ভাবনা গেল না!

আবার পথের পাশে তাকাই, বাঁদিকে তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর, আস্তে আস্তে ওপরে উঠে গিয়েছে। ডানদিকে নাতিপ্রশস্ত উপত্যকা, খানিকটা নিচে নেমে আবার ওপরে উঠেছে। তারপরে গাছে ছাওয়া পাহাড়। উপত্যকাটি পাহাড়ের পাদ-দেশে মিশেছে। তবে পাহাড় একটি কিম্বা দুটি নয়, একের পরে এক, পাহাড়ের রেখা…পাহাড়ের ঢেউ।

আবার বাড়ি-ঘর, একটা সুন্দর ছোট শহর। গাইড বলেন—ক্রুমেনাও (Krummenau) এখানেই এন. এইচ সিক্সটিন-কে ছেড়ে দিতে হবে। এবার অন্য পথ।

—কত নম্বর এন. এইচ? জনৈকা আমেরিকান তরুণী জিজ্ঞেস করে।

বৃদ্ধা হেসে দেন। বলেন—না, এটা ন্যাশনাল হাইওয়ে নয়, এমনি রাস্তা।

সে যাই হোক, পথ কিন্তু মোটেই খারাপ নয়। একই রকম মসৃণ, কেবল চওড়ায় একটু কম। বাস প্রায় একই গতিতে এগিয়ে চলেছে।

পথটা ওপরে উঠে গেছে। বাস প্রায় চড়াই ভাঙছে। অনেকটা ওপরে উঠে আবার নিচে নেমে চলেছি। পথের পাশে সাজানো বাড়ি-ঘর।

বরফে ঢাকা পাহাড়গুলো আরও কাছে এসেছে এগিয়ে। তাদের পাদদেশে

সবুজ পাহাড়ের সারি। সবুজের বুকে সাদার বাহার দেখতে ভারী ভাল লাগছে। ঈর্ষা হচ্ছে ও'দের কথা ভেবে, যাঁরা এখানে বাড়ি করেছেন, এই অনিন্দ্যসুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে বাসা বেঁধেছেন।

বেলা আড়াইটার সময় বাসযাত্রায় যতি পড়ল। আমরা স্বোয়াগাল্প (Schwagalp) পৌঁছলাম। সামনেই কেব্লকার স্টেশন। ওপরে লেখা —'mit der Luftseilbahn auf den Santisgipfel 2501 m'।

অর্থাৎ ৮২০৫ ফুট উঁচু মাউণ্ট সান্টিস-এর কেব্ল-রেলওয়ে পথ। তার নিচে লেখা—Schwagalp 1352 m. Mount Santis 2501 m, অর্থাৎ এই কেব্লকার চড়ে আমাদের ১১৪৯ মিটার ওপরে উঠতে হবে।

এ জায়গাটি শুনেছি অস্ট্রিয়ার খুবই কাছে। এখান থেকে সোজাসুজি পূবে অস্ট্রিয়া আর উত্তরে জার্মানী। জার্মান সীমান্তও খুব দূরে নয়।

সহযাত্রীদের সঙ্গে নেমে আসি বাস থেকে। আমার সামনে অসীম আল্পস। আজ আমি আবার আল্পসের অন্তরলোকে প্রবেশ করব। কিন্তু তার জন্য আমাকে কোন কষ্ট করতে হবে না।

গাইডের পেছনে এগিয়ে চলি। স্টেশনে আসি। একটা দরজার সামনে এসে লাইনে দাঁড়াই। একটু বাদে দরজা খুলে যায়। ভেতরে আসি। প্রকাণ্ড একখানি ঘর। তিনদিকে দরজা জানলা ও দেওয়াল। ওপরে ছাদ। কিন্তু একটা দিক ফাঁকা। সেদিকেই পাহাড়। দুর্গম পাহাড়ের সারি। তাদের গায়ে আর মাথায় তুষারের প্রলেপ।

সেদিক থেকেই 'কেব্ল' এসেছে। আর ঘড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা গাড়ি। গাড়িতে কোন চাকা নেই। নিচে প্রায় ফুটখানেক পুরু স্পন্জ (Sponge) জাতীয় সাদারঙের কিছু লাগানো। তারই ওপর গাড়িটা মেঝেতে দাঁড়িয়ে আছে।

বেশ বড় গাড়ি, লাল ও নীল রঙের। ওপরের দিকে প্রায় সবটাই কাচ। গাড়িতে একটি দরজা। গাড়ির গায়ে লেখা Mt Santis.

দরজা দিয়ে ভেতরে আসি। অর্থাৎ আমি জায়গা পেয়ে গেলাম। জায়গা মানে বসবার জায়গা নয়, দাঁড়াবার। বসবার ব্যবস্থা খুবই সামান্য। তবে দাঁড়িয়ে ধরে থাকবার ব্যবস্থা রয়েছে। পনেরো/বিশজন মানুষ ভালভাবে যেতে পারেন। আমরা অনেক লোক, দুবারে ওপারে যেতে হবে।

ভর্তি হয়ে যাবার পরে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। পায়লট সামনের দিকে তার নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সহযাত্রীরা যারা আসতে পারলেন না, তারা এই গাড়ি ফিরে আসার অপেক্ষায় রইলেন। আমাদের গাইডও রয়ে গেলেন ও'দের সঙ্গে।

ও'রা দাঁড়িয়ে রইলেন, আমরা ভাসতে শুরু করলাম। গাড়িটা প্রথম মাটির ওপরে উঠে এলো, তারপরে সামনে চলতে শুরু করল এবং ওপরে উঠতে থাকল।

ভেতরে কোন দোলা লাগছে না, গাড়িটা সর্বদা সোজা রয়েছে। চোখ বুজলে মনে হচ্ছে, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি আর চোখ মেললে দেখতে পাচ্ছি পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে ছুটে চলেছি।

আমি রাজগীরে রোপওয়ে চড়েছি। এর সঙ্গে কিন্তু কিছু তফাৎ আছে। সেখানে খোলা গাড়িতে হ্যান্ডেল ধরে বসে থাকা, নিচের দিকে তাকালে বুক ঢিপঢিপ করে। সেখানকার শিহরণ ও রোমাঞ্চ এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। পরিবর্তে এখানে রয়েছে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি আর আরামের আমেজ।

তাহলেও মন্দ লাগছে না। সামনে ও দুপাশে তাকালে শুধু পাহাড় আর পাহাড়, কালো আর সাদা পাহাড়। পেছনে শুধুই সবুজ, সবুজ পাহাড় আর সবুজ উপত্যকা। আমরা ক্রমেই সবুজ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি, সবুজ মানেই জীবন। যেখানে যাচ্ছি সেখানে জীবন নেই, একথা বলছি না। কিন্তু সে জীবনের সঙ্গে যে জনজীবনের সম্পর্ক নেই, সেকথা সত্য।

গাড়িতে দাঁড়িয়ে থাকার সময় পাছে আমরা একঘেয়েমীতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি তাই কর্তৃপক্ষ গান-বাজনার ব্যবস্থা রেখেছেন, মৃদুস্বরে কনসার্ট বাজছে। শুনতে ভালই লাগছে।

তাহলেও বলব, বাইরের দিকে তাকালে কারও একঘেয়েমীতে ক্লান্ত হয়ে পড়ার কথা নয়। পাহাড় দেখতে দেখতে আমরা পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে চলেছি। অঞ্চলটা দেখছি খুবই দুর্গম। গাছপালা প্রায় নেই বললেই চলে। কতগুলো পাহাড় এত খাড়া যে তাদের গায়ে বরফ জমতে পারে নি।

তাঁদের কথা ভেবে মাথা নত হয়ে আসছে, যাঁরা এই রোপওয়ে তৈরি করেছেন। তাঁদের যে এইসব পাহাড়ে উঠে কাজ করতে হয়েছে! তখন তো যন্ত্রবিজ্ঞান ও পূর্তবিদ্যার এত উন্নতি হয় নি। যাঁরা পর্বতাভিযানে গিয়েছেন, তাঁরা জানেন যে 'ফিক্সরোপ' করার জন্য কি প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে একজন মানুষকে এরকম দুর্গম ও দুস্তর পার্বত্য অঞ্চলে প্রথম এগিয়ে যেতে হয়। এখানেও তাই করতে হয়েছে। এবং অনেক সময়েই বহুজনকে তার চাইতে হয়তো বা বেশি ঝুঁকি নিয়ে এইসব 'কেবল' লাগাতে হয়েছে। আর তাই আমরা এমন আরামে মাউন্ট সানটিসে যেতে পারছি। শুধু মাউন্ট সানটিস নয়, সারা সুইজারল্যান্ডের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলেই এঁরা এইরকম নিরাপদ ও দ্রুতগামী পরিবহন ব্যবস্থা করে তুলেছেন।

পায়লট মাইকে আমাদের স্বাগত জানিয়ে বললেন—স্কোয়াগালুপ থেকে সানটিস শিখরের সোজাসুজি দূরত্ব এক কিলোমিটারের কিছু বেশি, কিন্তু উচ্চতার পার্থক্যের জন্য দু কিলোমিটার রোপওয়ে করতে হয়েছে।

তিনি আরও জানালেন—এই কেবল-রেলওয়ে তৈরি করতে ছ' বছরের মতো সময় লেগেছে। এবং তৈরি করার সময় কয়েকজন কর্মী শহীদ হয়েছেন।

তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে বলি—প্রাণের বিনিময়ে তোমরা যে পথ

তৈরি করে দিয়েছো, সেই পথের প্রতিটি পথিকের অন্তরে তোমরা চিরঅমর হয়ে রইবে।

আরও বিস্ময়ের কথা, এই দূরত্বটুকু অতিক্রম করতে মাত্র তিন মিনিট সময় লাগল। অর্থাৎ ভেতরে দাঁড়িয়ে গাড়িটাকে ধীরগতি মনে হলেও সেটি ঘণ্টায় চল্লিশ কিলোমিটার বেগে বয়ে এনেছে আমাদের।

গাড়ি থেকে নেমে আসার পরে প্রথম যেটি আমাকে আকর্ষণ করল, সেটি একটা বাড়ি। না, বাড়ি নয়, স্কাই-স্ক্র্যাপার। জনৈক সহযাত্রী জানালেন—চোদ্দতলা বাড়ি। এতে হোটেল, রেস্তোরাঁ, ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরস এবং অফিস…

—অফিস! এখানে অফিস!

—অফিস থাকবে না? অফিস তো থাকতেই হবে। এই কেব্‌ল্‌কারের অফিস, ট্যুরিস্ট অফিস, পুলিশ অফিস, ব্যাঙ্ক ও ইনসিওরেন্স অফিস, টেলিভিশান অফিস।

—টেলিভিশান অফিস! আমি আবার অবাক হই।

ভদ্রলোক আমাকে ইসারা করে খানিকটা দূরে টি ভি. টাওয়ার-টা দেখান। তারপরে বলেন—এই টাওয়ারের মাধ্যমে এখান থেকে পৃথক পৃথক ছ'টা স্টেশন টেলিকাস্ট করে থাকেন।

এবারে লক্ষ্য করে দেখি। এটা সত্যই সাধারণ টি ভি. টাওয়ারের মতো নয়। টাওয়ারের গায়ে বহু যন্ত্রপাতির অলংকার। ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়ে এগিয়ে চলি।

বলা বাহুল্য, রিগি-কুলমের মতো এটাও একটা পর্বতশিখর। তবে রিগির মতো অমন সবুজ ও প্রশস্ত নয়। তাছাড়া এখানে চারিদিকের পাহাড়গুলি খুবই কাছে, প্রায় প্রত্যেকটি পাহাড়ের মাথায় প্রচুর বরফ। আর সামান্য দূরে তুষারধবল আল্‌প্‌স।

কাছাকাছি সবুজ পাহাড় না থাকলেও সবুজ চোখে পড়ছে বৈকি! নিচের সবুজ উপত্যকা ও বাড়ি-ঘর এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ভারী ভাল লাগছে দেখতে, শুধু সবুজ উপত্যকা নয়, ঐ সাদা পাহাড়ের ঢেউ!

কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে রেস্তোরাঁয় আসি, সেই চোদ্দতলা বাড়িতে। ভেতরে আসতেই আবার ভাবনাটা এসে হাজির হয়। এতবড় বাড়ি তৈরির যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম এঁরা বয়ে এনেছেন এখানে। এবং বিদ্যুৎ থেকে শুরু করে খাবার পর্যন্ত প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় জিনিস এঁরা প্রতিদিন বয়ে আনছেন এখানে। আর তাই সারা বছর ধরে শত শত পর্যটক ছুটে আসছেন।

রেস্তোরাঁয় এসে পেস্ট্রী আর কমলার রস খেয়ে নিলাম। আলাপ হল একজন কর্মচারীর সঙ্গে। তিনি জানালেন—আমাদের কর্মীসংখ্যা খুব বেশি নয়। কেনই বা হবে? এখানে যে রান্না থেকে কাপড় কাচা ও ঘর পরিষ্কার পর্যন্ত সবই মেশিনে হয়। তাহলেও এই হোটেল ও রেস্তোরাঁয় আমরা বিশজন

স্থায়ী কর্মী রয়েছি। 'স্কি' করতে আসার জন্য শীতকালে বোর্ডারদের সংখ্যা বেড়ে যায়, তখন আরও কর্মী নিয়ে আসতে হয়।

আবার বেরিয়ে আসি বাইরে। আর এসেই দেখা হয়ে যায় মিস মারিয়ান অর্থাৎ আমাদের ফ্রেন্ড ফিলোসফার এ্যান্ড গাইডের সঙ্গে। তিনি পরের দলকে নিয়ে আমাদের কয়েক মিনিট পরে এখানে পৌঁচেছেন। এতক্ষণ কোথায় ছিলেন বুঝতে পারছি না, এইটুকু তো জায়গা, দেখা হওয়া উচিত ছিল।

ভদ্রমহিলা আমাকে দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন—এই যে ইণ্ডিয়ান, কেমন লাগছে ?

—ভাল।

—লাগতেই হবে। আমাদের সুইজারল্যাণ্ড হচ্ছে ড্রীম ল্যাণ্ড, স্বপ্নের দেশ। ভালো না লেগে উপায় আছে! যাক্ গে, সব দেখেছো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কিছুই দেখো নি! তিনি আমাকে রীতিমত ধমক লাগালেন। তারপরে আবার জিজ্ঞেস করলেন—চারিপাশের পাহাড়গুলি দেখেছো ?

—হ্যাঁ, দেখছি।

—নাম জানো ?

—আজ্ঞে না।

—এইবার পথে এসো। একবার থামেন তিনি। তারপরে আবার বলেন—আমার কাছে এসো, আমি সব চিনিয়ে দিচ্ছি।

আমি তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াই। তিনি ইসারা করে বলতে থাকেন—এই যে পূবদিকের পাহাড়টা দেখছ, এটার নাম আলট্মান (Altmaun), উচ্চতা ২৪৩৬ মিটার মানে ৭৯৯২ ফুট। আর ঐ যে খানিকটা উত্তরে পাহাড়টা দেখছ, ওটা ১৬৬৩ মিটার (৫৪৫৬ ফুট) উঁচু, নাম ক্রনবার্গ (Kronberg)। আর উত্তর-পশ্চিমের এই পাহাড়টার নাম হোশাল্প (Hochalp), এর উচ্চতা ১৫২২ মিটার, তার মানে ৪৯৯৩ ফুট।

এবারে দক্ষিণে তাকাও। ঐ যে পাহাড়টা দেখছ, ওটার নাম লুটিস্পিৎজ (Lutispitz), উচ্চতা ১৯৯০ মিটার (৬৫২৮ ফুট)।

আর এই সমস্ত পার্বত্য অঞ্চলটির কি নাম ব'লো দেখি!

—আমি জানি না।

—বেড়াতে এসেছো, অথচ কিছুই জেনে আসো নি! বৃদ্ধা আবার ধমক লাগালেন। তারপরে বললেন—এই সমস্ত পার্বত্য অঞ্চলটিকে বলে আল্প্স্টাইন (Alpstein)।

কথা ছিল আমরা সান্টিস শিখরে একঘণ্টা থাকতে পারব, কিন্তু দেড়ঘণ্টা থাকা গেল। কারণ তার আগে কেব্লকার পাওয়া গেল না। আমরা খুশি হলাম কিন্তু আমাদের গাইড ভীষণ রেগে গেলেন। তিনি নাকি আজই অফিসে

ফিরে গিয়ে এই প্রচণ্ড অব্যবস্থার জন্য তীব্র অভিযোগ করবেন।

যাই হোক, বিকেল সওয়া চারটের গাড়ি পাওয়া গেল। তবে এ গাড়ি আসার গাড়ি নয়, এ পথও সে পথ নয়। এটি অন্য পথ। গাইড বললেন—Winding path যার বাংলা করলে দাঁড়ায় কুণ্ডলাকার পথ।

কেন কুণ্ডলাকার বলছেন, বুঝতে পারছি না। কেবল দেখতে পাচ্ছি, এবারে প্রায় সোজা নিচে নেমে যাচ্ছি। মনে হচ্ছে যেন 'লিফ্‌ট'-এ করে নামছি। আর আমাদের দু'পাশে সবুজ গাছে ছাওয়া পাহাড়।

নতুন গাড়িতে করে নতুন পথে নেমে এলেও আমরা কিন্তু কোন নতুন জায়গায় উপনীত হলাম না। এসে পৌঁছলাম সেই একইপাহাড়তলী সোয়াগাল্‌প শহরে। তবে যাবার সময় যেখান থেকে কেব্‌লকার-এ চড়েছি সেখানে নয়, তারই অনতিদূরে অন্য একটা স্টেশনে।

অথচ স্টেশন থেকে বেরিয়েই দেখি, আমাদের বাসটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মানে পায়লট বাস নিয়ে এখানে চলে এসেছে।

বাসে এসে উঠি। একটু বাদে বাস চলতে শুরু করে। গাইড সবাইকে সময়মত ফিরে আসার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে বলতে থাকেন—আমরা এখন জুরিখ ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু যে পথে এসেছি, সে পথে নয়। আমরা জুরিখ থেকে এসেছি দক্ষিণ-পূর্ব পথে কিন্তু এবারে ফিরে যাবো উত্তর-পশ্চিম পথে। টগেনবুর্গ অঞ্চল হয়ে, এবারে ফিরে যাবো আপেনসেল (Appenzell) অঞ্চল দিয়ে।

এটি সুইস পর্যটন বিভাগের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাঁরা একই পথে আসা-যাওয়া পছন্দ করেন না। তাঁরা চান যাত্রাপথের প্রতিটি মুহূর্ত যেন পর্যটকদের কাছে নতুন স্বাদে ভরপুর হয়ে ওঠে।

সোয়াগাল্‌প শহর ছাড়িয়ে এসেছি। এখন বিকেল সাড়ে চারটে।

মাত্র মিনিট পাঁচেক পথ চলার পরে একটা সমৃদ্ধ শহরে উপস্থিত হলাম। শহর হলে কি হয়, পথের পাশে ও প্রতি বাড়িতে প্রচুর গাছপালা। বড় বড় গাছ। কেবল 'পীচ' আর পাইন গাছগুলো চিনতে পারছি। গাইড বললেন—এই ছায়া-সুনিবিড় শহরটির নাম উরনাশ (Urnasch)। এটি আপেনসেল (Appenzell) ক্যান্টনের অন্তর্গত। আপেনসেল সুইজারল্যাণ্ডের উত্তর-পূর্ব ক্যান্টন, অস্ট্রিয়া সীমান্তে অবস্থিত।

তেমনি মসৃণ পথ পেরিয়ে বাস চলেছে ছুটে। আমি শহর ও তার বনময় পরিবেশের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। সকালে বাবুজি বলেছেন, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বনভূমি ধ্বংস হয়ে যায়। কথাটা নিশ্চয়ই সুইজারল্যাণ্ড সম্পর্কেও সত্য। কিন্তু কতটুকু সত্য, তা বোধ করি সুইজারল্যাণ্ডে না এলে জানতে পারতাম না।

সত্যি বলতে কি, আমি তো সেই থেকে শুধু বাড়ি-ঘর আর তাদের বনময়

পরিবেশের দিকে তাকিয়ে আছি। বাড়িগুলি যেমন সুন্দর, তেমনি সুন্দর চারিদিকে গাছপালা, পাহাড় আর উপত্যকা। ভারী ভাল লাগছে।

গাইড বলেন—এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য এমন রমণীয় বলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিল্পীরা এখানে ছবি আঁকতে আসেন। গ্রীষ্মকালে পর্যটকরা আসেন 'হাইক্' (Hike) অর্থাৎ পদপরিক্রমা করতে আর শীতকালে তরুণ-তরুণীরা আসে 'স্কি' করতে। তার মানে এ অঞ্চলে সারা বছর ধরে পর্যটকদের ভিড় লেগেই আছে।

—এই ক্যাণ্টনে ইণ্ডাস্ট্রী কম। এ অঞ্চলে কিছু চাষ হয়। কিন্তু সামান্য লোকই চাষাবাদ করেন। বেশির ভাগ লোকের জীবিকা ট্যুরিজম ইণ্ডাস্ট্রী বা পর্যটন ব্যবসা।

একবার থামেন গাইড। তারপরে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসেন—আপনাদের কেমন লাগছে এ অঞ্চলটা ?

—ভাল, খুবই ভাল। আমরা বেশ কয়েকজন সমস্বরে বলে উঠি।

গাইড বলেন—আগামী মাসে অর্থাৎ জুলাইতে এলে আরও ভাল লাগত।

—কেন বলুন তো ? প্রশ্নটা না করে পারি না।

গাইড উত্তর দেন—তখন পথের পাশে নানা রঙের নানা রকম ফুলের বাহার দেখে আপনাদের মন ভরে যেত।

মন আমার এখনও ভরে গিয়েছে। তাহলেও আগামী মাসের মনোরম সেই ফুলের বাহার কল্পনা করে লুব্ধ হয়ে উঠি। কিন্তু কি করব ? সিলভিয়ার বিয়েতে এলেও তখন এদিকে আসার সময় হবে না।

এখন বিকেল পোনে পাঁচটা। একটা সবুজ ও সুপ্রশস্ত উপত্যকার ওপর দিয়ে বাস ছুটে চলেছে। পথের পাশে কোথাও নদী, কোথাও পাহাড়, আবার কোথাও বা বাংলো অথবা ভিলা। তবে সংখ্যায় সামান্য।

মোটরপথের পাশেই রেলপথ, পথের ডানদিকে। এদেশের রেল আমাদের চেয়ে ছোট, বোধ করি মিটার গেজ। সে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

পথের পাশে আবার অনেক বাড়ি-ঘর। বোধ হয় আরেকটা শহরে এলাম।

হ্যাঁ, আমার অনুমান মিথ্যে নয়।

গাইড বলেন—এ শহরটির নাম হেরিসাও (Herisau)। এখানে কয়েকটি কেব্‌ল বা তার তৈরির কারখানা ও স্পিনিং মিল বা কাপড়ের কল আছে। শহরটিও তেমন ছোট নয়, হাজার দশেক মানুষের বাস।

হাসি পায় আমার। আমাদের দেশে অন্তত লাখখানেক মানুষ বাস না করলে তাকে আমরা শহর বলে স্বীকৃতি দিতে চাই না। আর দশ হাজার লোকের শহরকে এঁরা ছোট শহর বলছেন না। অবশ্য কেনই বা বলবেন ? এঁদের জনসংখ্যা যে আমাদের এক শতাংশও নয়।

গাইড বলে চলেছেন—পর্যটকদের কাছে এই আপেনসেল ক্যাণ্টনের সর্ব-

শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ গীর্জানগরী সেণ্ট্ গাল (St. Gallen)। আমরা দুঃখিত আপনাদের সেখানে নিয়ে যেতে পারলাম না, সে আমাদের সামান্য উত্তর-পূর্বে পড়ে রইল। এখান থেকে সেণ্ট্ গাল যাবার মোটরপথ রয়েছে।

একবার থামেন গাইড কিন্তু আমরা কেউ কিছু জিজ্ঞেস করতে পারার আগেই আবার বলতে থাকেন—ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সবুজ পাহাড়ী শহর আপেনসেল এবং কনস্টান্‌স হ্রদের (Lake of Konstanz অথবা Bodensee) মাঝখানে অবস্থিত এই সুপ্রাচীন মন্দিরনগরী। লেস (Lace) এবং বয়নশিল্পের একটি বড় কেন্দ্র। ওখানকার এমব্রয়ডারী বিশেষ বিখ্যাত।

প্রাচীন ও আধুনিক স্থাপত্যের মিলন ঘটেছে এই মন্দিরনগরীতে। কথিত আছে, সেণ্ট্ গাল (Gall) নামে একজন আইরিশ সন্ন্যাসী ৬১২ খৃষ্টাব্দে ওখানে এসে প্রথম বসতি স্থাপন করেন। অষ্টম শতাব্দীতে একটি মঠ তৈরি হয়। সেই মঠকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে ওখানে গড়ে ওঠে য়ুরোপের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। সেণ্ট্ গাল গীর্জার বিদ্যালয় এবং গ্রন্থাগার আজও বিশ্ববিখ্যাত।

সময় পেলে আপনারা একদিন এসে দেখে যাবেন। দূরত্ব কিছুই নয়, জুরিখ থেকে মাত্র ৮০ কিলোমিটার, বড়জোর ঘণ্টা খানেক সময় লাগবে। দেখতে অবশ্য অনেক সময় লাগবে। তবে তেমন সময় হাতে না থাকলে, আপনারা অন্তত ক্যাথিড্রেলে যাবেন। সেখানেই দেখতে পাবেন বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারটির নাম 'Stiftsbibliothek' অর্থাৎ Abbey Library. গ্রন্থাগারে প্রবেশ করার সময় দেখবেন কাঠের দরজায় খোদাই করা রয়েছে 'Psyche iatreion', মানে 'Healing place of the soul'।

এই গ্রন্থাগারে আপনারা ধর্মপুস্তক থেকে কবিতা ও গানের লক্ষাধিক পুঁথি দেখতে পাবেন। হাজার বছর ধরে শত শত যাজক, কবি ও গায়ক এইসব অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। প্রধানতঃ প্রাচীন পুঁথির গ্রন্থাগার হলেও আপনারা ভেতরে ঢুকে বুঝতে পারবেন এটি একটি আধুনিক পদ্ধতির পাঠাগার। বইপত্র খুঁজে পেতে আপনাদের কোন অসুবিধে হবে না।

বাস ছুটে চলেছে। এখন আমরা উত্তরদিকে যাচ্ছি। আবার শুরু হয়েছে বন। কিন্তু তা কয়েক মিনিটের জন্য। তারপরেই একটি শহর। এখন বিকেল পাঁচটা।

গাইড বলেন—এই শহরের নাম গোসো (Gossau)। এখানে আমরা সাত নম্বর জাতীয় সড়ক অর্থাৎ এন. এইচ সেভেন পেলাম। এই রাস্তা ধরে এখন আমাদের পশ্চিমে যেতে হবে।

এতক্ষণ তাহলে যে রাস্তা দিয়ে এখানে এলাম, সেটি জাতীয় সড়ক নয়। অথচ কি সুন্দর মসৃণ ও প্রশস্ত পথ। সত্যি এঁরা দেশটাকে কত উন্নত করে গড়ে তুলেছেন। প্রতিটি পথের কি চমৎকার রক্ষণাবেক্ষণ!

এদেশে পাথুরে মাটি এবং বর্ষা অল্প হয়। তাই বলে রাস্তা কিছু কম মেরামত করতে হয় না। কারণ এদেশে তুষারপাত হয়। বরফ বৃষ্টির চেয়ে পথের বেশি ক্ষতি করে। তবু কি সুন্দর রাস্তা। এত বড় বাস, অথচ বোধ করি শ'খানেক কিলোমিটার বেগে এগিয়ে চলেছি।

আরেকটা ছোট শহরে এলাম। গাইড জানালেন—এ শহরের নাম উইল (Wil)। এখনও আমরা পশ্চিমে চলেছি।

গাইড বলেন—সাত শ' বছরের এই পুরোনো শহরটি মধ্যযুগীয় আদর্শ সুইস নগরীর সুন্দর উদাহরণ। দেখুন, পাহাড়ের পাদদেশে পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে কেমন সুন্দর দু-সারি বাড়ি। আর দেখুন, খানিকটা দূরের ঐ গীর্জা। ঐ গীর্জায় প্রবেশ করলে আপনারা চমৎকার আপেনসেল চিত্রশিল্পের সঙ্গে সুপরিচিত হতে পারবেন। যাঁরা সেণ্ট্ গাল দেখতে আসেন, তাঁরা আসা-যাওয়ার পথে এখানেও কিছুক্ষণ কাটিয়ে যান।

শহর ছাড়াবার পরে আবার পথের প্রকৃতি একই রকম। পাহাড় বন উপত্যকা আর ক্ষেত। শুধু সবুজ আর সবুজ, সীমাহীন সবুজ।

কয়েক মিনিট বাদেই আরেকটা শহরে এলাম। এটি মনে হচ্ছে অপেক্ষাকৃত বড় শহর। কিছু কলকারখানাসহ বহু বাড়ি-ঘর।

আমি গাইডের দিকে তাকাই। তিনি বলেন—এই শহরের নাম উইণ্টারঠুর (Winterthur)। এখানে আমাদের সাত নম্বর জাতীয় সড়কের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে। এখান থেকে সে চলে গিয়েছে বাজেল অর্থাৎ ফ্রান্স ও জার্মানীর দিকে। বাজেল পশ্চিমদিকে আর জুরিখ দক্ষিণে। এবারে আমরা অপেক্ষাকৃত ছোট রাস্তা দিয়ে জুরিখ পেঁছিব।

—জুরিখ পেঁছিতে আর কতক্ষণ লাগবে? জনৈকা যুবতী ঘড়ি দেখে জিজ্ঞেস করেন।

গাইড উত্তর দেন—এক ঘণ্টাও লাগবে না। আমরা ছ'টা নাগাদ জুরিখে পেঁছে যাবো।

জনৈক বৃদ্ধ সহযাত্রী প্রশ্ন করেন—আচ্ছা, আজকের এই ভ্রমণে আমরা কতখানি দূরত্ব অতিক্রম করলাম?

গাইডও একটু চুপ করে থাকেন। বোধ করি মনে মনে হিসেব করে নিচ্ছেন। একটু বাদে বলেন—তা আড়াই শ' কিলোমিটার হবে।

আমরা বেলা একটায় জুরিখ থেকে রওনা হয়েছি। গাইড বলছেন ছ'টা নাগাদ ফিরে যাবো। তার মধ্যে দেড়ঘণ্টা সান্টিস শিখরে ছিলাম। অর্থাৎ বাসে করে আড়াইশ' কিলোমিটার পাহাড়ী পথ অতিক্রম করতে মাত্র সাড়ে চারঘণ্টা সময় লাগল। এই গতিবেগই য়ুরোপের বৈশিষ্ট্য এবং বোধ করি য়ুরোপকে য়ুরোপ করে গড়ে তুলেছে।

॥ বারো ॥

আজও বাবুজি আমার সঙ্গী হতে পারলেন না। বিড়লাজীর সঙ্গে তাঁকে যেন কোথায় যেতে হবে। তাই আজও ব্রেকফাস্ট করেই আমাকে তাঁর কাছে বিদায় নিতে হয়েছে।

তবু জুরিখ ট্যুরিস্ট অফিস থেকে বাস ছাড়ার পরে বাবুজির কথাই মনে পড়ে গেল। মনে পড়ার অবশ্য একটা কারণ আছে। আমি ট্যুরিস্ট বাসে জুরিখ সিটি ট্যুর করছি। সেই সুপরিচিত বানহোপ স্ট্রাসে দিয়ে বাস চলেছে। আর চলতে চলতে দেখতে পাচ্ছি, আজ তিনি ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে যা বলেছেন, তার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। তিনি বলেছেন—জুরিখ হচ্ছে একটি 'Boulevard lined at one end with banks and squat department stores, which suddenly opens into a lake of brightest blue covered with sailboats and swans.'

আমরা এখন সেই পথ দিয়ে সেই হ্রদের দিকে এগিয়ে চলেছি। কিন্তু চলার পথের কথা থাক, বাবুজির কথাগুলো ভাবা যাক। তিনি আরও বলেছেন—কল্পনা কর একটা আধুনিক ব্যস্ত শহর, যার সারা বিশ্বের ব্যবসা ক্ষেত্রে অসাধারণ খ্যাতি, অথচ সেই শহরের 'Stock markets and broker's houses stand a five-minutes walk from brooding forests and mountain chateaux.'

সত্যি বলতে আমি আজ বাসে ওঠার পর থেকেই বাবুজির কথাগুলোর সঙ্গে জুরিখ শহরকে মিলিয়ে নিচ্ছিলাম আর সেই সঙ্গে ভাবছিলাম তিনি সঙ্গে থাকলে জুরিখ সম্পর্কে আরও কত কথা জানতে পারতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, আজও তিনি আমার সঙ্গী হতে পারলেন না।

সকাল সাড়ে ন'টার একটু পরে ট্যুরিস্ট অফিসে পৌঁছেছি। ক্ষীণ আশা ছিল, আজ হয়তো ললিতা ও কৌশিকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। কিন্তু না, ওরা আসে নি। আর আসবে না। কিন্তু কেন? তাও জানতে পারব না কোনদিন।

টিকেট কেটে বাসে উঠে বসেছি। আজও মিস মারিয়ান অর্থাৎ গতকালের সেই বৃদ্ধা আমাদের গাইড। কিন্তু আজ তিনি জাপানী বলছেন না, ইংরেজীর সঙ্গে জার্মান ও স্প্যানিশ বলছেন। আমার ধারণা, ভদ্রমহিলা ফরাসী এবং ইতালীয়ান ভাষাও জানেন। এঁরা দেখছি সবাই প্রায় ভাষাচার্য। এক-একজন খুদে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সকাল দশটায় বাস ছেড়েছে। 'Sight-seeing tour' বলে বাস আস্তে আস্তে চলেছে। নইলে এমন তেলের মতো রাস্তা পার হতে আর কতক্ষণ লাগত?

বড় জোর দশ-পনেরো মিনিট। অবশ্য পথে জ্যাম-জট না থাকলেও ট্রাফিক-লাইট রয়েছে। এবং আমাদের প্রায় প্রতি লাইটে থামতে হয়েছে। না থেমে উপায় নেই। কারণ এখানে মোড়ের মাথায় পুলিশ না থাকলেও ক্যামেরা বসানো রয়েছে। ট্রাফিক আইন অমান্য করলেই গাড়ির নাম্বার-প্লেটের ছবি উঠে যাবে। সরকারী গাড়ি হলেও ফাইনের বিল চলে আসবে। পায়লটকে পরিশোধ করতে হবে। তাই বানহোপ স্ট্রাসে পার হয়ে আসতে আমাদের পঁচিশ মিনিট সময় লেগে গেল। আমি জানতাম 'strasse' শব্দটার উচ্চারণ 'স্ট্র্যাসী', কিন্তু বাবুজি বলেছেন শব্দটা স্ট্র্যাসী নয় 'স্ট্রাসে'।

যাক্ গে, যেকথা বলছিলাম, ট্যুরিস্ট অফিস থেকে এই লেকের ধারে বুর্কলিপ্লাট্স (Burkliplatz) অর্থাৎ বানহোপ স্ট্রাসের শেষপ্রান্তে পেঁছিতে পঁচিশ মিনিট সময় লেগে গেল। এখন সময় সকাল দশটা পঁচিশ। সময়টাও যাতায়াতের পক্ষে সুসময় নয়। পৃথিবীর সব দেশের বড় শহরে কাজের দিনে সকাল দশটায় পথে ভিড় থাকে।

গাইড পনেরো মিনিট বিরতি ঘোষণা করলেন। পঁচিশ মিনিট বাসযাত্রার পরেই পনেরো মিনিট বিশ্রাম! তাহলেও আমরা সানন্দে নেমে আসি গাড়ি থেকে, জায়গাটা যে জুরিখ লেকের ধারে।

গাড়ি থেকে নেমে আসার পরে গাইড বললেন—বিরতি মানে এই নয় যে খেয়াল-খুশি মতো যে কোন দিকে চলে যাবেন। আপনারা কেউ কোথাও যাবেন না, সবাই আমার সঙ্গে আসুন।

অতএব তাঁরই সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে লেকের ধারে আসি। পরশুদিন সকালেও এখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে গিয়েছি। তবে তখন হ্রদের দিকে তাকাবার তেমন ফুরসৎ পাই নি, ললিতার কথা শুনতে হয়েছে। আজ ললিতা নেই, আমার অফুরন্ত অবসর। আজ তাই চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখি আর গাইডের কথা শুনি। তিনি বলছেন—এখানে দাঁড়িয়ে আপনারা জুরিক হ্রদের চমৎকার দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন।···

আমরা মাথা নাড়ি। গাইড বলে চলেছেন—শীতকালে এখানে এলে প্রচুর পাখি দেখতে পেতেন। তারা তখন আল্পসের তুষারাবৃত অঞ্চল থেকে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ অঞ্চলে অর্থাৎ শহরে এসে বাসা বাঁধে। আর এখন এই গ্রীষ্মকালে···

একবার থামেন তিনি। আমরা তাঁর মুখের দিকে তাকাই। তিনি লিম্যাৎ ও জুরিখ হ্রদের সঙ্গমে নির্মিত পুলটার দিকে ইসারা করে আবার বলতে থাকেন—দেখুন, অত গাড়ির মধ্যেও পুলের ওপরে বসে ছেলেমেয়েরা মাছ ধরছে।

এখান থেকে দেখতে পাওয়া কষ্টকর। সেদিনই বলেছি হ্রদ এবং নদীর সঙ্গমে যে পুল তথা কি ব্রুক্ (Quai Brucke), সেটি জুরিখের সবচেয়ে বড় পুল। সর্বদা তার ওপর দিয়ে ঝড়ের বেগে গাড়ি যাতায়াত করছে। তাহলেও

মৎস্যশিকারীদের দেখতে পাচ্ছি বৈকি। তাঁরা বঁড়শি ফেলে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন।

দেখছি আর শুনছি। উঠতে পারছি না। চুপচাপ বসে থাকতে হচ্ছে, উপায় কি? ভদ্রমহিলা যে বড্ড কড়া। তাঁকে গাইড না বলে 'গার্ড' বলাই উচিত হবে। কারণ তিনি সত্যি সত্যি আমাদের পাহারা দিয়ে রেখেছেন। কেউ একটু এদিক ওদিক যাবার চেষ্টা করলেই ধমক লাগাচ্ছেন। তবে সেই সঙ্গে নানা মজার খবর দিচ্ছেন। এখন বলছেন—জুরিখ পুরনো শহর। ১৯৮৫ সালে সমারোহের সঙ্গে এই শহরের দু-হাজার বছরের প্রতিষ্ঠা উৎসব পালন করা হবে। তবে ফরাসী সীমান্তের সুইস শহরগুলি যেমন বাজেল (Basel) নয়সাতেল (Neuchatel) লয়সানে (Lausanne) ও জেনিভা (Geneva) ইত্যাদি এর চেয়ে প্রাচীনতর।

—এসব শহরগুলি জুরিখের চেয়ে কত পুরনো? জনৈক পর্যটক প্রশ্ন করেন।

গাইড উত্তর দেন—খুব বেশি নয়, বড় জোর বছর পঞ্চাশ।

—তাই বলুন! আমরা ভাবলাম, না জানি কত পুরনো।

—তেমন কথা ভাবেন কেমন করে? আমাদের জুরিখ কি নতুন শহর! ভদ্রমহিলা বোধ হয় রেগে গিয়েছেন।

আমার আমেরিকান সহযাত্রীটি বুঝতে পারেন ব্যাপারটা। তাই সবিনয়ে বলেন—আজ্ঞে আমি ঠিক সেকথা বলি নি।

—কি বলেছেন তাহলে?

—আমি বলতে চেয়েছি, আমাদের প্রাচীন জুরিখ মহানগরীর চেয়ে তারা আর কতই বা প্রাচীন হবে?

—তাই বলুন! গাইডের স্বরে খুশির আমেজ। সহাস্যে বলেন—আমি ভাবলাম, আপনি বোধ হয় আমাদের জুরিখকে আবার নতুন শহর ভেবে বসলেন!

—না, না, তা ভাবব কেমন করে? আমি তো জানি, জুরিখ দু-হাজার বছরের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রাচীন শহর।

—থ্যাংক ইউ। গাইড সহযাত্রীটিকে ধন্যবাদ জানান। তারপরে আবার বলতে শুরু করেন—খ্রীষ্টপূর্ব ১৫ অব্দে জুরিখ শহরের প্রথম পত্তন হয়। লিনডেনহোপ্ (Lindenhop) অঞ্চল থেকে এই শহরের শুরু। কিছুক্ষণ বাদে আমরা সে অঞ্চলে যাবো।···

আমরা মাথা নাড়ি। কারণ খবরটি আমাদের অজানা নয়।

গাইড বলে চলেছেন—খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে জুরিখ শহরের স্বীকৃতি পায়। সুরক্ষিত শহর রূপে জুরিখের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১২১৮ খ্রীষ্টাব্দে জুরিখ একটি 'Free Imperial City' রূপে মর্যাদা পায়। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে স্থানীয় সওদাগরদের সংগঠন (Guild) ছিল জুরিখ শহরের শাসক।

একবার থামেন গাইড। তারপরে তিনি আবার বলতে শুরু করেন—আপনারা

জানেন, আমাদের ইতিহাস রাজা-রানী কিম্বা মন্ত্রী-সামন্তের ইতিহাস নয়। আমাদের ইতিহাস দেশের সাধারণ মানুষদের ইতিহাস, চাষী মজুর ও সওদাগরদের ইতিহাস।

আমরা আবার মাথা নাড়ি। গাইড খুশি হয়ে বলতে থাকেন—১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে সওদাগরদের গিল্ড-এর তরফ থেকে রুডলফ বার্ণ (Rudolf Burn) এ নগরের নাগরিকদের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করেন। সুইস কনফেডারেশনে যোগ দেবার পূর্ব পর্যন্ত সেটাই ছিল জুরিখবাসীদের আবশ্যিক আইন এবং নাগরিক অধিকারের রক্ষাকবচ। পনেরো বছর পরে ১৩৫১ সালে জুরিখ কনফেডারেশনে যোগদান করে।

তারপর থেকে সুইজারল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে জুরিখের প্রভাব বাড়তেই থাকে। কিন্তু এই প্রভাব বিশেষ ভাবে ব্যাপ্তিলাভ করে পঞ্চদশ শতাব্দীতে জুরিখের মেয়র হান্‌স ওয়াল্ডমানের (Hans Waldmann) আমল থেকে। অবশেষে ঊনবিংশ শতকে মেয়র আলফ্রেড-এশচার (Alfred Escher, মৃত্যু ১৮৮২) আমল থেকে জুরিখ সুইজারল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রে উন্নীত হয়। আপনারা সবাই জানেন, জুরিখের প্রধান বাণিজ্য হল বয়নশিল্প, ঘড়ি, ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স ও পর্যটন।

থামেন গাইড। কিন্তু জনৈকা তরুণী তাঁকে চুপ করে থাকতে দেয় না। সে প্রশ্ন করে বসে—মাদাম, জুরিখের উচ্চতা কত ?

—থ্যাঙ্ক ইউ। গাইড বলে ওঠেন।

ব্যাপার কি ? আমরা রীতিমত বিস্মিত।

গাইড বলছেন—ভারী বুদ্ধিমতীর মতো প্রশ্নটা করেছো ! কোন জায়গায় বেড়াতে এলে প্রথমেই সে জায়গার ভৌগোলিক অবস্থাটা জেনে নিতে হয়।

—ভৌগোলিক অবস্থা মানে ?

—জায়গাটির অবস্থান, উচ্চতা, তাপমাত্রা, আয়তন ইত্যাদি এবং সেই সঙ্গে জনসংখ্যাটাও জেনে নেওয়া ভাল।

—বেশ তো, বলুন। মেয়েটি অনুরোধ করে। সে গাইডের প্রশংসায় খুশি হয়েছে।

মিস মারিয়ান শুরু করেন—জুরিখের উচ্চতা সমুদ্র সমতা থেকে ১৩৪২ ফুট অর্থাৎ ৪০৯ মিটার। জুরিখ নগরীর আয়তন ৩৫.৫ বর্গমাইল। আর তোমরা সবাই জানো, জুরিখ শহরের স্থায়ী জনসংখ্যা চার লাখের মতো।

মেয়েটি মাথা নাড়ে। গাইড বলে চলেন—এ শহরে সবচেয়ে শীতের সময় জানুয়ারী, তখন এখানে তাপমাত্রা সাধারণতঃ ১ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত নেমে যায়। আর জুরিখের সবচেয়ে গরম পড়ে জুলাই মাসে। তখন এখানে সাধারণতঃ +১৬ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপ ওঠে।

গাইড থেমে যান, ঘড়ি দেখেন। ভাবি এবার বোধ হয় তাঁর ভূগোলের ক্লাশ

নেওয়া শেষ হল। কিন্তু না, তিনি আবার বলতে শুরু করেছেন। তবে এবারে আর ভূগোল নয়, রাষ্ট্রনীতি। আমরা শুনতে থাকি। তিনি বলছেন—ফেডারেল সরকার দেশের শাসক হলেও, শহরের প্রকৃত শাসক 'সিটি বোর্ড'। প্রতি চার বছর অন্তর নাগরিকরা ভোট দিয়ে এই বোর্ড গঠন করেন। ১২৫ জন সদস্যের বোর্ডে ৯ জন সদস্য নিয়ে এগ্‌জিকিউটিভ কমিটি। তাঁরাই জুরিখ শহরের শাসক ও উন্নয়নের উদ্যোক্তা। আরেকটা কথা………

আমরা গাইডের দিকে তাকাই। তিনি বলেন—মধ্য-পশ্চিম সুইজারল্যাণ্ডের বার্ণ (Berne) শহর হোল ফেডারেল সরকারের বর্তমান রাজধানী। ১৮৪৮ সালে জুরিখ থেকে সেখানে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তবু সাংস্কৃতিক, আর্থিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আজও জুরিখ সুইজারল্যাণ্ডের প্রকৃত রাজধানী। তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো, সমসাময়িক শিল্পকলায় জুরিখের 'School of Concrete Art'-এর অবদান সবচেয়ে বেশি। তাছাড়া এই শহরে পঞ্চাশটির ওপরে আর্ট গ্যালারী রয়েছে। জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় দেশের বৃহত্তম এবং এখানকার পলিটেক্‌নিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যালয়সমূহের অন্যতম।

থামলেন গাইড। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বাঁচা গেল। ভদ্রমহিলার ক্লাশ নেওয়া শেষ হয়েছে। তাড়াতাড়ি আমরাও উঠে দাঁড়াই। তাঁর সঙ্গে বাসে ফিরে আসি। একটু বাদে বাস চলতে শুরু করে।

হ্রদের তীর ধরে খানিকটা পূবে পুলের দিকে এগিয়ে বাস বাঁয়ে বাঁক নিল। সেদিনের সেই স্টাটহাউস স্ট্রীটে প্রবেশ করলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই অপরূপ দৃশ্যের সম্মুখীন হলাম।

গাইড বলে উঠলেন—দেখুন, 'a perfect picture postcard shot of the old town and the river dominated by the twin towers of the Grossmunster.'

সত্যই চোখ ফেরানো যাচ্ছে না। সেদিন এই পথে পুরোন শহর থেকে হ্রদের তীরে এসেছি, আজ হ্রদের তীর থেকে শহরের ভেতরে চলেছি। দৃশ্যটা কিন্তু একই রকম। আজও সেদিনের মতই চমকিত হচ্ছি, পুলকিত হচ্ছি।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত স্টাটহাউস বা মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিংস-এর পাশ দিয়ে বাস এগিয়ে চলেছে। পথের বাঁদিকে ফ্রাওমুনস্টার গীর্জা।

বাস থেমে যায়। গাইডের পেছনে আমরা নেমে আসি বাস থেকে। গাইড বলেন—ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত এই গীর্জা জুরিখের প্রাচীনতম দেবালয়। এটি এদেশের প্রথম গথিক স্থাপত্য। কিন্তু কেবল প্রাচীনত্বই এই গীর্জার একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। ফ্রেসকো চিত্রের জন্য এই গীর্জা অবশ্য দর্শনীয়। ১৯২৮ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে পল বড্‌মার (Paul Bodmer) নামে জনৈক

শিল্পী চিত্রগুলো অঙ্কন করেছেন। বাইবেল এবং জুরিখ-ইতিহাসের বাস্তব ও কল্পিত কাহিনী অবলম্বনে চিত্রগুলি অঙ্কিত।

ফ্রেসকো ছাড়াও এই গীর্জায় আপনারা কয়েকটি চিত্রিত কাচের জানলা দেখতে পাবেন। এগুলো ১৯৭০ সালে অঙ্কিত। প্রখ্যাত প্রবীণ শিল্পী মার্ক শাগাল (Marc Chagall) এগুলো এঁকেছেন। যখন তিনি জানলাগুলো আঁকা শেষ করেন, তখন তাঁর বয়স তিরাশি বছর।

নেমে আসি বাস থেকে। গাইডের সঙ্গে গীর্জায় প্রবেশ করি। কাঠের বড় দরজা পার হয়ে বাঁদিকে চারধাপ সিঁড়ি। তারপরে একটুকরো ব্যালকনী। আবার চারধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে উপাসনা গৃহ ও দেবালয়। মাঝখানে লাল গালিচা পাতা পথ। দুপাশে সারি সারি বেঞ্চি ও চেয়ার। বেঞ্চিগুলিতে হেলান দেবার ব্যবস্থা আর চেয়ারগুলিতে বসার জায়গা শণ জাতীয় দড়ি দিয়ে ছাওয়া। এদেশে প্লাস্টিকের পরিবর্তে দড়ি। খুবই অস্বাভাবিক।

গীর্জার দুপাশের দেওয়ালের প্রায় অর্ধাংশ কাঠ দিয়ে মোড়া। কাঠের ওপরে খোদাই কাজ।

উপাসনাগৃহের প্রান্তে প্রার্থনা বেদি ও ক্রুশবিদ্ধ যীশু। পেছনের দেওয়ালে তিনটি ও দুপাশে দুটি কাচের জানলা। তারই ওপরে সেই অপরূপ চিত্রসম্ভার। এই দেবালয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন।

আমরা দেখি। কিন্তু দেখা শেষ হবার আগেই গাইডের তাগিদে গীর্জা থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। বেরুবার সময় গাইড বলেন—বিয়ে এবং শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের জন্য এ গীর্জায় ভিড় লেগেই থাকে।

বাসে এসে উঠি। বাস এগিয়ে চলে।

একটু বাদে গাইড বলেন—বাঁদিকে এই যে বাড়িটা দেখছেন, এটার নাম জুনফ্‌ট্‌হাওস সুয়ার মেজি (Zunfthaus Zur Mesie)। এটা জুরিখের সবচেয়ে সুন্দর ব্যারাক বাড়ি। মদ ব্যবসায়ীদের গিল্ড ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এটি তৈরি করেছেন। এই বাড়িতে প্রচুর চীনামাটির বাসনপত্র (Ceramic Collection) সঞ্চিত ও সুসজ্জিত রয়েছে। আর আছে একটি 'ব্যাংকোয়েট্' (Banquet) হল। সেখানে বিয়ে কিম্বা 'ফ্যাশন শো'-এর আসর বসে।

এই ব্যারাক বাড়ির পেছনেই মুনস্টারহোপ (Munsterhof) স্কোয়ার। সেখানেই রয়েছে আরেকটা সুন্দর বাড়ি। নাম জুনফ্‌ট্‌হাওস সুয়ার ওয়াগ্ (Zunfthaus zur Wagg)। Linen weavers' and Hatmakers' Guild সেটি তৈরি করেছেন। অন্যান্য অনেক গিল্ডহলের মতো এটাও এখন একটা রেস্তোরাঁ।

সামনেই সেই মুনস্টার পুল, যে পুল পেরিয়ে সেদিন আমরা লিম্যাৎ নদীর পূবপার থেকে পশ্চিমপারে এসেছিলাম। আজ পশ্চিমপার থেকে পূবপারে

যাবো। কিন্তু তার আগে বোধ করি পুরনো শহরের খানিকটা অংশ আমাদের দেখানো হবে। তাই বাস এখন একটি অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত পথ দিয়ে উত্তরে এগিয়ে চলেছে।

একটু আগে গাইড যে ঐতিহাসিক গিল্ডহলের কথা বলছিলেন, তারই পাশ দিয়ে এলাম। পথের দু-দিকে সারি সারি দোকান। অধিকাংশ প্রাচীন নিদর্শনের পণ্যশালা বা 'Antique shop'।

খানিকটা এগিয়ে পথের বাঁদিকে আরেকটা গীর্জা। তারই সামনে এসে বাস থেমে যায়। গাইড বলেন—এই গীর্জাটির নাম সেণ্ট্ পিটার'স চার্চ বা 'St. Peterskirche'। এটি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত। গীর্জার টাওয়ারে ঐ যে ঘড়িটা দেখছেন, ওটা য়ুরোপের একটি বৃহত্তম ঘড়ি। এই ঘড়িটি একসময় সারা দেশের সময় নির্দেশ করত।

একবার থামেন গাইড। তারপরে আবার বলতে শুরু করেন—অষ্টাদশ শতকে নির্মিত এই গীর্জায় ব্যারাক হল-টির গম্বুজগুলি গোলাপী ও কমলা রঙের মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরি। দেখবার মতো। বিখ্যাত সুইস কবি ও চিন্তাবিদ জে কে লাভেটার (J. K. Laveter, ১৭৪১-১৮০১ খৃঃ) জীবনের শেষ সতেরো বছর এ পাড়ায় বাস করেছেন।

বাস আবার এগিয়ে চলেছে। আমরা দেখছি আর দেখছি। মনে হচ্ছে কোন রূপকথার রাজ্যে বিচরণ করছি।

গাইড বলেন—বাঁদিকের এই পথটি দিয়ে আমরা বানহোপ স্ট্রাসে ফিরে যেতে পারি। কিন্তু তা যাবো না। আমরা পুরোন জুরিখ শহরকে আরেকটু দেখব।

—তাই ভাল। জনৈক পর্যটক মত প্রকাশ করেন।

গাইড বলেন—এখন আমরা নদীর তীর দিয়ে রাটহাউস পুলের দিকে এগিয়ে চলেছি। ঐ দেখুন, সামনে ডানদিকে রাটহাউস পুল দেখা যাচ্ছে। এ পুলটি বেশ প্রশস্ত, কিন্তু তুলনায় গাড়ি যাতায়াতের সংখ্যা খুবই কম। তাই দেখুন পুলের ওপরে দোকানের মেলা, ফুলের দোকান ফলের দোকান স্ন্যাক্স বার ও পানীয়ের দোকান।

সবার সঙ্গে আমিও দেখি। ভিড় দেখছি, মন্দ নয়। তাহলে এদেশেও হুকার আছে !

—এটা জুরিখের সবচেয়ে পুরনো গলি, নাম সিফ্ (Schipfe)। গাইড ইসারা করে দেখিয়ে দেন। তারপরে যোগ করেন—এই গলিপথটি সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত।

তার মানে, আমি ভাবি—জুরিখ দু-হাজার বছরের প্রাচীন জনপদ হলেও মাত্র কয়েকশ' বছরের স্মৃতি ধারণ করে আছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগে নির্মিত কোন স্মৃতি এখনও দেখতে পেলাম না।

বাস থেমে গেল। নামতে হবে কি? না, গাইড বসে রয়েছেন। তিনি মাইক হাতে নিয়েছেন। বলছেন—এই পথটির নাম ফরটুনাগাসে (Fortuna-gasse) বা সৌভাগ্য সরণি। আর সামনের ঐ পার্কটার নাম লিন্‌ডেনহোপ স্কোয়ার।…

লিন্‌ডেনহোপ্! তাড়াতাড়ি তাকাই। এখান থেকেই যে জুরিখ শহরের শুরু।

গাইড বলে চলেছেন—ওপরে দেখুন লিন্‌ডেনহোপ, একটা টিলা। টিলার ওপরে আছে একটি ঝরণা। ঝরণাটি আমাদের এক আশ্চর্য-সুন্দর গৌরবগাঁথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

—কাহিনীটা একবার বলুন না, মাদাম! একাধিক সহযাত্রী একযোগে বলে ওঠেন।

মাদাম খুশি হন। কারণ কাহিনীটি জুরিখের নারীসমাজের গৌরবগাঁথা। তিনি বলতে শুরু করেন—এটি ১২৯২ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। অস্ট্রিয়ার হাব্‌সবুর্গ সৈন্যরা জুরিখ আক্রমণ করল। জুরিখের প্রতিরক্ষা বাহিনী জীবনপণ সংগ্রাম করেও হাব্‌সবুর্গদের তাড়িয়ে দিতে পারলেন না। তাঁদের বহু সৈন্য মারা গেলেন, অনেকেই আহত হলেন আর বাকিরা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন।

জুরিখ বাহিনীর বাধা অপসারিত হবার পরেও শত্রুরা কিন্তু শহরে প্রবেশ করতে সাহসী হল না। প্রথমতঃ তাদেরও অনেক নিহত এবং আহত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ তারা বুঝতে পারে নি যে জুরিখের প্রতিরক্ষা শক্তি সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত। তাঁরা তাই বিশ্রাম নিয়ে পরবর্তী প্রতিরোধের প্রতীক্ষা করতে থাকে।

এদিকে জুরিখে নারীরা বুঝতে পারলেন, তাঁদের জন্মভূমির স্বাধীনতা বিপন্ন, এখুনি বিদেশীরা শহরে ঢুকবে। সবাই তখন দলে দলে ছুটে গেলেন শহরের সীমান্তে। নিজেরা মৃত ও আহত সৈনিকদের পোশাক পরে নিলেন, তাঁদের অস্ত্র-শস্ত্র হাতে নিয়ে আবার ছুটে এলেন এখানে। তারপরে সারি বেঁধে উঠে গেলেন এই টিলার ওপরে। হাত-পা নেড়ে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, এখুনি তাঁরা আবার প্রতিরক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত হয়েছেন।

আহত ও ক্লান্ত বিদেশীরা ভাবল—সর্বনাশ, জুরিখের তাহলে আরও অনেক সৈন্য আছে! এবং তারা বদলা নিতে আসছে। শত্রুরা তখন দলনেতাকে বলল—জুরিখ দুর্ভেদ্য, আমাদের পক্ষে জুরিখ জয় করা সম্ভব নয়। চলুন, আমরা পৈতৃক প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাই।

তাই পালিয়েছিল ওরা। আর ওরা পালিয়ে যাবার পরে জুরিখের বুদ্ধিমতী ও সাহসী মেয়েরা হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়েছিলেন লিন্‌ডেনহোপের বুকে। তাই তাঁদের স্মৃতিতে এই টিলার ওপরে তৈরি করা হয়েছে একটি কৃত্রিম ঝরণা। পর্যটকরা প্রায় প্রত্যেকেই সেটি দেখে যান। আপনারাও

দেখে আসুন।

গাইড গাড়িতেই বসে থাকেন, আমরা গাড়ি থেকে নেমে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি ওপরে। প্রথমে ঝরণাটি দেখি। ভারী সুন্দর, তারপরে চারিদিকে তাকাই। সত্যই অপরূপ, বিশেষ করে লিম্যাৎ নদী। খরস্রোতা নদীর বুকে অসংখ্য চলমান নৌকো আর মোটরবোট, মনে হচ্ছে ভাসমান রঙ্গীন ফুল। লিম্যাতের এপারে পুরোন জুরিখ আর ওপারে নতুন জুরিখের সদাব্যস্ত মোটরপথ। কাছে অতীত, দূরে বর্তমান। কাছে অবসরের শান্তি, দূরে কর্মের আনন্দ।

কাছের চাইতে দূরের দিকেই বেশি নজর পড়ছে। দেখা যাচ্ছে বহুদূর। দেখা যাচ্ছে সারিনগার বা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও প্রেডিগার গীর্জার (Predigerkirche) নীলচূড়া। শুনেছি চতুর্দশ শতকে নির্মিত এই গীর্জাটি জুরিখে গথিক শিল্পকলার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। গীর্জার পেছনে বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চল, গাছে গাছে সবুজ হয়ে আছে।

কিন্তু এই অপরূপ দৃশ্য বেশিক্ষণ দেখার অবকাশ নেই। পায়লট হর্ন দিচ্ছেন। এদেশের পথে গাড়ির হর্ন বড় একটা শুনতেই পাওয়া যায় না। অকারণে হর্ন দেওয়া অমার্জনীয় অসভ্যতা। শব্দদূষণ সম্পর্কে এঁরা সবাই সমান সচেতন। এদেশে আসার পর থেকে আমি আজ পর্যন্ত মাইকের শব্দ শুনি নি। অথচ তার মানে এই নয় যে,কেউ রেডিও কিম্বা টেপ রেকর্ডার শোনেন না। ঘরে শোনেন এমনভাবে যে প্রতিবেশীদের কানে পৌঁছয় না, আর পথে শোনেন নিজের কানে হেডফোন লাগিয়ে। তাই পায়লটের হর্ন কানে আসা মাত্র সহযাত্রীরা হুড়মুড় করে নিচে নামতে শুরু করে দিলেন। আমাকেও তাঁদের সামিল হতে হল।

নিচে নেমে দেখি মিস মারিয়ান বাসের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমরা এসে তাঁকে ঘেরাও করি। তিনি সামনের দিকে ইসারা করে বলেন—আপনারা যদি এর পরের পুল অর্থাৎ রুডলফ-বার্ণ (Rudolf-Burn) ব্রিজ পার হয়ে ওপারে যান, তাহলেই জুরিখের ল্যাটিন কোয়ার্টার্সে পৌঁছে যাবেন। তারপরে মুয়েলেগাসে (Muhelegasse) নামে অপ্রশস্ত পথটি দিয়ে সোজা এগিয়ে গেলেই 'Red-light District'—নাম নিডারডর্ফ (Niederdorf)। মদের দোকান, রেস্তোরাঁ ও হোটেলে বোঝাই এই অঞ্চলটি জুরিখের 'hottest nightlife centre'। অবশ্য জুরিখের 'nightlife moderate' প্যারী কিম্বা অন্যান্য বিশ্ববিখ্যাত শহরের মতো নয়। আপনারা যে কোন দিন রাতে সেখানে গিয়ে পান-ভোজন করে নাচ দেখে আসতে পারেন। নাইটক্লাব ও রেস্তোরাঁগুলো রাত দুটো পর্যন্ত খোলা থাকে।

Red-light District পার হলেই আপনারা পৌঁছে যাবেন সারিনগার ও প্রেডিগার অঞ্চলে।···

—আমরা কখন গাড়িতে উঠব মাদাম? জনৈক প্রবীণ পর্যটক প্রশ্ন করে বসেন। ভদ্রলোকের বোধ করি দাঁড়িয়ে থাকতে অসুবিধে হচ্ছে। হবারই কথা। চড়াই উৎরাই করে ফিরেছেন।

মিস মারিয়ান একটু লজ্জা পেয়ে যান। তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন—এখুনি উঠব! উঠুন!

তিনি দরজা থেকে দূরে সরে দাঁড়ান। প্রবীণ ভদ্রলোকের পরে আমরাও একে একে গাড়িতে উঠে আসি। সিটে গা এলিয়ে দিই। আরাম লাগে।

বাস চলতে শুরু করে। মিস মারিয়ান কিন্তু ভূলে যাবার পাত্রী নন। তিনি মাইক হাতে নিয়ে অসম্পূর্ণ কথা বলতে শুরু করেন—সময় পেলে একদিন আপনারা অবশ্যই প্রেডিগার গীর্জাটি দেখে আসবেন। দেখার পরে কিছুক্ষণ কিন্তু প্রেডিগার গাসে দিয়ে পায়চারি করতে ভুলবেন না। 'গাসে' মানে পথ। এই পথটি জুরিখ শহরের সবচেয়ে সুন্দরভাবে রক্ষিত প্রাচীন পথ। পথটি প্রশস্ত নয়, তবু সেটি ভাল লাগবে আপনাদের। ইচ্ছে করলে ঐ পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আপনারা নয়মার্কট (Neumarkt) বা নিউমার্কেটে চলে যেতে পারেন।

থামলেন মিস মারিয়ান। বাস ছুটে চলেছে। আমি চেয়ে চেয়ে দেখছি—আমি যে জয়ন্তী জুরিখের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

—আণ্টি, এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি?

এইরে সেরেছে! আমাদের মিস মারিয়ান রীতিমত ডাকসাইটে রমণী। আর তাই বোধ করি তিনি 'মিসেস' হতে পারেন নি। তাঁকে কিনা আমেরিকান মেয়েটা 'আণ্টি' বলে ফেলল! আণ্টি মানে যেমন মাসিমা ও পিসিমা, তেমনি কাকীমা আর জেঠিমাও তো বটে। মেয়েটার কপালে আজ দুঃখ আছে।

কিন্তু না, আমার আশঙ্কা সত্য হল না। মিস মারিয়ান কোমল কণ্ঠে বলে উঠলেন—Yes my child! এখন আমরা Mountain of Zurich দেখতে যাচ্ছি।

তার মানে জেঠিমা তো নয়ই, কাকীমাও নয়। নিশ্চয়ই মিস মারিয়ান 'আণ্টি' অর্থে মাসিমা বলে ধরে নিয়েছেন।

মেয়েটার সাহস বেড়ে গিয়েছে। সে আবার জিজ্ঞেস করে—সেখানে কি দেখার আছে আণ্টি?

—বোকা মেয়ে! মধুর স্বরে মিস তিরস্কার করেন। তারপরে বলেন—মাউণ্টেন অব্ জুরিখ মানে জুরিখ শহরের পাহাড়ী অঞ্চল।

—সেখানে কি দেখব?

—Heavenly hills and beautiful villas. কয়েক হাজার কোটি-

পতির বাড়ি আছে সেখানে।

কোটিপতি কথাটা আমার কানে আঘাত করে। তিনি কোটি বলতে কি বোঝাচ্ছেন? কোটি টাকা? না, নিশ্চয়ই না। সম্ভবতঃ ডলার, নিদেনপক্ষে সুইস ফ্রাঙ্ক। তার মানে অন্তত পাঁচ কোটি টাকার মালিক কয়েক হাজার মানুষ জুরিখের পাহাড়ী অঞ্চলে এসে বাসা বেঁধেছেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা চড়াই ভাঙতে শুরু করি। চড়াই হলেও যেমন মসৃণ, তেমনি পরিচ্ছন্ন পথ। তাছাড়া পাহাড়ী পথের তুলনায় পথটা বেশ সোজা ও বাঁকের সংখ্যা খুবই কম। ফলে বুঝতেই পারছি না, বাস পাহাড়ী পথ ভাঙছে। এবং প্রায় একই গতিতে বাস চলেছে।

এখন পথের পাশে ছবির মতো বাগানঘেরা বাড়ি। অধিকাংশই দোতলা এবং চারতলার চেয়ে উঁচু বাড়ি চোখে পড়ছে না। কেনই বা পড়বে? এখানে যে ফ্ল্যাটবাড়ি নেই। ধনীরা প্রমোদভ্রমণের নীড় রচনা করেছেন।

কি জানি, এরই কোন বাড়িতে হয়তো আলেকজান্দার দুমা (১৮০৩-১৮৭০ খ্রীঃ) কিম্বা স্যার আর্থার কোনান ডয়েল (১৮৫৯-১৯৩০ খ্রীঃ) বাস করে গিয়েছেন। দুমার কথা বলতে পারি না কিন্তু শার্লক হোমস খ্যাত কোটি কোটি পাউণ্ডের মালিক ডয়েল এখানে বাড়ি কিনে বাস করবেন, এ তো খুবই স্বাভাবিক। তাছাড়া তিনি বহুদিন সুইজারল্যাণ্ডে ছিলেন। এবং শুনেছি, এদেশের পর্যটন ব্যবসার অসামান্য সাফল্যে তাঁর অবদান রীতিমত স্মরণীয়।

মিস মারিয়ান এতক্ষণ স্প্যানিশ ও জার্মান বলছিলেন। এবারে ইংরেজীতে বলছেন—এ অঞ্চলে একটি ছোট বাড়ি কিনতে অন্তত ৭/৮ লক্ষ ফ্রাংক্ লেগে যাবে।...

তার মানে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ টাকা। তা লাগুক গে, আমি তো আর বাড়ি কিনতে আসি নি। তার চেয়ে গাইডের কথা শুনে পনেরো ফ্রাঙ্কের বাসটিকেট সার্থক করা যাক। তিনি বলছেন—আগেই বলেছি, এটা কোটি-পতিদের পাড়া। কয়েক হাজার কোটিপতি এখানে বাড়ি করছেন। তাঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নাগরিক। এবং তাঁদের মধ্যে আমেরিকানদের সংখ্যাই বেশি।

একবার থামেন তিনি। তারপরে অপেক্ষাকৃত ভারী গলায় আবার বলেন—দুঃখের কথা, সুইসদের সংখ্যা খুবই কম। আর এখানকার কথা না হয় বাদই দিলাম। এটা আন্তর্জাতিক ধনীদের পাড়া। জুরিখ শহরের অন্যান্য অঞ্চলেই বা এখন ক'টা বাড়ি আদি জুরিখবাসীদের! অথচ পঞ্চাশ বছর আগেও প্রায় প্রত্যেকটি জুরিখ-পরিবারের নিজস্ব বাড়ি ছিল এই শহরে। আর এখন? শুনলে অবাক হবেন, এই শহরের পঁচাত্তর শতাংশ বাড়ি বিদেশীদের।

সে কি! এ যে দেখছি, কলকাতার সমস্যা এখানেও বিদ্যমান। এমনটি তো আশা করি নি। এখানে আসার পর থেকেই জুরিখের সমৃদ্ধি দেখে প্রতি

পদক্ষেপে পুলকিত হয়েছি। আর এখন শুনতে পাচ্ছি, সেই সমৃদ্ধিতে জুরিখ-বাসীদের অধিকার মাত্র এক-চতুর্থাংশ। মনটা খারাপ হয়ে যায়।

এদিকটায় দেখছি বাড়ির সংখ্যা কম, গাছের সংখ্যা বেশি। গাছ তো নয়, যেন বন। যদিও জানি, এরা সযত্নে লালিত ও পালিত। ভারী সুন্দর ছায়াশীতল পথ পেরিয়ে বাস এখন নিচের দিকে চলেছে। আমরা বোধ করি পাহাড় থেকে নেমে যাচ্ছি।

কিন্তু সেকথা জিজ্ঞেস করার সুযোগ পাই না। গাইড একটা বাড়ি দেখিয়ে বলছেন—এটা হোটেল। এর সঙ্গেই গল্‌ফ খেলার মাঠ রয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন সেক্রেটারী অব্‌ স্টেট হেন্‌রী কিসিঙ্গার কয়েকবার এসে থেকে গিয়েছেন এই হোটেলে।

আমার অনুমান মিথ্যে নয়। আমরা সত্যই পাহাড় থেকে নেমে এসেছি। এসেছি সমতল জুরিখে, একেবারে বানহোপ স্ট্রীটে, এত অতর্কিতে নেমে এলাম যে আবার বাবুজির কথাটা মনে পড়ে গেল—'Stock-markets and brokers' houses stand a five munite walk from brooding forest and mountain chateaux'.

মিস মারিয়ান মাইক হাতে নিয়ে বলছেন—বন্ধুগণ, আমাদের জুরিখ সিটি ট্যুর এখুনি শেষ হয়ে যাবে। আশা করি, আপনারা এই রমনীয় নগর দর্শন উপভোগ করেছেন। আবার আমাদের দেখা হবে, এই আশা নিয়ে জুরিখ ট্যুরিস্ট অফিস এবং আমার ও পায়লটের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জার্মান ও স্প্যানিশে ধন্যবাদ দেওয়া শেষ করতে পারার আগেই বাস এসে থেমে গেল। ফলে চুপচাপ বসে বসে সেই দুর্বোধ্য বাণী শ্রবণ করতে হল।

তারপরে যথারীতি একটি সুইস ফ্রাঙ্ক্‌ পায়লট কেবিনে প্লেটের ওপর রেখে দিয়ে নেমে আসি বাস থেকে।

দুপুর বারোটা বেজে পাঁচ মিনিট। আজকের ভ্রমণ ছিল সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত। মাত্র দু-ঘণ্টার ট্যুর। ভাড়াও কম, ১৫ ফ্রাঙ্ক্‌।

সে তো বুঝলাম। এদিকে যে মোটে দুপুর! এখন জুগে ফেরার কোন মানে হয় না। কিন্তু কোথায় যাই, কি করি?

সবার আগে লাঞ্চ সেরে নেওয়া দরকার। তাহলে কি আণ্ডারগ্রাউণ্ড মার্কেটে যাবো?

না। বাবুজি বলেছেন, জুরিখে নাকি বেশ কয়েকটি ভাল ভেজিটারিয়েন রেস্তোরাঁ রয়েছে। সেগুলিতে ভারতীয় নিরামিষ খাবার পাওয়া যায়। তিনি আমাকে একটা রেস্তোরাঁর নামও বলে দিয়েছেন—রেস্তোরাঁ গ্লাইস (Gleich), অপেরা হাউসের কাছে। আমি নাকি এখান থেকে এক বাসে চলে যেতে পারব। কিন্তু কোন্‌ বাস? ট্যুরিস্ট্‌ অফিসে জিজ্ঞেস করা যাক।

জিজ্ঞেস করতেই ভদ্রলোক জুরিখ শহরের একখানি মানচিত্র আমাকে দিয়ে জায়গাটি কোথায় বুঝিয়ে দিলেন। তারপরে বললেন—অপেরা হাউসের সামনে বাস থেকে নেমে বাঁদিকে খানিকটা এগিয়ে গেলে স্টাডেলহফের প্লাট্স (Stadelhofer Platz) তারই সংলগ্ন জেফেল্ড স্ট্রাসে (Seefeld Strasse)। সেই রাস্তাতেই ৯ নম্বর বাড়িতে আমার রেস্তোরাঁ।

আধঘণ্টার মধ্যে অপেরা হাউসের সামনে পেঁছে গেলাম। গতকাল মাউণ্ট সান্‌টিস যাবার সময়, এদিক দিয়ে অর্থাৎ জুরিখ হ্রদের এই পূর্বতীর দিয়েই গিয়েছি। কিন্তু তখন অপেরা হাউসটিকে দেখা হয় নি। আজ সেটি দেখা গেল।

জুরিখের থিয়েটার ও অপেরার নাকি য়ুরোপে বেশ নাম আছে। গ্রীক ট্র্যাজিডি থেকে একালের কমেডি পর্যন্ত সবই এঁদের থিয়েটারে অভিনীত হয়। ইংরেজী সহ বিভিন্ন ভাষার নাটক এঁরা অভিনয় করেন। তবে সেগুলো দেখা আমাদের পক্ষে খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। কারণ থিয়েটারের একখানি টিকিটের দাম ১০ থেকে ৩৬ সুইস ফ্রাংক অর্থাৎ ৫০ থেকে ১৮০ টাকা। কিন্তু এই অপেরা হাউসের টিকেট নাকি খুবই সস্তা। মাত্র ৬ ফ্রাংক অর্থাৎ ৩০ টাকা হলেই ভেতরে যাওয়া যায়। এবং এত সস্তায় নাকি য়ুরোপের আর কোন বড় শহরে এত ভাল অপেরা হাউসে প্রবেশাধিকার মেলে না।

আমার অবশ্য সে বাসনা নেই। মনের খিদে নয়, আমি পেটের খিদে মেটাতে এ পাড়ায় এসেছি। অতএব রেস্তোরাঁটি খোঁজা শুরু করি। এবং কয়েক মিনিটের চেষ্টায় খোঁজ পেয়ে যাই।

বাইরে দেখছি বেশ বড় বড় করে লেখা রয়েছে, এটি নিরামিষ ভোজনালয়। এখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নিরামিষ খাদ্য পাওয়া যায়। দেশগুলির নাম পর্যন্ত লেখা রয়েছে। এবং বলা বাহুল্য তার মধ্যে ভারতের নামটাও আছে।

আমি ভেতরে আসি। বেশ ভিড়। খালি টেব্‌ল তো দূরের কথা খালি চেয়ার পর্যন্ত দেখছি না। শুধু ঘরে নয়, বাইরের উঠোনেও দেখছি খাবার ব্যবস্থা রয়েছে। উন্মুক্ত আকাশতলে নিরামিষ আহার ভালই হবে। আমি ঘর পার হয়ে বাইরে আসি। আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। একখানি খালি টেব্‌ল পেয়ে যাই। তাড়াতাড়ি এসে বসে পড়ি।

টেব্‌লের ওপরেই মেনুকার্ড রয়েছে। চোখ বোলাতে শুরু করি। শুধু 'স্যালাড'-ই রয়েছে পনেরো রকমের। দাম ৩·৮০ ফ্রাঁ থেকে ৬ ফ্রাঁ। রয়েছে Cooked-Vegetables, রান্না করা সবজি। দাম ৬·৭৫ ফ্রাঁ। রয়েছে 'Noodles with Tomato sauce and Corn-cheese dish. দাম ৭·৫০ ফ্রাঁ। আর রয়েছে Indian lunch, পোলাও ঘুঘনি পাঁপর ও স্যালাড। দাম ১২ ফ্রাঁ। এটাই নেওয়া যাক। আমি বেয়ারা ডাকার জন্য মুখ তুলে তাকাই। আর তখনি কানের পাশে পরিচিত নারীকন্ঠ—গুড আফ্‌টারনুন মিস্টার ঘোষ দস্তিদার !

তাড়াতাড়ি পাশ ফিরে তাকাই। আরে এ যে মণিকা! দাঁড়িয়ে মুচকি হাসছে। তার সঙ্গে জনৈক সুশ্রী যুবক।

—তুমি এখানে! দাঁড়িয়ে কেন, ব'সো।

—থ্যাঙ্ক ইউ।

ওরা দুজনেই আসন গ্রহণ করে।

তারপরে মণিকা বলে—গতকাল তো আপনাকে বলেছি, আমি আজ ছুটি নিয়ে জুরিখ আসব।

আমি মাথা নাড়ি। মনে মনে ভাবি, ভাগ্যিস তখন প্রশ্ন ক'রে বসি নি—কেন জুরিখ যাবে? এখন ওর জুরিখ আসার কারণ বুঝতে পারছি। মণিকা তার বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছে। মুখে বলি—ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও। ইসারা করে আমি ওর বয়ফ্রেণ্ডকে দেখিয়ে দিই।

—I am sorry. He is Paul, my husband.

—হাজব্যাণ্ড! তুমি বিবাহিতা?

মণিকা মৃদু হাসে। বলে—Oh yes. এক বছর হল আমাদের বিয়ে হয়েছে!

মণিকা ওর স্বামীর কাছে আমার পরিচয় দেয়। আমরা করমর্দন করি। দুজনে বলি—তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় ভারী খুশি হলাম।

এটা পাশ্চাত্য সভ্যতার আন্তর্জাতিক শিষ্টাচার।

আমি তাকিয়ে তাকিয়ে ওদের দুজনকে দেখি। দুজনেই লম্বা ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। চোখমুখও সুশ্রী। দুটিতে সত্যই ভারী সুন্দর মানিয়েছে। মনে মনে বাবা বিশ্বনাথের কাছে ওদের সুখ ও শান্তি কামনা করি।

তারপরে হাসতে হাসতে পল্‌কে বলি—সুইস হলেও আপনার স্ত্রীর নামটি ইণ্ডিয়ান।

—জানি। আপনারা নাকি প্রায়ই ওকে একথা বলেন। একটু হেসে পল্‌ বলে।

—কিন্তু আপনি বোধ হয় জানেন না, যে আপনার নামটাও ইণ্ডিয়ান!

—You mean Paul?

—হ্যাঁ। তবে Firstname নয়, Surname.

—That's good. Paul you are also Indian like me. মণিকা উচ্চহাসিতে ফেটে পড়ে। আমরাও হাসি। তারপরে মণিকা জিজ্ঞেস করে—আমি তাহলে খাবারের অর্ডার দিয়ে আসি!

খাবার আসে। কিন্তু Indian Lunch নয়। তাহলেও খেতে খারাপ লাগে না।

শেষ পর্যন্ত পল্‌ প্রায় জোর করে আমার দাম দিয়ে দেয়। আমি কাশীশ্বরের কাছে আবার ওদের সুখ ও শান্তি কামনা করি। তারপরে বেরিয়ে আসি রেস্তোরাঁ থেকে।

মণিকা আমাকে জিজ্ঞেস করে—আপনি কি এখন জুগ ফিরে যাবেন ?

—না। ভাবছি গ্রসমুন্স্টার চার্চ ও ন্যাশনাল মিউজিয়াম দেখব।

কি যেন একটু ভাবে মণিকা। তারপরে বলে—চলুন। আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।

—না, না। তার কোন দরকার নেই। আমি একাই দেখে নিতে পারব। তোমরা আজ ছুটি নিয়েছো। তোমরা ঘরে ফিরে যাও। Enjoy yourselves.

—Enjoy !

—Yes.

—Oh no ! Let him go alone. I'll be with you. তার কণ্ঠস্বরটা শেষদিকে বেশ একটু কর্কশ শোনায়।

পল্ কিন্তু কিছুই বলে না। সে আমার সঙ্গে করমর্দন করে। তারপরে মণিকার গালে একটা ছোট্ট চুমু খেয়ে নিয়ে হাত নাড়তে নাড়তে বলে—আবার দেখা হবে। গুডনাইট।

আমিও হাত নেড়ে একই কথা বলি। এটাও পাশ্চাত্য সমাজের আন্তর্জাতিক শিষ্টাচার।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে তেয়াটার (Theater) স্ট্রাসের মোড়ে আসি। মণিকা বলে—আগে চলুন, গ্রসমুন্স্টার যাওয়া যাক।

—বেশ চলো। আমি মাথা নাড়ি।

বাস আসে। আমরা উঠে বসি। বেলভিউ হয়ে আমরা লিম্যাৎ রোডে আসি। সেই নদীপারের পথ। আমার সুপরিচিত। প্রথম দিন জুরিখ ভ্রমণের সময়েই এ পথ দেখেছি।

গ্রসমুন্স্টার চার্চের সামনে বাস থেকে নামলাম। সেই সুউচ্চ চূড়াসহ সুবিশাল ও সুপ্রাচীন দেবালয়। মণিকা বলে—Cathedral of Zurich বলতে এই গীর্জাকেই বোঝায়। তাছাড়া এই গীর্জাকে বলা হয় 'mother church of the Swiss-German reformation.

—এটি কবেকার গীর্জা ?

—খ্রীষ্টীয় নবম শতকে এখানে একটি ছোট গীর্জা ছিল। কিন্তু সেটি ধ্বংস হয়ে যায়। পরে ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে সেই গীর্জার জায়গায় এই গীর্জা নির্মাণ শুরু হয়। ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণকার্য মোটামুটি শেষ হয় এবং তখন থেকেই এটি দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দেবালয়। তবে এই যে সবুজ রঙের সুউচ্চ 'টাওয়ার' বা চূড়া দুটি দেখছেন, এ দুটি তৈরি হয়েছে পঞ্চদশ শতাব্দীতে।

—হ্যাঁ, টাওয়ার দুটি সত্যি দেখার মতো।

—Yes, the most distinctive landmark of Zurich. তবে অষ্টাদশ শতকে টাওয়ার দুটিকে আরও সুন্দর করা হয়েছে।

একবার থামে মণিকা। তারপরে বলে—চলুন এবারে ভেতরে যাওয়া যাক।

—হ্যাঁ, চলো।

আমি তার সঙ্গে চলতে শুরু করি।

চলতে চলতে মণিকা বলে—এটি রোমান চার্চ। ঐ যে দক্ষিণ-চূড়ার সঙ্গে মূর্তিটি দেখছেন, ওটি হল শার্লেমাগ্নের (Charlemagne) প্রতিনিধি বিগ্রহ। তিনিই এই গীর্জার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর অতিকায় আসল মূর্তিটি রয়েছে এই গীর্জার ভূগর্ভস্থ কক্ষে (Crypt)। মূর্তিটির বয়স পাঁচশ' বছরের বেশি। ১৪৫০ থেকে ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত।

কথিত আছে, জুরিখ রক্ষার যুদ্ধে নিহত কয়েকজন শহীদকে কবর দেওয়া হয়েছিল এখানে। একদিন শার্লেমাগ্নে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন। এখানে এসে হঠাৎ তাঁর ঘোড়া মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। তিনি তখন বুঝতে পারলেন, শহীদদের অতৃপ্ত আত্মা তাঁর ঘোড়াকে ফেলে দিয়েছে। তিনি তাই শহীদদের আত্মার মুক্তির জন্য এখানে এই গীর্জা প্রতিষ্ঠা করলেন। গীর্জার ভেতরে একখানি শিলালিপিতে কাহিনীটি খোদিত রয়েছে।

আমরা ভেতরে আসি। সুবিশাল দেবালয়। প্রথমেই মাটির নিচের ঘরখানিতে আসি। মূর্তিটি দেখি। সত্যই সুপ্রাচীন ও সুবিশাল মূর্তি।

ওপরে উঠে বেদীর সামনে আসি। মণিকা বলে—আমি আগেই বলেছি, এটি যেমন 'Cathedral of Zurich' তেমনি 'the home of Swiss reformation.' আধুনিক সুইস ইতিহাসের জনক উল্‌রিশ সুইঙলি (Ulrich Zwingli) ১৫১৯ থেকে ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এখান থেকে সমাজ সংস্কারের কথা প্রচার করেছেন। ধর্মান্ধতা কুসংস্কার ও অলৌকিক কাহিনীর বিরুদ্ধে সবাইকে সংগ্রাম করতে বলেছেন, পাদরী ও সন্ন্যাসিনীদের (Nun) প্রকাশ্যে বিয়ে করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি নিজেও একজন সন্ন্যাসিনীকে বিয়ে করেছিলেন।

আপনি তো জানেন যে সুইজারল্যাণ্ড তখন বিভিন্ন দেশকে ভাড়াটে সৈন্য সরবরাহ করত। তিনি এই ব্যবসা বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। যেসব ক্যাণ্টন তাঁর নিদের্শ মানতে রাজী হল না, তিনি তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এবং শেষ পর্যন্ত—১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধক্ষেত্রেই তিনি শহীদ হলেন। শত্রুরা মৃত্যুর পরে তাঁর দেহকে টুকরো টুকরো করে আগুন ধরিয়ে দিল। কিন্তু তাঁর আত্মত্যাগ বিফল হল না। তাঁর আদর্শ সমগ্র সুইস জীবনধারাকে উদ্বেলিত করে তুলল। তিনি এদেশের সমাজসংস্কারের প্রাণপুরুষ রূপে স্বীকৃত হলেন। অতএব এই গীর্জা কেবলমাত্র একটি ধর্মীয় পীঠস্থান নয়, দেশকে অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের পাদপীঠ।

বেরিয়ে আসি গীর্জা থেকে। মণিকা সঙ্গে আসায় সত্যই খুব সুবিধে হল। একে তো আমি পথ চিনি না, তার ওপরে মেয়েটা লেখাপড়া জানে। এরা অবশ্য সবাই দেশের কথা জানে। য়ুরোপের শিক্ষা প্রধানতঃ বৃত্তিমূলক

হলেও স্কুলে ছেলে-মেয়েদের দেশের কথা পড়তে হয়। সেদিন সিলভিয়াকে দেখেছি, আজ মণিকাকে দেখলাম।

গ্রসমুনস্টার থেকে বাসে করে সেণ্ট্রাল রেলস্টেশনে ফিরে এলাম। মণিকা জানায়—এই স্টেশনের পেছনেই 'The Landesmuseum' অর্থাৎ জাতীয় যাদুঘর।

আমরা ভেতরে না ঢুকে পাশের পথ দিয়ে স্টেশনের উত্তরদিকে আসি। স্টেশনের দক্ষিণে বানহোপ স্ট্রাসে ও উত্তরে মিউজিয়াম স্ট্রাসে। পর্যটকরা যাতে রেল থেকে নেমেই যাদুঘর দেখতে পারেন তারই ব্যবস্থা। অবশ্য জুরিখে পঞ্চাশটির বেশি মিউজিয়াম আছে, বিভিন্ন বিষয়ের মিউজিয়াম। কোনো পর্যটকের পক্ষেই সবগুলি দেখা সম্ভব নয়, আমার পক্ষে তো নয়ই। তাই অন্তত প্রধান যাদুঘরটি একবার দেখে যাই।

পথের ডানদিকে অর্থাৎ দুটি নদীর সঙ্গমে ত্রিভুজাকৃতি ভূখণ্ডে যাদুঘর। অপরূপ অবস্থান। আমরা গেট পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করি।

মণিকা বলে—সোমবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকে এই মিউজিয়াম। এখানে ঢুকতে কোন টিকিট লাগে না। মাত্র এক ফ্রাঁ দিয়ে একখানি 'বুক্‌লেট' কিনে নিলে এই মিউজিয়াম সম্পর্কে মোটামুটি জেনে নিতে পারবেন।

শুধু অবস্থান নয়, বাড়িটিও দেখুন কেমন সুন্দর ও কত বড়। ধূসর রঙের পাথর দিয়ে তৈরি এত বড় বাড়ি আপনি আর সুইজারল্যাণ্ডে দেখতে পাবেন না। এখানে সুইজারল্যাণ্ডের ইতিহাস, বাণিজ্য ও শিল্পকলার অসংখ্য নির্দশন সুসজ্জিত রয়েছে। সুদূর অতীত থেকে আধুনিক কালের নির্দশন। এটি পৃথিবীর একটা সর্বশ্রেষ্ঠ মিউজিয়াম।

আমরা ভেতরে প্রবেশ করি। মণিকা আবার বলে—এই মিউজিয়ামের প্রধান উদ্দেশ্য হল 'a systematic survey of our past embracing all aspects of life, cultural epochs and regions of the country.'

দেখতে আরম্ভ করেই ওর কথার সত্যতা উপলব্ধি করি। এ তো যাদুঘর নয়, জীবনের প্রদর্শনী, সুইস-জীবন। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিকের কথা কালক্রম অনুসারে ভারী সুন্দর ভাবে বলা হয়েছে। মনে হচ্ছে আমার চোখের সামনে কেউ একটা ক্যালাইডোস্কোপ (Kaleidoscope) বা সেই দূরবীন লাগিয়ে দিয়েছে, যার ভেতরে তাকালে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল দৃশ্য দেখা যায়।

বিভিন্ন যুগের কতগুলো ঘর বা মডেল-রুম (Model room) ও অপরূপ শিল্পকলার মাধ্যমে এই ক্রমবিবর্তনকে প্রকাশ করা হয়েছে। এইসব মডেল রুমের মধ্যে রয়েছে Blackfriars monestry ও Fraumunster Abbey, রয়েছে কয়েকটি ধনীদের কক্ষ। রয়েছে সেই যুগের আসবাবপত্র, রুপোর তৈজসপত্র, যুদ্ধের পোশাক, অস্ত্রশস্ত্র ও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র। প্রদর্শিত হয়েছে

ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সুইস ঘড়ি তৈরির ইতিহাস। আমার মনে হচ্ছে আমি আল্পসের একটি শিখরে দাঁড়িয়ে সমগ্র য়ুরোপের জীবনধারাকে দেখতে পাচ্ছি, মনে হচ্ছে ক্যালাইডোস্কোপের ভেতর দিয়ে যুগে যুগে পরিবর্তিত সুইস-জীবনের বিভিন্ন দিকগুলো কালক্রমানুসারে অবলোকন করছি।

অবশেষে আমরা এলাম ঐতিহাসিক কুটিরশিল্প কক্ষে। কক্ষ না বলে বোধ করি বাজার বলাই ভাল। এখানে রয়েছে প্রাচীন যুগের ময়দার কল, জুতোর কারখানা, গোরুরগাড়ির কারখানা ও মদ তৈরির কারখানা। তবে এগুলো সবই উনবিংশ শতকের মডেল।

এখানেও কিছু চমৎকার আসবাবপত্র রয়েছে। রয়েছে ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত একটি কয়লার স্টোভ। একটি প্রাচীন টাকশাল এবং সুইগুলির তরোয়াল ও শিরস্ত্রাণ।

রয়েছে আরও অনেক দেখার জিনিস। কিন্তু দেখতে পারলাম না। কারণ পাঁচটা বাজে, মিউজিয়াম বন্ধের সময় হয়ে গেল।

বেরিয়ে এলাম জাতীয় যাদুঘর থেকে। মণিকা জিজ্ঞেস করে—এখন কি জুগে ফিরবেন না আরও কোথাও যাবার আছে?

—তোমার অনেক দেরি হয়ে গেল।

—না, না। দেরি হবে কেন, আমি তো আজকাল অফিস থেকে রাত দশটার পরে ফ্ল্যাটে ফিরি।

—কিন্তু আজ তো ছুটি নিয়েছো। পল্ বেচারী একা রয়েছে।

—এক্সকিউজ মি মিস্টার ঘোষ দস্তিদার, এটা আপনাদের ইণ্ডিয়া নয়। আমাদের যেমন একা থাকার অভ্যেস আছে, তেমনি আমরা জানি কি ভাবে একাকিত্বকে দূর করা যায়। তাছাড়া পল্ এখন কোথায়, তা যেমন আপনি জানেন না আমিও জানি না। তবে সে এখনও ফ্ল্যাটে ফেরে নি এবং কখন ফিরবে তাও জানা নেই আমার।

ব্যাপারটা ব্যক্তিগত এবং আমি ওদের কেউ নই। তবু মনটা খারাপ হয়ে যায়। দুটিকে দেখে তখন ভারী ভাল লেগেছিল। তাই বাবা বিশ্বনাথের কাছে ওদের সুখ ও শান্তি কামনা করেছি। এখন দেখছি, ওরা একে অপরকে বিশ্বাস করে না। অথচ বিশ্বাস দাম্পত্যজীবনে সুখ ও শান্তির চাবিকাঠি। তাই বাবা বিশ্বেশ্বরকে আবার বলি—তুমি ওদের অবিশ্বাস দূর করো, ওদের জীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনো।

মণিকা কিন্তু কেমন নীরব হয়ে গেছে। অস্বস্তিকর নীরবতার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য তাড়াতাড়ি বলে উঠি—আমি এখন জুগে ফিরব তবে তার আগে এক কাপ চা পেলে ভাল হয়। আর আমার একটু সুতো কিনতে হবে।

—সুতো! বুঝতে পারে না মণিকা।

—হ্যাঁ, সেলাই করার জন্য কালো সুতো। আমার প্যান্টটার সেলাই খুলে

গিয়েছে। সূচ আর সাদা সুতো আমার কাছে রয়েছে। কিন্তু তাতে চলবে না।

—আপনি জেলমলি (JELMOLI) দেখেছেন, জুরিখের সবচেয়ে বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরস্ ?

—দেখেছি, রাস্তার ওপর থেকে। ভেতরে যাই নি।

—তাহলে সেখানেই চলুন। সুতো কিনে চা খেয়ে নেওয়া যাবে।

—সামান্য সুতো কেনার জন্য অত বড় দোকানে যাবো ?

—তাতে কি হয়েছে। বড় দোকান বলেই তো যেতে বলছি।

সুতরাং সম্মত হই। হাঁটতে হাঁটতে আমরা জেলমলির সামনে আসি। সুবিরাট অট্টালিকা। সবটা জুড়েই দোকান। মানুষের যা কিছু প্রয়োজন, সবই পাওয়া যায় এখানে।

কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, দোকানের অঙ্গসজ্জা। বাইরের শো-কেসে কয়েকটি পূর্ণাবয়ব নারী ও পুরুষের জীবন্ত মূর্তি। তাদের পরণে নানা রকমের পোশাক। সত্যি তাকিয়ে থাকবার মতো। শুধু তাই নয়, যেদিকে তাকাই চোখ ফেরাতে পারি না। যেমন রকমারী জিনিসের প্রদর্শনী তেমনি আলোর বাহার আর এসক্যালেটারের ওঠা-নামা।

যাই হোক মণিকার সঙ্গে এসক্যালেটারে তিনতলায় উঠে আসি। বেশ খানিকটা খোঁজাখুঁজির পরে সুতো বিভাগের হদিস পাওয়া গেল। ১৭০ ফ্রাঁ দামে একটা ছোট কার্টন পেয়ে যাই।

আমার সামান্য একটুখানি সুতো দরকার। তার জন্য বিদেশী মুদ্রায় নগদ সাড়ে আট টাকা খরচ করতে হল। কিন্তু উপায় কি ? আমি যে জুরিখের জেলমলিতে মার্কেটিং করলাম।

চা খেয়ে নিয়ে স্টেশনে আসি। আমাদের দুজনেরই রিটার্ন টিকেট রয়েছে। কাজেই টিকেট কেনার ঝামেলা নেই। এদেশে সর্বদা সব জায়গার রিটার্ন টিকেট পাওয়া যায় আর তাতে ভাড়াও কিছু কম লাগে।

প্ল্যাটফর্মে আসি। কয়েক মিনিট বাদেই ট্রেন পেয়ে যাই। ট্রেনে প্রচুর বসার জায়গা রয়েছে। আমরা পাশাপাশি বসি। ট্রেন এগিয়ে চলে।

মণিকা মৃদু হাসে। তারপরে বলে—তাহলে আমরা এখন জুরিখ থেকে জুগে ফিরে চলেছি !

—হ্যাঁ। আর এটা হয়তো আমার শেষ জুগে ফিরে যাওয়া।

—কেন বলুন তো ?

—আগামীকাল আমি আর জুরিখ আসব না। পরশু দুপুরের ফ্লাইটে লণ্ডন চলে যাচ্ছি।

—কাদের ফ্লাইট ?

—সুইস এয়ারের। তাই বলছিলাম, আজ শেষ দিনের জুরিখ দেখাটা তোমার সাহচর্যে বড়ই আনন্দময় হল।

—আমারও। দুপুরেও ভাবতে পারি নি বিকেলটা এত ভাল কাটবে, আশা করতে পারি নি আমার জন্য আজ এত আনন্দ জমা রয়েছে।

মণিকার কথা শুনে একটু অবাক হই। আজকের সকালটা কি ওর ভাল কাটে নি, সকালে কি স্বামীর সঙ্গে জুরিখ বেড়িয়ে সে আনন্দ পায় নি? কিন্তু কেন?

ব্যাপারটা ওদের ব্যক্তিগত। সুতরাং সেকথা থাক। অন্য কথা বলি—তোমরা কি আজ সকালে জুরিখ বেড়াতে এসেছিলে, না অন্য কোন কাজ ছিল?

—কাজ ছিল।

—কি কাজ?

মণিকা আমার দিকে তাকায়। ওর চোখে চোখ পড়ে আমার। সে চোখে আগুনের গোলা। আমি তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিই। মণিকা তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করে—শুনবেন, কি কাজ?

ওর প্রশ্নের ধরণ দেখে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি। কোনমতে বলি—মানে যদি তোমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার না হয় এবং তোমার বলতে কোন বাধা না থাকে···

—ব্যাপারটা ব্যক্তিগত, তাহলেও বলতে কোন বাধা নেই।···

একবার থামে মণিকা। তারপরে আবার বলে—আমরা দুজনেই আজ অফিস ছুটি নিয়ে জুরিখ এসেছিলাম, আমাদের ডাইভোর্স এ্যাপ্লিকেশন ফাইল করতে।

—ডাইভোর্স এ্যাপ্লিকেশন! আমি প্রায় চিৎকার করে উঠি।

মণিকা শান্তস্বরে বলে—Yes. We are going to be seperated soon.

আর কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি না, তাকাতেও পারি না ওর দিকে। কেবল মনে মনে নিজের কাছে প্রশ্ন করি—তখন কি বাবা বিশ্বনাথের কাছে বৃথাই ওদের জন্য সুখ ও শান্তি কামনা করলাম?

॥ তেরো ॥

ব্রেকফাস্ট টেবিলেই সুসংবাদটি পেলাম। বাবুজি বললেন—সকালে বিড়লাজীর সেক্রেটারী ফোন করেছিলেন। কলকাতার একজন লেখক জুগে বেড়াতে এসেছে শুনে তিনি খুশি হয়েছেন। আজ সকালে তাই তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছেন।

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনপতি ও শিল্পপতি শেঠ ঘনশ্যামদাস বিড়লা আমাকে যেতে বলেছেন। এটি নিঃসন্দেহে সুসংবাদ। তাছাড়া আজ আমার জুরিখ যাবার কোন পরিকল্পনা নেই। আজ বাবুজির সঙ্গে জুগ হ্রদে স্টীমার-ভ্রমণ করব।

কিন্তু···। বাবুজি যে গতকাল বলেছেন, আজ বিড়লাজী লণ্ডন চলে যাবেন!

আমার প্রশ্ন শুনে বাবুজি বলেন—হ্যাঁ, তাই তো আমাদের ন'টার সময় যেতে বলেছেন। তিনি দশটায় বিমানবন্দরে রওনা হবেন।

ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে আসি হোটেল থেকে। বড় রাস্তায় না উঠে হোটেলের পাশের রাস্তাটি ধরে ঢালুপথে এগিয়ে চলি। চলতে চলতে বাবুজি বলেন—বিড়লাজীর প্রথম এবং প্রধান পরিচয় তিনি ভারতকে ব্রিটিশের অর্থনৈতিক নাগপাশ ছিন্ন করতে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে এক সুবিশাল ভারতীয় শিল্পসামাজ্য গড়ে তুলেছেন। তাঁর এই কীর্তির অন্তরালে কোন যাদু নেই, রয়েছে পরিশ্রম বুদ্ধি ও আত্মবিশ্বাস। জীবনে তিনি কখনো পরাজয় মেনে নেন নি। বাধা ও বিপত্তিকে সর্বদা 'চ্যালেঞ্জ' জানিয়েছেন এবং 'শেষ পর্যন্ত সে বাধা জয় করেছেন।

বিড়লাজীর জন্ম ১৮৯৪ সালে পিলানীতে।···

—তাই কি তিনি পিলানীতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছেন?

—হ্যাঁ। তাঁর বিদ্যানুরাগ অসাধারণ। এই ঊননব্বুই বছর বয়সেও তিনি প্রতিদিন পরীক্ষার্থীর মতো পড়াশুনা করেন। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় তো দূরের কথা, তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ পর্যন্ত শেষ করেন নি। তার আগেই পিলানী ছেড়ে চলে গেলেন বম্বে। কিন্তু বম্বে তাঁর ভাল লাগল না। তিনি চলে এলেন কলকাতায়। তরুণ বয়সে ব্যবসায়ে নামলেন। দালালী দিয়ে জীবন আরম্ভ করলেন।

তখন চটকলগুলি সবই বিদেশীদের। কাজের জন্য তাঁকে যেতে হত তাঁদের অফিসে। সেখানে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ ব্রোকারদের জন্য পৃথক বসার ব্যবস্থা। ব্যবস্থাটি খুবই খারাপ লাগত তাঁর। তবু কাজের খাতিরে সয়ে যাচ্ছিলেন কোনমতে। এই সময় একদিন এক ব্রিটিশ একজিকিউটিভ বিনা অপরাধে তাঁকে অফিস থেকে তাড়িয়ে দিলেন। বিহ্বল ও বিমূঢ় বিড়লাজী নেমে এলেন পথে।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে। তাঁকে জুট-মিলের মালিক হতে হবে। তখন তাঁর বয়স মাত্র চব্বিশ বছর।

শুরু হল শিল্পপতি হবার সাধনা। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন। অথচ তখন ভারতীয়দের মিল-মালিক হবার পথে কতই না বাধা ছিল! তিনি সেসব বাধাকে অতিক্রম করে ক্লাইভ রোডের ব্যবসায়ী মহলে সাড়া ফেলে দিলেন।

কিন্তু শুধু তো শিল্প স্থাপন করলেই ভারতীয়রা ব্যবসাক্ষেত্রে স্বয়ম্ভর হতে পারবে না। তাই ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স। দু বছর বাদে ফেডারেশান অব্ ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স। তাঁর নেতৃত্বে ভারতীয় শিল্পপতিরা একত্রিত হলেন।

একবার থামলেন বাবুজি। তারপরে আবার বলতে থাকেন—তুমি তো জানো, মিঃ বিড়লা গান্ধীজীর একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। তাঁর সমস্ত গঠনমূলক কাজে সর্বদা উদারভাবে সাহায্য করেছেন।

আমি মাথা নাড়ি। বাবুজি বলতে থাকেন—একবার গান্ধীজী তাঁকে লিখেছিলেন—'ঈশ্বর আমাকে যে কয়েকজন প্রাজ্ঞ পরামর্শদাতা দান করেছেন, তুমি (বিড়লাজী) তাঁদের অন্যতম।'

বিড়লাজী শুধু শিল্পপতি নন, তিনি একজন অর্থনীতিবিদ্। সামাজিক অর্থনৈতিক বিষয়ে রচিত তাঁর প্রবন্ধগুলি অনুকরণযোগ্য। ১৯২৭ সালে জেনিভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার সম্মেলনে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ১৯৩১ সালে লণ্ডনে প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে তিনি গান্ধীজীর সহযোগী ছিলেন। ১৯৪৫ সালে ভারতীয় শিল্পপতিগণ আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য যে পাঁচশালা পরিকল্পনা রচনা করেন, তিনি তার প্রধান রূপকার। তিনি হিন্দী সাহিত্যের একজন স্বীকৃত সুলেখক। তাঁর হিমালয়প্রেম অসাধারণ। তিনি নিয়মিত হিমালয়ের পথে পদচারণা করেন। তাঁর রচিত ভ্রমণকাহিনীগুলো রীতিমত সুখপাঠ্য।

আবার থামলেন বাবুজি। তারপরে শুরু করেন—নিজে স্কুল-কলেজে পড়াশুনা করতে পারেন নি বলেই বোধ করি তিনি এত স্কুল কলেজ এবং পিলানী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিড়লা এডুকেশন ট্রাস্ট পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় তিরিশ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করছে।

বিড়লাজী একজন ধর্মপ্রাণ ভারতীয়। তাই তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এত মন্দির আর ধর্মশালা নির্মাণ করেছেন।

তিনি বলেন, কঠোর পরিশ্রমই সাফল্যের চাবিকাঠি এবং এর কোন বিকল্প নেই। তাঁর মতে পরিশ্রমে কখনও মানুষের ক্ষয় হয় না। এই উননব্বুই বছর বয়সেও তিনি প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করেন। প্রাতঃকৃত্য সেরে স্নান করে নেন। তারপরে বেশ কিছুক্ষণ গীতাপাঠ করে প্রাতঃভ্রমণে বের

হন। ফিরে এসে সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ ব্রেকফাস্ট করেন। তারপরে আবার কিছুক্ষণ পড়াশুনা। তিনি সাধারণতঃ দর্শনের বই পড়েন।

তিনি সবার আগে অফিসে আসেন। এবং সাধারণতঃ লাঞ্চের আগেই কাজ সেরে ফেলেন। লাঞ্চের পরে মিটিং বা কারখানা পরিদর্শন। না থাকলে আবার পড়াশুনা। প্রয়োজনে শিক্ষকের কাছে। তিনি এখন ফরাসী ভাষা শিখছেন।

বিড়লাজী রান্না করতে বড় ভালোবাসেন। তাই সময় পেলেই রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকেন। অথচ তাঁর খাওয়া খুবই সাধারণ। তাঁর আরেকটি গুণের কথা শুনলে তুমি অবাক হবে!

—কি?

—বিড়লাজী চমৎকার হারমোনিয়াম বাজাতে পারেন।...

বিড়লাজীর কথা শেষ হবার আগেই আমরা বিড়লাজীর বাড়ির সামনে পেঁছে গেলাম। বাবুজি বলেন—এই দেখো লেখা রয়েছে 'পারিজাত', বাড়ির নাম। এই নামটি দেখলে আমার কি মনে হয় জানো?

—কি? আমি বাবুজির মুখের দিকে তাকাই।

তিনি বলেন—আমার সেই শ্লোকটার কথা মনে পড়ে।

—কোন শ্লোক?

তিনি সুর করে শুরু করেন—

'ছায়ায়াং পারিজাতস্য হেম-সিংহাসনোপরি।
আসীনমম্বুদ-শ্যামায়তাক্ষমলং কৃতম্ ॥
চন্দ্রাননং-চতুর্বাহুং শ্রীবৎসাঙ্কিত-বক্ষসম।
রুক্মিনী-সত্যভামাভ্যাং সহিতং কৃষ্ণমাশ্রয়ে ॥'

শ্লোকটির অর্থ হল, আমি রুক্মিনী ও সত্যভামার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করি। শ্রীকৃষ্ণ পারিজাতের ছায়ায় স্বর্ণ-সিংহাসনে সমাসীন। তাঁর চোখ দুটি মেঘ-শ্যামল এবং আয়ত। তাঁর শ্রীমুখ চন্দ্রের মতো। তাঁর চারখানি হাত। তাঁর বুক শ্রীবৎস অঙ্কিত।

এখানে এসে পারিজাত নামটি দেখে আমার এই শ্লোকটি মনে পড়ে, কারণ বিড়লাজী এখানে বসে প্রতিদিন গীতাপাঠ করেন। আমার মনে হয়, তিনিও পারিজাতের ছায়ায় রুক্মিনী ও সত্যভামার মতো শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করে আছেন।

বাবুজির কথা শুনে আমার বিস্মিত বোধ করি। গতকাল আমার তাঁকে কবি মনে হয়েছে, আজ মনে হচ্ছে তিনি একজন দার্শনিক।

কিন্তু সে সম্পর্কে কিছু বলতে পারার আগেই তিনি 'কলিং বেল'-এর সুইচ স্পর্শ করেন। সঙ্গে সঙ্গে সুইচ-এর পাশে বসানো 'স্পীকার'-এ প্রশ্ন ভেসে আসে—হু'জ দেয়ার?

স্পীকার-কাম্-রিসিভারের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বাবুজি নিজের নাম

বলেন। একটা শব্দ করে দরজাটি ওপরে উঠে যায়। আমরা ভেতরে ঢুকি। দরজা আবার নিচে নেমে আসে, বন্ধ হয়ে যায়।

দরজা খোলার এই যান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা শুনেছিলাম, কিন্তু দেখার সুযোগ হয় নি এর আগে। ব্যবস্থাটি অবশ্য অপরিহার্য। কারণ য়ুরোপে মানুষের দাম অনেক। এখানে কেউ দারোয়ান রাখতে পারেন না। অথচ বাড়িতে বিশেষ করে বহুতল ফ্ল্যাটবাড়িতে ক্রমাগত লোকজন যাওয়া-আসা করেন। তাই এই যান্ত্রিক ব্যবস্থা। বেল বেজে উঠলেই নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটের বাসিন্দা আগন্তুকের পরিচয় জিজ্ঞেস করেন। পরিচয় পাবার পরে একটা 'বটন' টিপে দেন। নিচের সদর দরজা খুলে যায়। আগন্তুক ভেতরে ঢোকার পরে দরজা আবার নিজের থেকেই বন্ধ হয়ে যায়।

যাই হোক, দরজা খোলার পরে আমরা যেখানে প্রবেশ করেছি সেটি একফালি বাঁধানো অঙ্গন। সেখান থেকে চার-পাঁচ ধাপ সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে আসি। ডানদিকে অফিস। আমরা অফিসে ঢুকি।

ছোট হলেও কর্মব্যস্ত আধুনিক অফিস। লোকজন বেশি নয়, কিন্তু যন্ত্রপাতি অনেক। অধিকাংশ আমার অপরিচিত। কেবল চিনতে পারছি কম্পিউটর, ইলেক্ট্রোনিক টাইপ-রাইটার, টেলেক্স ও জেরক্স মেশিন, আধুনিকতম টেলিফোন ও টেলিভিশান।

অফিসের একদিকে বিড়লাজীর সেক্রেটারী বসে কাজ করছিলেন। আমাদের দেখতে পেয়েই তিনি স্বাগত জানালেন। তারপরে রিসিভার তুলে কার সঙ্গে যেন একটু কথা বলে নিলেন।

রিসিভার রেখে উঠে দাঁড়িয়ে বাবুজিকে বলেন—আপনি ভদ্রলোককে নিয়ে ওপরে চলে যান। বাবু আপনাদের জন্য বসে আছেন। বাবুর কাছে ব্যানার্জী রয়েছে। কোন দরকার পড়লে তাকে বলবেন।

আমরা কার্পেট পাতা সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি দোতলায়। ছোট দোতলা বাড়ি। একতলায় অফিস, দোতলায় 'রেসিডেন্স'। তিনখানি বেডরুম, একখানি ড্রয়িংরুম ও একটি কিচেন-কাম্-ডাইনিং রুম নিয়ে দোতলা।

আমরা ড্রয়িংরুমে আসি। পুরু কার্পেটে মোড়া, আধুনিক ডিজাইনের সোফা ও সেণ্টার টেব্ল, টি ভি, টেলিফোন ও আলোকসজ্জা।

প্যাণ্ট-কোট-টাই পরা একজন সৌম্যদর্শন পুরুষ সোফায় বসে একখানি বই পড়ছেন। প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসিকা, উজ্জ্বল একজোড়া চোখ। তুলনায় কান দুটি বড়, মাথায় সামান্য সাদা চুল। চোখে একজোড়া মোটা চশমা। শুধু সৌম্য নন, প্রশান্তও বটে।

আমরা সামনে আসতেই তিনি মুখ তুলে তাকালেন। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করি। তিনি মাথায় একখানি হাত রাখেন। আমার শরীরে শিহরণ বয়ে যায়।

একটু বাদে মাথা তুলে উঠে দাঁড়াই। ইংরেজীতে নিজের পরিচয় দিতে আরম্ভ করি।

শেষ করতে পারি না। পরিষ্কার বাংলায় তিনি বলে ওঠেন—আমি ভগবতীর কাছে আপনার সব কথা শুনেছি। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।

তাঁর বিশুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ শুনে ভারী ভাল লাগে। উল্টোদিকের একখানি সোফায় বসে সবিনয়ে বলি—আমাকে 'তুমি' বললে খুশি হব।

—বেশ তাই হবে।

সঙ্গে সঙ্গে সম্মত হন। তারপরে হাতের বইখানি সেণ্টার টেবুলের ওপরে রাখলেন। তাকিয়ে দেখি—Selected Songs from Geetanjali, by Rabindranath Tagore.

আমার বইখানি দেখা তাঁর দৃষ্টি এড়ালো না। তিনি বললেন—কি করব ব'লো, বিদেশী বন্ধুরা গীতাঞ্জলির অনুবাদ পড়তে চায়। কিন্তু Complete translation পাওয়া যায় না, তাই 'Selected Songs' সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

একবার থামেন তিনি। তারপরে জিজ্ঞেস করেন—আমাকে একখানি সম্পূর্ণ অনুবাদ যোগাড় করে দিতে পারো?

—জাতীয় গ্রন্থাগার ও সাহিত্য পরিষদে খোঁজ করে দেখতে পারি। কিন্তু মুশকিল, হচ্ছে তাঁরা তো সে বই বাইরে আনতে দেবে না, অবশ্য আপনি চাইলে···

—দরকার নেই। আমি ফটো কপি করিয়ে নেব।

—আপনাকে করতে দেবে?

—তাহলে তুমি কলকাতায় ফিরে একটু খোঁজ নিয়ে ভগবতীকে বলো, সে আমাকে জানিয়ে দেবে।

আমি এবং বাবুজি দুজনেই মাথা নাড়ি। তারপরে বলি—রবীন্দ্রভারতী এবং বিশ্বভারতীতেও খোঁজ করা যেতে পারে।

—বেশ তো, করা যাবে।

—আপনি লণ্ডন থেকে কোথায় কোথায় যাবেন?

—কোথাও না, সোজা দেশে ফিরব। লণ্ডনে কিছু কাজ আছে, তার ওপরে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে একবার দেখা করে নিতে চাই। বয়স হয়েছে তো। কবে কি হবে করুণাময় কৃষ্ণই কেবল বলতে পারেন।

একবার থামেন তিনি। কি যেন একটু ভাবেন। তারপরে আবার বলেন—আজকাল আমি কলকাতায় থাকতেই ভালোবাসি। জানো তো, কলকাতা আমার দ্বিতীয় জন্মভূমি। তাই তুমি কলকাতা থেকে এসেছো শুনে তোমার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে হল। যাক্ গে আমার কথা, তোমার কথা বলো। সুইজারল্যাণ্ড কেমন লাগছে?

—ভাল, খুব ভাল। আপনি তো প্রতি বছর সুইজারল্যাণ্ড আসেন!

—তা আসি। কিন্তু আজকাল আমার দেশে থাকতেই ভাল লাগে। এবার তো ভেবেছিলাম, গ্রীষ্মটা দেশেই কাটাবো, হিমালয়ে যাবো। কিন্তু ছেলে এই বাড়ি করল। বলে বসল, আমি এসে কিছুদিন না থেকে গেলে ওরা এ বাড়িতে বাস করবে না। তাই এসে ক'দিন থেকে যেতে হল। তা তুমি এখান থেকে কোথায় যাচ্ছ?

—আজ্ঞে আগামীকাল লণ্ডন চলে যাচ্ছি।

—তাই নাকি! কাল তো ভগবতীও লণ্ডন যাচ্ছে।

—তিনি বাবুজির দিকে তাকান। বাবুজি বলেন—আমরা একই ফ্লাইটে যাচ্ছি।

—তাহলে তো ভালই হল। আমি ব্যানার্জীকে বলেছি, ভগবতীকে এয়ারপোর্টে পেঁছে দেবে। তুমিও ওই সঙ্গে চলে যেও।

আমি মাথা নাড়ি। তিনি আবার বলেন—সুইজারল্যাণ্ড তোমার ভাল লেগেছে, সবারই লাগে। কিন্তু যাই বলো, আমাদের হিমালয়ের কাছে আল্‌পস কিছুই নয়।

—আজ্ঞে আমারও তাই মনে হয়।

আমি থামতেই বাবুজি বলেন—শঙ্কু হিমালয়ের পথে প্রচুর ঘুরেছে। প্রায় তাবৎ গিরিতীর্থ দর্শন করেছে, কয়েকটি পর্বতাভিযানেও অংশ নিয়েছে। শুধু তাই নয়, হিমালয়ের ওপরেই তেরোখানি বই লিখেছে।

—তাই নাকি! ভেরী গুড। কোন্ কোন্ তীর্থের ওপরে বই লিখেছো?

—আজ্ঞে আমার প্রথম বই যমুনোত্রী গঙ্গোত্রী ও গোমুখীর ওপরে।...

—ইন্‌টারেস্টিং! আমিও যে গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীর ওপরে হিন্দীতে দুখানি বই লিখেছি।...

হঠাৎ থেমে গিয়ে বেল টিপলেন তিনি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘর থেকে ব্যানার্জীবাবু বেরিয়ে এলেন। তিনি তাঁকে বলেন—দেখ তো আমার বইগুলো কোথায় আছে, একে দুখানি বই এনে দাও।

আনতে সময় লাগে না। একটু বাদেই ব্যানার্জীবাবু দুখানি বই নিয়ে আসেন—'গঙ্গোত্তরী' এবং 'যমুনোত্তরী', চটি বই, পাতলা মলাট, তবে রঙ্গীন। ভেতরেও রঙ্গীন ছবি। তাঁর নিজের ছবিও আছে—লাঠি হাতে পুত্রবধূ শ্রীমতী সরলা বিড়লার সঙ্গে পায়ে হেঁটে দুর্গম তীর্থপথ পাড়ি দিচ্ছেন।

বই দুখানি আমার হাতে দিয়ে বলেন—পড়ে দেখো।

—নিশ্চয়ই। আপনি নিজের হাতে আমাকে আপনার বই দিলেন, এ যে আমার পরম সৌভাগ্য।

তারপরে একটু থেমে আবার বলি—আমিও কয়েকখানি বই নিয়ে এসেছি। কিন্তু সে তো সবই বাংলা।

—তাতে কি হয়েছে? আমি তো ৯০% বাংলা পড়তে পারি। বাকি ১০%

এরা আমাকে পড়ে দেয়।

তিনি ব্যানার্জীবাবুকে দেখিয়ে দেন।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াই, বলি—আমি তাহলে হোটেলে গিয়ে দুখানি বই নিয়ে আসছি।

—বেশ। কিন্তু তাড়াতাড়ি এসো। আমি ঠিক বিশ মিনিট বাদে এয়ারপোর্টে রওনা হব।

প্রায় ছুটে বেরিয়ে আসি পথে। 'দ্বারকা ও প্রভাসে' আর 'সুন্দরের অভিসারে' বই দুখানি নিয়ে পনেরো মিনিটের মধ্যে ফিরে আসি তাঁর কাছে।

বই দুখানি হাতে নিয়ে তিনি ব্যানার্জীবাবুকে বললেন—আমার ব্রীফ্‌কেসে দিয়ে দাও।

তারপরে আমাকে বলেন—বই পড়ে তোমাকে জানাবো, কেমন লাগল? তাছাড়া তুমিও তো কাল লণ্ডন যাচ্ছ। একদিন এসো না! হাইড পার্কের উল্টোদিকে, আমার ফ্ল্যাটে। হাইড পার্ক হচ্ছে লণ্ডনের গড়ের মাঠ। পর্যটকরা সবাই দেখতে যান। আমি তো রোজ সকালে প্রাতঃভ্রমণ করতে যাই।*

বলা শেষ করেই তিনি উঠে দাঁড়ান। ঘরে যান। আমরা নেমে আসি নিচে।

একটু বাদে তিনি নিচে নামলেন। সোজা গিয়ে গাড়িতে উঠলেন। আমরা দুহাত জড়ো করে নমস্কার করি। তিনিও প্রতি-নমস্কার করেন। গাড়ি চলতে শুরু করে।

বাবুজি ঘড়ি দেখেন। বলেন—ঠিক দশটা। তার মানে তুমি প্রায় ঘণ্টাখানেক শেঠ ঘনশ্যামদাস বিড়লার সঙ্গে কথা বললে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার আশীর্বাদে সকালটা আজ বড়ই ভাল কাটল।

—এখন কি করবে? হোটেলে লাঞ্চ্‌ও করতে চাইলে প্রায় ঘণ্টাদুয়েক বসে থাকতে হবে। তার চাইতে চলো জুগ সেণ্ট্রমে যাওয়া যাক। সেখানে একটা রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ করে নিয়ে হ্রদের তীরে যাওয়া যাবে।

তাই করি। বড় রাস্তায় এসে বাস ধরে পোস্টাপিসের সামনে নামি। একটা রেস্তোরাঁয় আসি। এঁরাও ভারতীয় খাবার তৈরি করেন। আলুর পরোটা ও 'ভেজিটেবল কারী' দিয়ে লাঞ্চ সেরে ফেলি। তারপরে হাঁটতে হাঁটতে হ্রদের দিকে এগিয়ে চলি।

* আমার দুর্ভাগ্য তিনি আমার বই বোধ করি শেষ করতে পারেন নি। পারলেও তাঁর মতামত জানাতে পারেন নি আমাকে। কারণ এই ঘটনার ঠিক এগারো দিন বাদে অর্থাৎ ১১ই জুন (১৯৮৩) হাইড পার্কে প্রাতঃভ্রমণ করার সময় তিনি হঠাৎ অসুস্থতা বোধ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ডাক্তাররা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ভারতীয় শিল্পজগতের অন্যতম প্রাণপুরুষ শেঠ ঘনশ্যামদাস বিড়লা বৃটেনের মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সেখানেই তাঁর শেষকৃত্য অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়েছে। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

বাবুজি বলেন—এ যাত্রায় সুইজারল্যাণ্ডে আজ আমাদের শেষ দিন।

আমি মাথা নাড়ি। হ্রদের তীরে আসি। জুরিখ ও লুসার্ণের মতো এখানেও পাড় বাঁধানো, গাছের ছাওয়া, বসবার বেঞ্চি ও স্ন্যাকস-বার রয়েছে। তবে সবই ছোট ছোট।

বাবুজি জিজ্ঞেস করেন—সাদা ময়ূর দেখেছো কখনো ?

—না তো ! ময়ূর আবার সম্পূর্ণ সাদা হয় নাকি ?

—হয়। এখানে রয়েছে। চলো দেখবে।

সত্যই সাদা ময়ূর। হ্রদের তীরে খানিকটা জায়গা লোহার জাল দিয়ে ঘেরা। তারই মধ্যে ছোট টিনের ঘর, বাঁধানো জলাধার আর গুটিকয়েক গাছ। সেখানেই একজোড়া সাদা ময়ূর। আমরা দেখি। ভারী সুন্দর। কিন্তু এত পশু-পাখি থাকতে এখানে সাদা ময়ূর কেন ? ময়ূর তো এদেশের জাতীয়-পাখি নয় !

ময়ূর দেখে জলের ধারে আসি। একখানি বেঞ্চিতে এসে বসি। এখানেও হ্রদের বুকে রাজহাঁস রয়েছে। তারা নির্ভয়ে বিচরণ করছে। ভারী ভাল লাগছে দেখতে।

ঐ তো সেই স্টীমার। সেই 'ZUG' লেখা সাদা রঙের স্টীমার, গায়ে লাল বর্ডার আর চারিদিকে কাচের জানালা। এখানে এসে প্রথম দিনেই হোটেলের ব্যালকনীতে বসে দেখেছিলাম। দেখে আমার বরিশালের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম এই স্টীমারে চড়ে একদিন জুগ হ্রদটিকে দেখতে হবে। তাই এখন এখানে এসেছি।

বাবুজি বলেন—এক কাজ ক'রো। হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ঐ হচ্ছে স্টীমারঘাট, নাম জুগ বানহোপ। স্টীমারটা ওখানে গিয়েই থামবে। তুমি তাড়াতাড়ি ওখানে চলে যাও। গিয়ে জিজ্ঞেস করো, আবার কখন ছাড়বে ? আমি আস্তে আস্তে আসছি।

অতএব হ্রদের বাঁধানো তীর দিয়ে স্টীমারঘাটের দিকে এগিয়ে চলি। স্টীমারটা ঘাটে ভিড়ছে। এতো তাড়াহুড়া করার দরকার ছিল না। এই তো সবে এলো, এখন নিশ্চয়ই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে।

অবশেষে এসে পৌঁছই ঘাটে। কিন্তু এ কি ! এঁরা যে সিঁড়ি তুলে ফেলছেন ! এখুনি আবার ছেড়ে দেবে নাকি ?

আমি ছুটে চলি জেটির ওপর দিয়ে। হাত নেড়ে সিঁড়ি তুলতে নিষেধ করি ওঁদের। ওঁরা আমার কথা শোনেন। আমি কাছে এসে ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করি—আপনারা কোথায় যাচ্ছেন ?

ভাগ্য ভাল। 'নেভী'র পোশাক পরা যে লোকটি সিঁড়ি তুলছিলেন, তিনি ইংরেজীতেই জবাব দিলেন—জুগ হ্রদের ঘাটে ঘাটে।

—কখন ফিরে আসবেন ?

—সোয়া তিনঘণ্টা পরে।

—জনপ্রতি ভাড়া ?

—পাঁচ ফ্রাঁ। আপনি যাবেন ? তাহলে উঠে আসুন !

—যাবো। কিন্তু আমি একা নই, আমার একজন সঙ্গী আছেন। তিনি একটু পেছনে আসছেন। আপনারা মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করতে পারবেন ?

—আপনারা গেলে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করব।

—হ্যাঁ, আমরা যাবো।

—তাহলে তাঁকে নিয়ে আসুন।

লোকটি চাবি ঘুরিয়ে সিঁড়িটাকে আবার জেটির ওপর ফেলে দেন। আমি উঠে আসি ঘাটের ওপরে।

একটু বাদে বাবুজি এসে পৌঁছলেন। তাঁকে সব বলি। তিনি সহাস্যে বলেন—মন্দ কি ? দশ ফ্রাঙ্ক খরচ করে দুজনে সোয়া তিনঘণ্টা নৌকাবিলাস করা যাবে।

॥ চোদ্দ ॥

আমরা উঠে আসতেই স্টীমার ছেড়ে দেয়।

দোতলায় এসেই বাবুজি বলে ওঠেন—The entire Steamship is chartered for you.

ঠিকই বলেছেন বাবুজি। এত বড় স্টীমার কিন্তু যাত্রী বলতে আমরা দুজন। একতলার সামনে ও পেছনে বসার জায়গা আর দোতলার সবটা জুড়েই বেঞ্চি অথবা চেয়ার। দুই তলাতেই ড্রিংক্স-কাম-স্ন্যাকস্ বার রয়েছে, দোতলারটি ছোট।

আমরা দুজনে সামনাসামনি দুখানি চেয়ারে বসেছি। জুগ শহরের তীর-ভূমিকে বাঁয়ে রেখে স্টীমার উত্তরে এগিয়ে চলেছে। জুগকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। হ্রদের পশ্চিমতীর জুড়ে শহর। সবুজ পাহাড়ের গা বেয়ে নানা রঙের ছোট-বড় বাড়ি ধাপে ধাপে নেমে এসে হ্রদের জল ছুঁয়েছে। হ্রদের বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে পালতোলা প্রমোদতরী, স্পীডবোট আর দলে দলে রাজহাঁস, শহর ছাড়িয়ে হ্রদের পশ্চীমতীরে আর সারা পূর্বতীর জুড়ে কোথাও বনস্পতির বৈঠক, কোথাও বা সবুজ পাহাড়ের ঢেউ।

কয়েক মিনিট বাদেই স্টীমার ঘাটে ভিড়ল। এটা জুগ শহরের আরেকটা ঘাট। নাম জুগ স্টাট (Stadt)।

কিন্তু স্টীমার বৃথাই নোঙর করল। কোন যাত্রী পাওয়া গেল না। স্টীমার আবার চলতে শুরু করল।

এই পথটুকু আমরা উত্তরে এসেছি। এবারে চলেছি পূবে, হ্রদের দক্ষিণতীরের দিকে। জুগ হ্রদ পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। কাজেই দক্ষিণতীর চওড়ায় কম।

মিনিট পনেরো চলার পরে আমরা দক্ষিণতীরের প্রায় প্রান্তে অর্থাৎ হ্রদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পৌঁছে গেলাম। এ ঘাটের নাম শাম। ছোট একটা শহর। সেদিন লুসার্ণ যাবার পথে ট্রেন শাম স্টেশনে থেমেছিল। আজ ঘাটে এলাম।

কিন্তু হায়, কোথায় যাত্রী? কেউ উঠল না স্টীমারে। আমরা দুটি প্রাণী ছাড়া আর তৃতীয় যাত্রী নেই। এমন সুন্দর স্টীমার ঘাটে ঘাটে ভিড়ছে অথচ কেউ উঠছে না। ব্যাপার কি?

যাত্রী না থাকলেও হকার আছে। পরিচ্ছন্ন ইউনিফর্ম পরে জনৈক ওয়েটার একটা ট্রে-তে কয়েক গ্লাস ফলের রস নিয়ে এলো। বলি—ধন্যবাদ। আমাদের দরকার নেই।

একটু হেসে বাবুজি বলেন—নিয়ে নিলে পারতে। আমরা দুজন ছাড়া আর যাত্রী নেই। আমরা না নিলে কে নেবে?

—কিন্তু এই তো লাঞ্চের সময় ফলের রস খেয়ে এলাম।

—তা হোক গে। এ তো শক্ত খাবার নয়, শীতল পানীয়, নিয়ে নাও।

মানুষটা আশা করে এসেছে।

অতএব নিতে হয়। বাবুজি দাম দিয়ে দেন।

ওয়েটার মোটামুটি ইংরেজী বলতে পারে। ওকে যাত্রীশূন্যতার কারণ জিজ্ঞেস করে ফেলি। সে উত্তর দেয়—এ স্টীমারটা যেমন প্রমোদতরী, তেমনি পরিবহন।

—কি রকম ?

—আমাদের এই জুগ হ্রদের পূব এবং পশ্চিম পাড়ে কয়েকটি পিক্‌নিক্‌-স্পট্‌ রয়েছে। স্পট্‌গুলোতে রেস্তোরাঁ ও বার আছে, ঘরভাড়াও পাওয়া যায়। জায়গাগুলো যেমন সবুজ, তেমনি রৌদ্রস্নাত। তাই প্রতিদিন সকালে দলে দলে ট্যুরিস্ট এইসব জায়গায় যান। সারাদিন কাটিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে আসেন। আমরা সকালে তাঁদের ছেড়ে এসেছি, এবারে ফেরার পথে নিয়ে আসব। এখন তাই ঘাটে ঘাটে থামাই সার হবে, ফেরার সময় দেখবেন স্টীমার বোঝাই হয়ে গেছে।

—তার মানে ফেরার সময় আবার আমরা সব ঘাটে থামব ?

—নিশ্চয়ই। নইলে যাত্রীরা জুগে ফিরে যাবেন কেমন করে ?

সত্যই পর্যটন শিল্প প্রসারের জন্য কি ব্যাপক অথচ অপরূপ ব্যবস্থা !

লোকটি চলে যায়। ফলের রসে চুমুক দিই। তারপরে তীরভূমির দিকে তাকাই। সবুজ সমতল আর বনভূমি। দূরে পাহাড়ের রেখা। লোকালয় চোখে পড়ছে না। কিন্তু বাঁধানো মসৃণ পথ দেখতে পাচ্ছি। সেপথে গাড়ি চলেছে। চলবেই। য়ুরোপের পথে পথচারী না থাকতে পারে কিন্তু গাড়ি থাকবেই।

বাবুজি বোধ করি এতক্ষণ ধরে আমার কথাটাই ভাবছিলেন। এবারে বলে ওঠেন—তুমি তো জানো, সুইসরা পর্যটন ব্যবসার প্রথম পাঠ নিয়েছেন বৃটিশদের কাছ থেকে। এবং তারপর থেকে তাঁরা প্রয়োজনের সঙ্গে সমতা রেখে নিজেদের দেশকে উন্নীত করে চলেছেন। না করেও উপায় ছিল না। কারণ সুইজারল্যাণ্ডে চিরকাল রপ্তানীর চেয়ে আমদানী অনেক বেশি। শুধু কাঁচামাল ও তেল নয়, এঁদের খাদ্য আমদানী করতে হয়। এই বাণিজ্য-ঘাটতির এক-তৃতীয়াংশ পূরণ হয় পর্যটন ব্যবসা দিয়ে। বাকি ঘাটতি মেটানো হয় ব্যাঙ্ক ইন্‌সিওরেন্স ও ও রপ্তানী বাণিজ্য দিয়ে। তবে সুইজারল্যাণ্ড কিন্তু অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন করেছে মাত্র ১৯৬১ সাল থেকে। অথচ বিগত বাইশ বছরের মধ্যে সুইজারল্যাণ্ড বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধনী দেশসমূহের অন্যতম। সুইস শ্রমিকরা আজ য়ুরোপের সবচেয়ে বেশি উপার্জনশীল শ্রমিক। তুমি তাদের দামী পোশাক-পরিচ্ছদ ও ঝকঝকে ফ্ল্যাট দেখে বিস্মিত হবে।

বাবুজি থেমে গেলেন, আরেকটা ঘাট আসছে। ক্যাপ্টেন যাত্রীদের সুবিধার জন্য মাইকে ঘাটের নামটি বলে দিচ্ছেন। কিন্তু কোথায় যাত্রী ? এ ঘাটেও কোন যাত্রী উঠল না। ঘাটের নাম বুয়োনাস (Buonas)।

আবার হ্রদ পাড়ি দিচ্ছি। সোজা ওপারে অর্থাৎ পশ্চিমে চলেছি। বাবুজি

আবার শুরু করেন—আগেই বলেছি এদেশে বাণিজ্যঘাটতির প্রধান পরিপূরক পর্যটন-শিল্প। তাই প্রখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক আঁদ্রে সিগ্‌ফ্রীড (Andre Siegfried) বলেছেন যে নীলনদ যেমন মিশরকে উর্বর করে তুলছে, তেমনি পর্যটনশিল্প সুইজারল্যাণ্ডকে উর্বর করে রাখছে। তাঁর ভাষায়, 'the same way as the traditional inundations of the Nile fertilize the delta'

তবে এই ব্যবসায়ে সুইজারল্যাণ্ডকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে এ দেশের বৈচিত্র্যময়ী অপরূপা প্রকৃতি। এমন প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য তুমি আর কোথাও দেখতে পাবে না। তুমি যদি এদেশের যে কোন পথ দিয়ে যে কোন দিকে সারাদিন গাড়ি চালিয়ে যাও, তাহলে অন্তত দশ-বারো রকমের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও পাঁচ-ছ' রকমের আবহাওয়ার সম্মুখীন হবে। তাই সুইস সরকার এক অভিনব স্পোর্টস-এর প্রচলন করেছেন, যার নাম 'Ballooning over the Alps.'

ঐ বেলুনে চড়ে পর্যটকরা সাধারণতঃ ১৩, ৬৪৮ ফুট উঁচু ইউঙ্গফ্রাও শিখর পর্যন্ত ওপরে ওঠেন এবং আকাশ পরিষ্কার থাকলে সারা দেশের যাবতীয় বৈচিত্র্যকে দেখতে পান।

এই প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য এদেশের জাতীয় চরিত্রের ওপরে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যে ঐশ্বর্যশালী অথচ প্রাকৃতিক সম্পদে দরিদ্র এই সুইজারল্যাণ্ডের মানুষগুলো তাই এমন সংযমী, এমন কর্মক্ষম আর এমন সঙ্গীত ও কলা প্রিয়।

হ্রদ পাড়ি দিয়ে স্টীমার ওবারউইল (Oberwil) ঘাটে এসে ভিড়ল। জায়গাটি একটু বড়। জুগ থেকে একটা রেললাইন এই পর্যন্ত এসেছে।

যাক্ গে, এখানে দুজন যাত্রী পাওয়া গেল। মন্দের ভাল। স্টীমারের কর্মচারীরা কতটা খুশি হয়েছেন বলতে পারব না তবে আমার খুবই আনন্দ হচ্ছে।

স্টীমার আবার ওপারে চলেছে। আমরা উত্তর-পূর্বে এগিয়ে চলেছি।

হঠাৎ বাবুজি বলে ওঠেন—একবার পেছনে মানে হ্রদের পশ্চিমতীরের দিকে তাকাও।

আমি তাই করি। ওবারউইল ঘাট আর জনপদ। তার পেছনে বনময় পাহাড়।

বাবুজি আবার বলেন—ঐ যে সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টার ওপরে একটা বাড়ি, দেখতে পাচ্ছ?

—হ্যাঁ, বাড়িই বটে। অত উঁচুতে ওটা কি?

—চিনতে পারলে না তো? তুমি কিন্তু ওখানে গিয়েছো।

—ওখানে গিয়েছি!

—হ্যাঁ। বাবুজি মৃদু হাসছেন।

আমি আবার দেখি। না, চিনতে পারছি না।

বাবুজি হাসতে হাসতে বলেন—ওটা হোল জুগেরবার্গ।

—জুগেরবার্গ!

—হ্যাঁ। জুগেরবার্গের সেই কনভেণ্ট কলেজ। সেদিন ওখানে বসে তোমাকে বলেছিলাম, আমরা একদিন এই হ্রদে স্টীমারভ্রমণ করব। হ্রদের বুকে বসে জুগেরবার্গ দেখব, মনে হবে সিনেমাস্কোপ দেখছি।

—সত্যই তাই।

অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকি এই অপরূপ দৃশ্যের দিকে। আর ভাবি জুগেরবার্গ থেকে যে ভ্রমণের শুরু হয়েছিল, আজ জুগেরবার্গ দেখেই তা শেষ হচ্ছে। আগামীকাল আমি বিদায় নেব জয়ন্তী-জুরিখের কাছ থেকে।

আমরা আবার পূবপারে এলাম। বড় ঘাট, নাম রিশ (Risch)। বনময় পাহাড়ের পাদদেশে রমণীয় স্থান। পাহাড়ের গায়ে বনের ফাঁকে ফাঁকে পাখির বসার মতো কয়েকটি ছোট ছোট ভিলা আর হ্রদের ধারে একফালি সবুজ সমতল। সেখানে গুটি কয়েক রেস্তোরাঁ-কাম-বার। সত্যি ভারী সুন্দর জায়গাটি। কিন্তু দুঃখের কথা ওদিকে তাকাতে পারছি না। একা থাকলেও পারতাম কিনা জানি না। এখন তো তাকাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না, বাবুজি সঙ্গে রয়েছেন।

সত্যি বলতে কি, য়ুরোপে এসে যে বিষয়টি আমার কাছে একেবারেই অবোধ্য হয়ে রইল, সেটি হোল "Sun-bath"। অভিধানে দেখেছি, শব্দটার অর্থ নগ্নদেহে রৌদ্রসেবন। সূর্য বিশ্বের সকল শক্তির উৎস। শীতের দেশ, সুতরাং রৌদ্র-সেবন স্বাস্থ্যকর। কিন্তু শীতের দেশের মানুষ হয়ে এমন কড়া রোদে ওঁরা এতক্ষণ শুয়ে থাকেন কি করে? তাছাড়া শিক্ষিত ও সভ্য নারী-পুরুষদের পক্ষে এমন প্রকাশ্য স্থানে অভিধানকে কেমন করে বাইবেল জ্ঞানে পালন করা সম্ভব, তা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না।

অবশ্য সবাই এখানে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে রৌদ্রসেবন করছেন সেকথা বলছি না। তবে তাঁরা, বিশেষ করে মেয়েরা, যা পরিধান করেছেন তা তাঁদের লজ্জা নিবারণ না করে আরও বেশি নির্লজ্জ করে তুলেছে। এরই নাম যদি আধুনিক সভ্যতা হয়, তাহলে সভ্যতার সেই ইষ্টদেবীর কাছে করজোড়ে বলি, তুমি আমাদের আর যাই করো সভ্য করে তুলো না। বরং আশীর্বাদ করো আমাদের মেয়েরা যেন চিরকাল সিঁথিতে সিঁদুর আর মাথায় কাপড় দেওয়া অসভ্যতার মধ্যেই জীবনপাত করতে পারেন।

কেন জানি না, বেশ কয়েকজন নারী-পুরুষ রিশ থেকে স্টীমারে উঠলেন। এঁরা এখুনি সান-বাথ আর পিক্‌নিকের পালা সাঙ্গ করলেন কেন? আমরা তো ফেরার পথে এঁদের জুগ নিয়ে যেতাম!

—এঁরা বোধ হয় জুগে যাবেন না। বাবুজি বলেন।

—তাহলে কোথায় যাচ্ছেন?

—ঠিক জানি না। তবে মনে হচ্ছে, এঁরা সকালে আরথ্‌গোলডাও থেকে এখানে এসেছিলেন।

—আরথ্‌গোলডাও! সেদিন রিগি থেকে ফেরার পথে আমরা যেখানে বড় রেলে চেপেছিলাম?

—হ্যাঁ। তোমার বোধ হয় মনে আছে, জুগ হ্রদের উত্তর-পশ্চিমে আরথ্‌-গোলডাও। তাই এই স্টীমার-ভ্রমণের শেষ ঘাট আরথ্‌গোলডাও। সেখান থেকেই ফেরার পালা শুরু হবে আমাদের।

রিশ থেকে স্টীমার আবার হ্রদ পাড়ি দিয়ে পশ্চিমপারে এলো। ঘাটটির নাম লোদেনবাখ (Lothenbach)।

এখানেও তেমনি পাহাড় আর বন। বনের মাঝে ছোট ছোট ভিলা। ভিলার সামনে একফালি সবুজ আঙিনা। এগুলো সবই পর্যটকদের অস্থায়ী আবাস। এখান থেকেও কয়েকজন যাত্রী উঠলেন। বাবুজির কথাই বোধ করি ঠিক।

সত্যি ভারী মজার ভ্রমণ! একবার পূবপারে যাচ্ছি, আবার পশ্চিমপারে আসছি। ফলে হ্রদটিকে বড় সুন্দর করে দেখা হচ্ছে। এখন আবার পূবপারে চলেছি।

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে যায় আমার। তাই বাবুজিকে জিজ্ঞেস করি—আপনি তো এতবার সুইজারল্যাণ্ডে এলেন, আপনার মতে বছরের কোন্‌ সময়ে এদেশে আসা সবচেয়ে সুখপ্রদ?

—দেখো আমি জুরিখে আসি, জুরিখের কথাই বলব। সারা বছর ধরেই জুরিখের আবহাওয়া অত্যন্ত অস্থির এবং অনিশ্চিত। তবে ইদানীং শুনছি মার্চ মাসে নাকি আকাশ সবচেয়ে ভাল পরিষ্কার থাকছে আর এপ্রিল ও মে মাসে বৃষ্টি হচ্ছেই। আমি আসার পরে কয়েকদিন প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। তবে তুমি দেখছি ভাগ্যবান। তুমি মে মাসের শেষে এসেছো, কিন্তু তুমি আসার পরে আর বৃষ্টি হয় নি।

একবার থামেন বাবুজি। তারপরে বলেন—আবহাওয়ার কথা থাক। সব দিক বিচার করলে এই জুন মাস হচ্ছে জুরিখের সবচেয়ে আনন্দের মাস। এই মাসে এঁদের একটি আঞ্চলিক উৎসব হয়। থিয়েটার অপেরা ও গান-বাজনার জমজমাট আসর বসে, কলা ও ভাস্কর্যের প্রদর্শনী হয়। তবে আসল কথা কি জানো?

—কি? আমি বাবুজির দিকে তাকাই।

—আসল কথা হোল, জুরিখে আসার জন্য কোন বিশেষ সময় নির্বাচনের প্রয়োজন নেই। তুমি যখুনি জুরিখ আসবে, দেখবে জুরিখ আনন্দময় ও সঙ্গীতমুখর হয়ে আছে।

পূবপারে পাশাপাশি দুটি ঘাট। আগেরটি ছিল বাওয়েনগার্টেন

(Baumengarten) আর এটির নাম ইমেনজে (Immensee)। এটিও ছোট ঘাট কিন্তু জায়গাটি খুব ছোট নয়। বেশ কিছু বাংলো আর গুটিকয়েক রেস্তোরাঁ রয়েছে। এখান থেকে যে লুসার্ণ হ্রদের তীরে হোয়লে গাসে (Hohle gasse) যাবার মোটরপথ রয়েছে। দূরত্ব নাকি সামান্য, কারণ দুটি হ্রদ এখানে খুবই কাছাকাছি চলে এসেছে। মাঝখানে কেবল কয়েক কিলোমিটার চওড়া একফালি ভূখণ্ড।

হোয়লে গাসে থেকে লুসার্ণ কিন্তু অনেকটা দূরে। তবে মোটরপথ রয়েছে। যেতে সামান্যই সময় লাগে।

দুটি হ্রদের দূরত্ব সামান্য হলেও প্রাকৃতিক পার্থক্য কিন্তু বিস্তর। লুসার্ণ সুইজারল্যাণ্ডের সবচেয়ে সুন্দর হ্রদ আর জুগ হ্রদ নিতান্তই নগণ্য। তাহলেও আমার কিন্তু এ হ্রদটিকে বড় ভাল লাগছে। এ হ্রদের তীরে তীরে লুসার্ণের মতো অমন উঁচু পাথুরে পাহাড়ের ঢেউ নেই, কিন্তু এখানে বনের মর্মর আছে। লুসার্ণ হ্রদের মতো এ হ্রদের তীরে-তীরেও সীমাহীন সবুজের বিস্তার। আর সবুজ মানেই জীবনের হাতছানি।

সেই জীবনের আমন্ত্রণে দলে দলে নারী-পুরুষ সান-বাথ আর পিক্‌নিক করতে এসেছেন। কিন্তু ওঁরা জানেন না যে, জীবন মানেই ভোগ নয়। ত্যাগের মধ্য দিয়েই প্রকৃত জীবন বিকশিত হয়ে ওঠে।

ইমেনজে থেকে আবার সোজাসুজি হ্রদ পাড়ি দিয়ে পশ্চিমতীরে এলাম। এখানেও পাহাড় আর বন। কিন্তু জায়গাটি বড়। নাম ওয়াল্‌কউইল (Walcwil)। এখান থেকে বেশ কয়েকজন যাত্রী উঠলেন।

পোশাকের স্বল্পতার জন্য অধিকাংশ সহযাত্রী ও সহযাত্রিনীদের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারছি না। তাহলেও বেশ ভাল লাগছে এখন। ভিড়ের মতো জনশূন্যতাও কষ্টকর।

ওয়াল্‌কউইল থেকে স্টীমার হ্রদের এই পশ্চিমপার ধরেই সোজা উত্তরে চলেছে। দূরে হ্রদের তীরে শেষ ঘাট আরথ্‌গোলডাও দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি রিগি পর্বতশ্রেণী। মনে পড়ছে নানা কথা। সেদিনের কথা, তার আগের কথা, পরের কথা। দিনগুলো যেন স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেল। শুধু পড়ে রইল তাদের স্মৃতি, অবিস্মরণীয় স্মৃতি।

সুইজারল্যাণ্ডে এসে প্রথম দিনেই হোটেলের ব্যালকনিতে বসে দেখেছিলাম এই স্টীমারটিকে। তখন বুঝতে পারি নি, এই রমণীয় জলযানটি আমার সুইজারল্যাণ্ড ভ্রমণের শেষ তরী হয়ে রইবে।

সেদিন বুঝতে পারি নি, এ স্টীমারটি শুধু দেখতে সুন্দর নয়, বেশ জোরে চলে। নইলে জুগ বানহোপ্‌ থেকে ছাড়ার পরে ইতিমধ্যে আমরা ন'টি ঘাটে থেমেছি এবং বারপাঁচেক এপার-ওপার করেছি। এখুনি আমরা দশম অর্থাৎ শেষ স্টেশন আরথ্‌গোলডাও পৌঁছে যাবো। অথচ মাত্র দেড়ঘণ্টা হল জুগ

থেকে রওনা হয়েছি। এখন বিকেল সাড়ে তিনটা।

যে ওয়েটার তখন ফলের রস এনেছিল, সে কফি নিয়ে আসে। বাবুজি আনতে বলেছিলেন।

কফি দিয়ে লোকটি বলে—তাড়াতাড়ি পান করে নিন। আরথ্‌গোলডাও এসে গেল। এখানে পনেরো মিনিট স্টীমার থামবে। আপনারা ইচ্ছে করলে নিচে নেমে একটু পায়চারি করে নিতে পারেন।

বাবুজি হেসে বলেন—থ্যাংকস। আমরা আরথ্‌গোলডাও দেখেছি। আর ওঠা-নামা করব না। After all I am an old man.

—Not too old! লোকটি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে।

বাবুজি মৃদু হাসেন। আমারও হাসি পায়। ওয়েটার বাবুজির বয়স অনুমান করতে পারে নি। পারলে সে কথাটা বলত না।

না, সে ঠিকই বলেছে। বয়স যা-ই হয়ে থাক, বাবুজি আজও তরুণ তাজা। তিনি এখনও একা একা য়ুরোপ-আমেরিকা ভ্রমণ করেন। শুধু তাই নয়, মনের দিক থেকে তিনি যে আজও নবীন-কিশোর। বাবা বিশ্বনাথের কাছে কামনা করি, তিনি যেন আমার বাবুজিকে আরও অনেক অনেকদিন এমনি তরুণ তাজা স্বাস্থ্য আর কিশোর মনের অধিকারী করে রাখেন।

আরথ্‌গোলডাও ঘাটে এসে স্টীমার থামল। আমরা দুজন ছাড়া বাকি যাত্রীরা সবাই নেমে গেলেন। তাঁরা ট্রেনে করে নিজেদের জায়গায় ফিরে যাবেন। এখান থেকে কোন যাত্রী উঠলেন না। কেনই বা উঠবেন! স্টীমারে করে আমাদের জুগ যেতে অন্তত দেড়ঘণ্টা লাগবে। অথচ এখান থেকে ট্রেনে জুগ যেতে ঠিক তার অর্ধেক সময় লাগে। য়ুরোপে যে সময়ের দাম বড়ই বেশি!

স্টীমার ছেড়েছে। এখন আমরা আবার সেই দুজন।

না, বেশিক্ষণ একা একা থাকতে হবে না আমাদের। দু-একটা ঘাট পরেই যাত্রী সমাগম শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু তাদের আগমনে আমাদের একাকিত্ব ঘুচবে কি?

কেন ঘুচবে না? ওদের পোশাক আর আচার-আচরণ দেখে আমার যে কোনমতেই ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত নয়। আমি য়ুরোপ ভ্রমণে এসেছি। উন্নত য়ুরোপ, শিক্ষিত য়ুরোপ, সমৃদ্ধ য়ুরোপ দর্শনের সঙ্গে আমাকে যে সমাজের এই অস্থিরতাকেও মেনে নিতে হবে। কারণ এটি সভ্যতার অবদান।

কিন্তু আমার কথা থাক। আমি আর ক'দিন য়ুরোপে থাকব! আমি ভাবছি য়ুরোপের কথা। ভোগের মোহে যে তার সমাজ থেকে শান্তি উধাও হয়ে যেতে বসেছে! সিলভিয়ারা ঘর বাঁধতে চাইছে না আর মণিকারা ঘর ভাঙছে।

এই যদি সভ্যতার অবদান হয়, তাহলে কাশী বিশ্বেশ্বরকে বলব—আমার চোখের সামনে থেকে তুমি রঙীন কাঁচ সরিয়ে নাও। আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলো আমার দরিদ্র ও অধঃপতিত ভারতের মাটিতে। আমার কাছে সেই স্বর্গ : 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'।

॥ পনেরো ॥

ঘুম ভেঙে গেল। ঘড়ি দেখি। সকাল সওয়া পাঁচটা। অভ্যেসমতো ঘুম ভেঙে গেছে। কিন্তু আজ যে সকালে ওঠার দরকার নেই! আজ আর কোথাও বেড়াতে যাচ্ছি না। সুইজারল্যান্ড বেড়াবার পাট চুকেছে আমার। আমি আজ বিদায় নেবো জুগ আর জয়ন্তী-জুরিখের কাছ থেকে।

বাবুজি বলেছেন, ব্রেকফাস্ট করে সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ রওনা হলেই চলবে। তিনি ব্যানার্জীবাবুকেও গাড়ি নিয়ে ঐসময়ে আসতে বলেছেন।

আমরা সুইস্ এয়ারের বিমানেই লন্ডন যাবো। ফ্লাইট নম্বর এস আর. ৮০৪। সুইস সময় দুপুর একটায় বিমান ছাড়বে। দেড়ঘণ্টা সময় লাগবে। কিন্তু আমরা লন্ডন সময় দুপুর দেড়টায় হিথ্রো পৌঁছব। আজ আমি আবার একঘণ্টা সময় লাভ করব। বৃটেনের সময় কন্টিনেন্টের সময় থেকে একঘণ্টা পেছিয়ে অর্থাৎ আমাদের সময় থেকে সাড়ে পাঁচঘণ্টা পেছিয়ে। আজ আমি যখন হিথ্রো পৌঁছব, জুরিখে তখন দুপুর আড়াইটে আর কলকাতায় সন্ধ্যা সাতটা।

আমি সত্য সত্যই বিশ্বের সবচেয়ে ঐতিহ্যময় বৃহত্তম মহানগরী লন্ডন চলেছি। সেই সুদূর শৈশব থেকে কত ভেবেছি তার কথা, কত পড়েছি জেনেছি আর স্বপ্ন দেখেছি। আজ আমার সেই স্বপ্ন সত্য হবে।

মনে পড়ছে সেদিনের কথা, কলকাতা থেকে যখন জুরিখ রওনা হয়েছিলাম তখনকার কথা। সেদিন নিজের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম, স্বপ্ন কি সত্য হয়?

উত্তর পেয়েছিলাম—নিশ্চয়ই হয়। এবং তা যখন হয়, তখন স্বপ্ন আর স্বপ্ন থাকে না, বাস্তব হয়ে যায়। তবে সে বাস্তব স্বপ্নের মতই সুন্দর, স্বপ্নের মতই মধুর। জুরিখ এসে সেই উত্তরের সত্যতা উপলব্ধি করেছি। বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় লন্ডন পৌঁছেও তাই করব।

ফোন বেজে ওঠে। এত সকালে কে ফোন করলেন? নিশ্চয়ই বাবুজি, এখানে তিনি ছাড়া আর কে ফোন করবেন আমাকে?

—না, বাবুজি নন। অপর প্রান্ত থেকে··নারীকণ্ঠ ভেসে আসে—Good morning brother! Silvia here!

—মর্নিং। আমিও সুপ্রভাত জানাই।

সে বলে—ব্রেকফাস্ট করে রওনা হচ্ছ তো?

—হ্যাঁ।

—আমি তার অনেক আগেই এসে যাবো।

—জানি।

—গোছগাছ শেষ করেছো?

—হ্যাঁ। কাল রাতেই সেরে রেখেছি।

—ভাল করেছো। সেই কথাটা মনে আছে তো?

—কোন্ কথা?

—বারে, সেই যে তুমি ২১শে জুন সুইস এয়ারের ৫৮৭ নম্বর ফ্লাইটে সকাল এগারোটায় কোলন্ (Cologne) থেকে ক্লোটেন পেঁছে সোজা আমার ফ্ল্যাটে চলে আসবে ! সেদিন থেকেই আমি পাঁচদিন ছুটি নিচ্ছি। আমি তখন ফ্ল্যাটেই থাকব। And it will be a rare pleasure for me to welcome you !

কি বলব ? শেষ পর্যন্ত বোধহয় ওর এই আবদার আমাকে রক্ষা করতেই হবে। তার মানে দেশে ফিরতে আরো দুদিন দেরি হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, লণ্ডনে গিয়ে জুরিখে দুদিন স্টপওভার নিতে হবে। রোম এথেন্স ও বম্বের ফ্লাইট বদল করতে হবে।

তাই করব। জীবনে অনেক দুঃখ পাবার পরে সিল্‌ভিয়া ঘর বাঁধতে চলেছে। আমি ওর কেউ নই। তবু সেই শুভলগ্নে সে আমার শুভেচ্ছা চাইছে। সুতরাং সেদিন যে ওর হয়ে আমাকে বাবা বিশ্বনাথের কাছে কামনা করতেই হবে —ঠাকুর, তুমি দেখো মণিকার মতো সিল্‌ভিয়ার ঘর যেন ভেঙে না যায় !

—কি, কথা বলছো না যে ? কি ভাবছ ? আসবে না তুমি ?

সিল্‌ভিয়ার স্বরে উৎকণ্ঠা। তাড়াতাড়ি উত্তর দিই—আসব বৈকি। নিশ্চয়ই আসব। আমি না এলে তোমাদের বিয়ে হবে কেমন করে ?

—Exactly. Thank you. Shall see you soon. Bye-bye !

—Bye-bye.

সিল্‌ভিয়া ফোন ছেড়ে দেয়।

আমি বিছানা থেকে উঠে পড়ি। দরজা খুলে দিয়ে আবার ফোন তুলে নিই। এক কাপ চা পাঠিয়ে দিতে বলি।

চা খেয়ে বাথরুমে ঢুকি। স্নান করে জামা-প্যাণ্ট পরে নিই। লণ্ডনে নিশ্চয়ই এর চেয়ে ঠাণ্ডা হবে না। সোয়েটার গায়ে দেবার দরকার নেই, কোট নিলেই চলে যাবে।

কিন্তু সবে সকাল আটটা। বাবুজি বলেছেন, ন'টায় ব্রেকফাস্ট করতে নামবেন। গতকাল মণিকা বলেছিল, আজ আটটা থেকে ওর ডিউটি। সে এসেছে কি ?

ফোন তুলে নিই। হ্যাঁ, মণিকাই সুপ্রভাত জানায়।

বলি—তুমি কি খুব ব্যস্ত রয়েছো ?

—না। কেন বলুন তো ?

—হাতে সময় থাকলে, তোমাকে একবার আমার ঘরে আসতে বলতাম। অবশ্য তুমি যদি কিছু মনে না ক'রো !

—না, না, মনে করব কেন ? কখন আসব ?

—আধঘণ্টার মধ্যে এলেই চলবে।

—বেশ আসছি।

আসে। মিনিট বিশেকের মধ্যেই মণিকা আমার ঘরে আসে। আমি তাকে বসতে বলি।

একখানি চেয়ারে বসে সে বলে—আপনি দেখছি একেবারে তৈরি হয়ে নিয়েছেন ?

—হ্যাঁ।

মণিকা আর কিছু বলে না। সে চুপ করে আছে। আমিও চুপ করে থাকি। কি ভাবে কথাটা বলব বুঝতে পারছি না।

হঠাৎ মণিকা বলে ওঠে—জানি না আপনি আমাকে কি জন্য ডেকেছেন, তবে একটা কথা আগেই বলে রাখছি, আমাদের ডাইভোর্স সম্পর্কে কোন অনুরোধ করবেন না, রাখতে পারব না।

আমি আরও অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি। মণিকা শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী। সে ভারী শান্ত মেয়ে। ভেবেছিলাম বুঝিয়ে বললে সে কথা শুনবে। কিন্তু সে যে গোড়াতেই আমার মুখ বন্ধ করে দিতে চাইছে। তবু বলি—দেখো আমি গরীব দেশের নাগরিক হলেও তোমার চাইতে বয়সে বড়, জীবনের অভিজ্ঞতাও আমার কিছু বেশি।

সে নীরবে মাথা নাড়ে।

আমি বলতে থাকি—তুমি শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী ও সাবালিকা। তোমার ওপরে কোন মত চাপিয়ে দেবার প্রশ্ন ওঠে না। আমি শুধু তোমাকে একটা কথা জানাতে চাই।

—বেশ, বলুন।

—সেদিন রেস্তোরাঁয় পাশাপাশি তোমাদের দুটিকে দেখে আমার বড় ভাল লেগেছে, মনে হয়েছে রাজ-যোটক।

—সবাই তাই বলেন। কারণ তাঁরা ভেতরের খবর কিছুই জানেন না।

—তোমাদের ভেতরের খবর জানার অধিকার আমারও নেই। আমি শুধু তোমাকে অনুরোধ করব, আরেকবার ভেবে দেখতে।

—আমি দুঃখিত। এ ব্যাপারে আমার ভাবনা-চিন্তা সব শেষ করে ফেলেছি। কারণ মাতাল নিয়ে ঘর করা যায়, হয়তো বা চরিত্রহীনের সঙ্গেও সংসার করা সম্ভব, but Paul is Drug-addicted !

—Drug addicted ! আমি প্রায় চিৎকার করে উঠি।

ম্লান হেসে শান্ত স্বরে মণিকা উত্তর দেয়—হ্যাঁ। গত ছ'মাস ধরে অনেক চেষ্টা করেও আমি ওর নেশা ছাড়াতে পারি নি। শুধু তাই নয়, এখন সে আমাকেও ঐ বিষ ধরিয়ে দলে টানবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে।

—কিন্তু ওর চেহারা দেখে তো বোঝা যায় না !

মণিকা আবার একটু হাসে, বলে—আপনি ওকে আগে দেখেন নি বলে একথা বলছেন। ওর স্বাস্থ্য আরও অনেক ভাল ছিল।

—কোনভাবেই কি ওকে ফেরানো যায় না ?

—না। অনেক চেষ্টা করেছি। ওর সঙ্গে থাকলে আমাকেও ঐ বিষ ধরতে

হবে, আমার জীবনটাও নষ্ট হয়ে যাবে। আমি কেন তা করব বলতে পারেন?

না, মণিকার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি নি। সে কিছুক্ষণ নীরবে অশ্রুপাত করে একসময় বেরিয়ে গেছে আমার ঘর থেকে। আমি তাকে বাধা দিই নি, বলতেও পারি নি কিছু। বসে বসে নীরবে শুধু ভেবে চলেছি, সভ্যতার এই অভিশাপের কথা। এ অভিশাপ তো আমাদের সমাজেও বিস্তৃতি লাভ করছে। এই অক্টোপাসের নাগপাশ থেকে মুক্তি পাবার উপায় কি?

বাবুজির ফোন আসে।

আমি নিচে নেমে আসি। নীরবে মণিকার হাতে চাবি দিয়ে ডাইনিং হলে প্রবেশ করি। সিলভিয়ার সেবা ও যত্নে আমাদের ব্রেকফাস্ট শেষ হয়।

ব্যানার্জীবাবু এসে যান।

আমি আবার মণিকার কাছে আসি। হোটেলের বিল শোধ করি। স্যুটকেস আনবার জন্য সে একজন বেয়ারাকে সঙ্গে দেয়। আমি তাকে নিয়ে ঘরে আসি। হোটেল গুগিতালের ৩০৭ নম্বর ঘর। সেদিন মণিকা যখন এই ঘরখানি আমাকে দিয়েছিল, তখন ভারী আনন্দ হয়েছিল। তবে জানতাম এ ঘরে আমার মেয়াদ মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ঘরেই সুইজারল্যাণ্ডের দিনগুলো কেটে গেল আমার।

কিটব্যাগ কাঁধে নিয়ে বেয়ারার সঙ্গে নেমে আসি রিসেপশানে। মণিকার হাতে শেষবারের মতো ঘরের চাবিটা দিয়ে দিই।

বাবুজিও এসে যান। আরেকজন বেয়ারা তাঁর স্যুটকেস বয়ে এনেছে। তিনিও তাঁর ঘরের চাবি মণিকার হাতে দেন। ব্যানার্জীবাবুর সঙ্গে বেয়ারারা স্যুটকেস নিয়ে বাইরে চলে যায়।

সিলভিয়া বেরিয়ে আসে ডাইনিং হল থেকে। সে আমাদের সঙ্গী হয়। তার আসায় অবাক হই না। অবাক হই মণিকার আচরণে। সেও অফিস ফেলে আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে এলো বাইরে।

ওরা গাড়ির পাশে আসে। আমরা ওদের সঙ্গে করমর্দন করি। মণিকা শুধু সাধারণ ভদ্রতা করল। কিন্তু সিলভিয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠল—২১শে জুন আবার দেখা হচ্ছে আমাদের!

আমি মাথা নাড়ি। বাবুজি মৃদু হাসেন। তিনি সবই জানেন।

আমরা গাড়িতে উঠি। সিলভিয়া আর মণিকা তেমনি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। আমি আরেকবার ওদের দুজনকে দেখি। একজন ঘর বাঁধছে, আরেকজন ঘর ভাঙছে। ভাঙা আর গড়া নিয়েই জীবন। এই যে জগতের নিয়ম। য়ুরোপ য়ুরোপ হলেও জাগতিক নিয়মের বাইরে নয়। তাই জয়ন্তী-জুরিখে এসেও আমি সেই জীবনকে দেখে গেলাম।

গাড়ি গর্জে ওঠে। এগিয়ে চলে। আমি পথিক, আবার শুরু হল আমার পথচলা। দেশ থেকে দেশান্তরের পথে।

সমাপ্ত